ওঁ নমো গোবিন্দায়।

চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ।

(ত্রিনাথ সমন্বিত)

শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।



শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—:০:—

সন ১৩৩১।

(মূল্য দুই টাকা)।

প্রাপ্তিস্থান—

দুর্গাবাড়ী,

৪২নং, বাগ্বাম অক্রুর লেন

বহুবাজার, কলিকাতা,

ও

অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

৫নং অক্রুর দত্ত লেনস্থ

গ্যাংলাড প্রেসে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্রহ্ম

দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

ওঁ নমো বাসুদেবায়।

উৎসর্গ।

যাঁহা হইতে এই মানব জীবন লাভ করিয়া ও যাঁহার উপদেশানুসারে মনঃপ্রাণ ধর্ম্মোৎসাহে পরিপূরিত করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্র সকল পরিভ্রমণ করিয়াছি, যিনি গৃহে থাকিয়াই বেদান্তপ্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক কালপ্রাপ্তে উচ্চতর লোকে গমন করিয়াছেন, যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেই পূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র নামে এই গ্রন্থ ভক্তি সহ অর্পণ করিলাম।

আশা করি, তাঁহার সদয় দৃষ্টিপাতে আমার আত্মা পবিত্রীকৃত হউক।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীর শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ও পরমারাধ্য পিতৃদেব চিরশান্তিময়ধামে প্রস্থান করায় প্রায় বৎসরাধিক কাল পরিশ্রমের পর এই পুস্তক নারায়ণের ইচ্ছায় সর্ব্বসাধারণে্য সমুপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। ইহাতে স্বীয় তীর্থভ্রমণবৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত হইল।

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া ও শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থপ্রণেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়া আমায় সবিশেষ বাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থে শ্রীযুত রাজকুমার ঘোষাল বি. এ. যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উপকৃতি আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না।

আমি বাক্প্রয়োগে অপটু হইয়াও যে এই পুস্তক প্রণয়নে প্রযুক্ত হইয়াছি তাহা লেখক বলিয়া যশঃপ্রার্থনার জন্য নহে; কিন্তু এই পুস্তক পাঠে যদি কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও শান্তি লাভ করেন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক ও নিজেকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব।

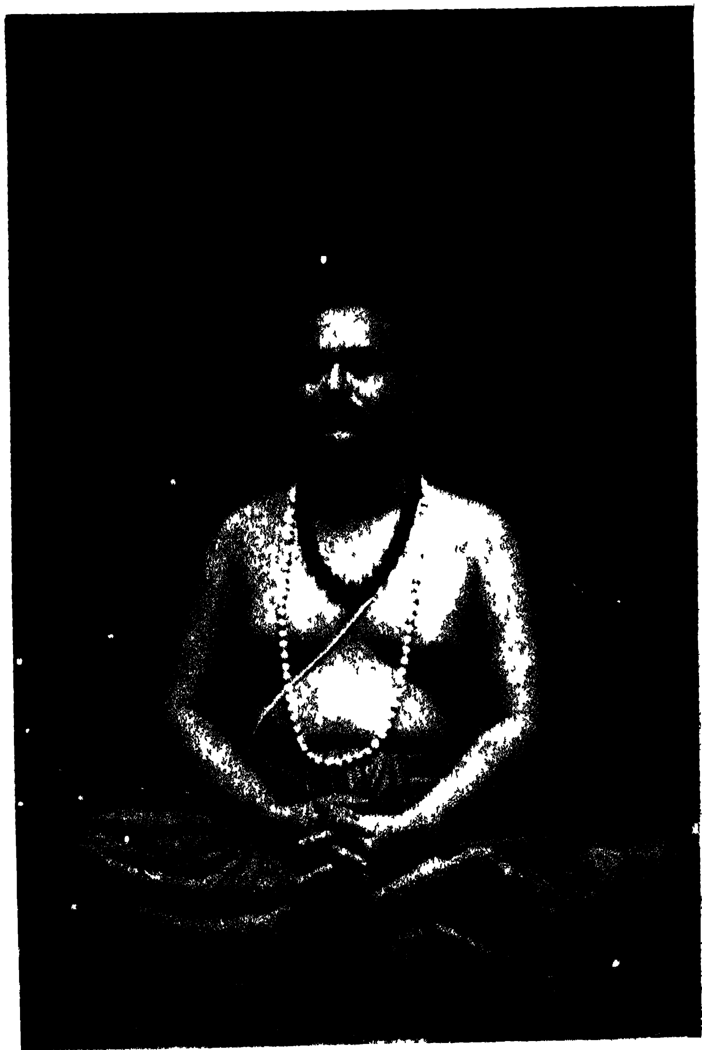
সাধুহৃদয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে, এই পুস্তকে যদি আমার অজ্ঞতাবশতঃ কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা যেন উহা নিজগুণে মার্জ্জনা করেন।

শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করি যেন আমার এই পরিশ্রম তাহার কৃপায় সাফল্য লাভ করে। ইতি—

রথযাত্রা,
১৩৩১।

শ্রীদুর্গাচরণ দেবশর্ম্মা।





পদাশ্রিত শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়।



সূচীপত্র।

—:০:—

ওঁ তৎ সৎ।

চতুর্দ্ধাম ও সপ্ততীর্থ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।



৺বদরিকাশ্রমের পথে।

সন ১৩২৫ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ আমি বিপত্নীক হইয়া নিরানন্দ গৃহে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম যে দেশ ভ্রমণ করিলে হৃদয়ের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ উপশমিত হইতে পারে। স্থির করিলাম যে নিরর্থক দেশ দেশান্তর পর্য্যটন না করিয়া তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শনে এক অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মল আনন্দ উপলব্ধ হয়। বাল্যকালে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবের চতুর্দ্ধাম ও সপ্তমোক্ষপ্রদ তীর্থ সকল পর্য্যটন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ভট্টপল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় মদীয় ভবনে শুভাগমন করেন। আমাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তিনি আমার প্রতি তীর্থ ভ্রমণেব নানা উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পরিশেষে ৺বদরিকাশ্রমে যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। গুরুদেব পঞ্জিকা দেখিয়া সন ১৩২৬ সালের ২৯শে বৈশাখ কাল শুদ্ধ থাকায় আমার যাত্রার দিনস্থির করিলেন। বিশাল বদরিকাধামে যাইতে হইলে যাত্রিগণকে বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্রমাসের মধ্যে যাইতে হয়; কিন্তু শেষ দুই মাস বারিবর্ষণের জন্য হিমগিরি অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই বরফ কাটিতে কাটিতে রাস্তা করিতে হয়, তখন উহার পরবর্ত্তী মাস সমূহের সময় পথের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর শ্রীচবণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৺বদরিকাশ্রমে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

২৯শে বৈশাখ—সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। ইতি পূর্ব্বেই হরিদ্বারের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রীত ছিল ও গাড়ীতে বার্ত্-রিসার্ভ ছিল। রাত্রি ৮॥০ ঘটিকায় হাবড়া ষ্টেশন হইতে কম্বাইণ্ড্ পাঞ্জাব ও বোম্বে মেল (Combined Punjab and Bombay mail) ছাড়িল। আমি যে কামরায় ছিলাম তথায় কলিকা[redacted]বি-বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ছিলেন। তাহার সহিত আলাপ করিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। পরদিন সকালে ট্রেণ মোগল সরাই জংশনে আসিলে আমাদের গাড়ী মেল হইতে বিযুক্ত (Detach) করিয়া পুনরায় দেরাদুন মেলে যুক্ত (attach) করিয়া দিল।

বেণারস কাণ্টন্‌মেণ্ট, প্রতাপগড়, লক্ষ্ণৌ, সাহাজাহানপুর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৩৷৷০ ঘটিকায় হরিদ্বারে উপনীত হইলাম। পথিমধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। পথের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ঘণ্টা দুই ষ্টেসনের বিশ্রাম কক্ষে অপেক্ষা করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালেই যেমন ষ্টেসন হইতে বহির্গত হইতেছি অমনি আমার পাণ্ডা শ্রীবামপ্রসাদ সূর্য্যপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে পূর্ব্বেই দাণ্ডি ক্রয়কবণার্থ ৩০৲ টাকা দিয়াছিলাম। সে বলিল যে দাণ্ডি ইত্যাদি সমুদয় স্থির আছে। অতঃপর পাণ্ডার সহিত কথোপোকথন কবিতে করিতে তাহার বাসায় উপস্থিত হইলাম।

এক্ষণে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন সপরিবারে এই স্থানে আগমন কবি তখন এই স্থান অন্যরূপ ছিল। তখন যাত্রিগণ নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিত। ঘাট সকল ভালরূপ বাঁধা ছিল না। এখন সরকার বাহাদুর যাত্রিবৃন্দের সুবিধার জন্য ঘাট সকল প্রস্তব দ্বারা বাঁধাইযা দিয়াছেন। পথ সকল এক্ষণে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক যুগের মধ্যে এই স্থানের কত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

হরিদ্বার হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে কণ্খল। ইহা এক তীর্থস্থান। হরিদ্বারে গঙ্গা ত্রিধারা হইয়া কণ্খলে আসিয়া মিলিতা হন। কণ্খলের পথে নীলধারা দৃষ্ট হয়। কথিত

আছে এই স্থানে দক্ষরাজের রাজধানী ছিল। হরিদ্বার হইতে চণ্ডীর পাহাড় দেখা যায়। ইহার দক্ষিণে পিছোড় নাথ শিব আছেন। এখানকার ব্রহ্মকুণ্ডে সকলকে স্নান করিতে হয়। ব্রহ্মকুণ্ডে ও গঙ্গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্য সকল নির্ভয়ে বিচরণ করে। এক একটা মৎস্য ওজনে প্রায় ৩০।৩৫ সের। এই হরিদ্বারের দৃশ্য অতি মনোরম। এখানে জাহ্নবীর কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ করিলে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় যেন স্বর্গদ্বারে উপনীত হইয়াছি। এখানে ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভ মেলা হইয়া থাকে ; তখন অনেক সাধুসন্ন্যাসী আগমন করে।

৩১শে বৈশাখ বুধবার—অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা ও বিষ্ণুপদা সংক্রান্তি। পাণ্ডার সহিত তাহার বাসায় উপস্থিত হওয়া গেল। বেলা প্রায় ৯টার সময় যখন স্নান করিয়া আমার পোর্টম্যাণ্ট খুলিলাম তখন দেখিলাম যে আমার কন্যাদ্বয় উহাতে কিঞ্চিৎ মুগের ডাল, এক বোতল চাটনি, মিছরি ও বাটনার গুড়া দিয়াছে। পথিমধ্যে এই সকল দ্রব্যে বিশেষ উপকার হইয়াছিল।

আহারাদি সমাপনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামলাভ [illegible] বেলা প্রায় ২॥০ টার সময় পাণ্ডার সহিত [illegible]ক অশ্বযানে আরোহণ করিয়া হৃষীকেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় ৪॥০ টার সময় আমরা হৃষীকেশে পঁহুছিলাম।

হৃষীকেশ—এই ধর্ম্মক্ষেত্রে আগমণ করিলে মানবের হৃদয়ে

পবিত্র ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি হয়। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। হিমালয় হইতে গঙ্গা কুলু কুলু রবে নামিয়া আসিতেছে। ঐ শব্দ কি সুমধুর! এ স্থানে সততই পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে। স্থানটী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এখানে অনেক সাধুপুরুষ বাস করেন। এ স্থানে ২।৩টা ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার ধর্ম্মশালায় প্রত্যহ বেলা ১২টার সময় কত অভুক্ত গৈরিকবস্ত্রধারী সাধু সন্নাসীদিগকে "আইয়ে নারায়ণ, লিজিয়ে নারায়ণ" ইত্যাদি সম্ভাষণে ডাল রুটী ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। ইহাকে ভাণ্ডার ভোজন কহে। আমি এস্থানে এক-ধর্ম্মশালায় বাসা লইলাম। ধর্ম্মশালাটীর পার্শ্ব দিয়া পবিত্র সলিলা জাহ্নবী প্রবাহিতা হইতেছেন। নিকটে এক কুণ্ড আছে, উহার জল ঈষদুষ্ণ।

পূর্ব্বে যখন এস্থানে আসিয়াছিলাম তখন অত্রত্য পথ সমুদয় দুর্গম ছিল। তখন গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত এবং প্রায় ৬ ঘণ্টা সময় লাগিত। তখন পথিমধ্যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সন্ধ্যার পর হইতেই বাহির হইত সেজন্য যাত্রিগণকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাতায়াত করিতে হইত এক্ষণে পথ ভাল হওয়ায় ঘোড়ার গাড়ী চলিতেছে বেশ আরামে দুই ঘণ্টায় হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশে যাওয়া যায়। এক্ষণে হৃষীকেশ রোড পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চলিতেছে, কিন্তু উক্ত ষ্টেশন হইতে হৃষীকেশ অনেকদূরে এবং ষ্টেসনে কোন যান পাওয়া যায় না। তজ্জন্য হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশে যাইতে হইলে যাত্রীগণের অশ্বযানে যাওয়াই সুবিধা

জনক। হৃষীকেশে যাইবার পথে অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে; যথা, ভীমটোটা রামসীতার মন্দীর ইত্যাদি।

১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—অদ্য অতি প্রত্যূষে দাণ্ডি বাহকেরা দাণ্ডি লইয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই দাণ্ডি ক্রয় করা হইয়াছিল। । দাণ্ডিবাহনার্থ চারিজন বাহক, একজন বোঝাওয়ালা ও রন্ধন করিবার জন্য একজন পাচক নিযুক্ত করিলাম। দাণ্ডি বাহকগণকে একশত পঁচাত্তর টাকা, ভার বাহককে পঞ্চাশ টাকা এবং পাচক ব্রাহ্মণকে আহাবাদি ও কিঞ্চিদর্থ দিতে হইবে। তাহাদেব সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হইল। তাহারা ঈশ্বর কেদারনাথ ও বদরিনাথ দর্শন করাইয়া আমাকে মেলচৌরীতে পঁহুছাইয়া দিবে। মেলচৌরী গাড়োযাল রাজ্যের শেষ সীমা। এই স্থানের এইরূপ প্রথা যে গাড়োয়াল জেলার কুলি আলমোরা বা কুমায়ুঁন জেলায় যাইবে না। তাহাদের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া বিশাল বদ্রিকানাথের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

দাণ্ডিই এই পার্ব্বত্য প্রদেশে শ্রেষ্ঠ যান। এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যান আর নাই। কাণ্ডী বা ঝাম্পানে যাইলে অল্প ক[illegible] হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা দাণ্ডিতে যাওয়াই আরামপ্রদ দেখিলাম। দাণ্ডি বাহকেরা সকলেই পর্ব্বতবাসী। ইহারা অতি বলশালী, সরল ও বিশ্বাসী। ইহারা তত চুরি জুয়াচুরি বা শঠতা শিক্ষা করে নাই। সকলে প্রায় গাড়োয়াল রাজ্যের বসতি।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া দাণ্ডিতে

আরোহণ করিলাম। বিশাল বদরিকানাথের পথে যাত্রা আরম্ভ হইল। হৃষীকেশ হইতে অল্পদূর অগ্রসর হইলে বেশ নির্জ্জন স্থান পাওয়া গেল। দেখিলাম সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী পর্ণকুটীব নির্ম্মাণ করিয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ বা পর্ব্বত গুহায় আশ্রম লইয়াছেন। দেখিলে তাঁহাদিগকে অতি ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে দাণ্ডিতে যাইতে বড়ই কষ্টবোধ হইবে; কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলাম যে দাণ্ডিতে চড়িয়া বেশ আরামে যাওয়া যায়। হৃষীকেশ হইতে প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া আমরা "মুনির তপোবনে" পঁহুছিলাম। এখানে যাত্রিগণের সমস্ত মালপত্র ওজন হইয়া মাসুল ধার্য্য হয়। সবকারী কর্ম্মচারীরা আমার জিনিস সমুদয় ওজন করিয়া মাসুলেব টাকা লইয়া আমায় এক রসিদ দিল। অতঃপর পুনরায় আমরা চলিতে লাগিলাম। প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "লছমন ঝোলায়" আসিয়া পড়িলাম। সম্মুখেই গঙ্গার উপর লৌহসেতু দেখা যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে এই সেতু ছিল না,

এহ স্থান [illegible] ঝোলা নামে অভিহিত। পূর্ব্বে যখন এই সেতু নির্ম্মিত হয় নাই তখন গঙ্গার দুই পারে খুব মোটা দুই গাছা দড়ি দুইটা খোঁটায় বাঁধা থাকিত। এই দড়ির মধ্যে মধ্যে বাঁশের দাণ্ডা লাগান থাকিত আর মাথার উপরও দুই গাছি শক্ত মোটা দড়ি বাঁধা থাকিত। যাত্রিগণকে ঐ দড়ি ধরিয়া

পার হইতে হইত। পার হইবার সময় দড়িটা খুব দুলিতে থাকিত এবং পদতলে খরস্রোতা গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছে দেখিয়া যাত্রিগণের অত্যন্ত ভয় হইত। এক্ষণে মাননীয় সূর্য্যমল ঝুম ঝুমওয়ালা বহু অর্থব্যয়ে যাত্রিবৃন্দের সুবিধার্থ এই লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। লছমনঝোলায় অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে। বামপার্শ্বে গঙ্গাদেবীকে (অলকনন্দা) রাখিয়া এবার আমাদিগকে লছমন-ঝোলা পরিত্যাগ করিতে হইল।

লছমনঝোলা হইতে কিয়দ্দূর যাইয়া আমরা "ফুলবাড়ী" চটী পাইলাম। তখন বেলা অধিক হওয়ায় উক্ত চটীতে আহারাদি করিবার জন্য উঠিলাম। আমরা তথায় অবস্থান করিতেছি—এমন সময় করাচী দেশীয় অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগের সঙ্গে ছোট ছোট বালক বালিকাও ছিল; তাহারা সকলে ৺বদরিকানাথ দর্শনাভিলাষে যাইতেছিলেন। তাহারা আসিলে চটীতে স্থান বড়ই সঙ্কীর্ণ হইল। মধ্যাহ্নকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় আবার রওনা হইলাম।

দুই মাইল যাইবার পর এক চটী দেখিলাম, উহার নাম "মৌনা" চটী। ঐ চটী অতিক্রম করিয়া প্রায় ৩ মাইল চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে "বিজলী" চটীতে আসিয়া উঠিলাম। তথা হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবলই স্তরে স্তরে পর্ব্বতাবলী দর্শকের নয়ন পথে পতিত হইয়া তাহার

আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকে। চারিধারে পর্ব্বত ব্যতীত অপর কিছুই দৃষ্ট হয় না। উপরি-উক্ত চড়াই উঠিতে দাণ্ডিবাহকগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। আমিও অল্প ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলাম। দাণ্ডিতে আরোহণ করিয়াই যখন বেগ পাইতে হইল, তখন না জানি যাহারা পদব্রজে চড়াই পার হন তাহারা কতই ক্লেশ অনুভব করে। ঐ চটীতে নিশাযাপনার্থ আশ্রয় গ্রহণ কবিলাম। সেখানে যাইয়া দেখি যে আমার পূর্ব্বে দুইটী পাঞ্জাবদেশীয় ভদ্র যুবক ৺বদরিকানাথ দেবের দর্শনাভিলাষে সেখানে আসিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হইল। আমার পরিধানে কোট প্যাণ্ট্ থাকায় সকলেই প্রায আমাকে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া মনে করিত। কথা প্রসঙ্গে তাহারা আমায় কেদার বদ্রীর পথ ঘাটের সম্বন্ধে বলিলেন যে, বিগত যুদ্ধের জন্য সরকার বাহাদুর রাস্তা ঘাট সকল মেরামত করিতে পারে নাই বলিয়া এ বৎসর রাস্তা ঘাটের বড়ই বে-বন্দোবস্ত। বৎসর দুই হইল কোনও যাত্রীকে যাইতে দেওয়া হইতেছিল না; এ বৎসর যাত্রিগণকে ছাড়া হইতেছে। এ বৎসর গাড়োয়াল প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তজ্জন্য জিনিষ পত্র বড়ই মহার্ঘ। সে [illegible] উক্ত চটীতে থাকিয়া পরদিন আবার রওনা হইলাম।

২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া "জয় বদরীবিশাল" বলিয়া যাত্রা করিলাম। প্রত্যহ প্রাতে মাইল দুই এবং মাইল দেড়েক বৈকালে আমি পদব্রজে চলিতাম এবং

দাণ্ডিবাহকেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে দাণ্ডি লইয়া আসিত। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাকে ঐ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রায় ৩ মাইল আসিয়া আমরা "কুণ্ড" চটী পাইলাম। দেখিলাম যে চটীটী নিতান্ত ছোট। দুই তিনখানি মাত্র দোকান আছে। এখানে একটা ঝরণা আছে। উহার জল পানে বেশ তৃপ্তিলাভ হয়। আবার তিন মাইল আসিয়া "বন্দর" চটীতে আসিলাম। এই তিন মাইল পথ ক্রমাগত উৎরাই। তারপর পুনরায় মাইল তিনেক আসিয়া আমরা "মহাদেব" চটিতে উপস্থিত হইলাম। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায় দেখিয়া এই চটিতে আশ্রয় লইলাম। এখানে ২।৪ খানা দোকান আছে। একটী ধর্ম্মশালাও আছে। এস্থানে মহাদেবের এক মন্দির আছে। নিকটেই গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। স্নানাদি সমাপনান্তে দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিতে যাইলাম। আমার পাচক পাকাদি করিতে লাগিল। মন্দির হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলাম।

কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম লাভ করিয়া বৈকাল বেলায় পুনরায় বহির্গত হইলাম। মাইল খানেক পদব্রজে যাইয়া দাণ্ডিতে আরোহণ করিলাম। চতুর্দিকে অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী তন্মধ্যে এই একমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ। কোথাও পথ পর্ব্বতের নিম্ন দিয়া যাইতেছে,কোথাও বা পর্ব্বতের শিখর দিয়াই পথ, কোথাও বা পর্ব্বত গাত্রে ঢালু পথ আবার কোথাও বা পাহাড়ের গা হইতে খাড়া পথ। প্রতিপাদ-বিক্ষেপেই পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। পার্ব্বত্যপথ ক্রমাগত চড়াই

ও উৎরাই। কিয়দ্দূর যাইবার পর এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। মেঘের গর্জ্জন সেখানে কি ভীষণ! পর্ব্বত গাত্রে ঐ ধ্বনি প্রতিহত হইয়া দ্বিগুণাকৃত হইতে লাগিল। আমরা প্রায় ৪ মাইল আসিয়া সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে "ওখলঘাট" চটীতে উপস্থিত হইলাম। নিশা যাপনার্থ উক্ত চটীতে আশ্রয় লইলাম। এই চটীটী বড় ছোট। একখানি মাত্র ঘর; তবে ঘরখানি বেশ বড়। চটীওয়ালা বড় ভাল লোক। তাহার ভদ্রোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলাম। সে আমার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিল ও আমার শয়নের জন্য একখানি চারপায়া আনিয়া দিল। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম। সারাদিন পথ অতিবাহিত করায় ক্লান্ত হইয়া শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িতাম। পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিলে নিদ্রা অতি সহজেই লাভ করা যায়।

এই বিশাল পার্ব্বতীয় পথে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভিন্ন আর আমার আপন জন কেহ নাই। যাত্রিদিগের কেহ বা আগাইয়া যাইতেছে, কেহ বা পিছনে পড়িতেছে, সকলে এক সঙ্গে যাইতে পারে না। দাণ্ডিবাহক চতুষ্টয়, পাচক ও বোঝাওয়ালা ভিন্ন অপর কেহই আমার দেখিবার নাই। ইহাদের সঙ্গে চটীতে [illegible] শয়ন ইত্যাদি করিতে হইত। শয়নকালে তাঁহারা আমার চতুঃপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—রাত্র প্রভাত হইবামাত্র মুখ হাত ধুইয়া ইষ্টদেবকে স্মরণান্তর বিশাল বদরিনাথের পথে বাহির হইলাম। প্রায় দেড় মাইল পথ আসিয়া, "খস্তা" চটী

পাইলাম। ঐ চটী পার হইয়া এক মাইল আসিয়া আমরা অপর এক চটী দেখিলাম। উহার নাম "কাণ্ডী" চটা। এখানে অনেকগুলি দোকান আছে; দুচারটা গাছ পালাও আছে, স্থানটা বেশ ভাল। ঝরণার জল শীতল ও সুমিষ্ট। দেখিলাম চটীর নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। আমার দাণ্ডি দেখিয়া পাহাড়ী বালক বালিকারা ছুটিয়া আসিল এবং "শেঠজী পয়সা দিজিয়ে" বলিয়া আমায় সেলাম করিতে লাগিল। তাহাদিগকে এক এক আধলা দান করিতেই তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এই চটী ছাড়াইয়া ৩ মাইল উৎরাই। আমরা পাহাড়ের গায়ে এক অতি সংকীর্ণ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। আমাদের বাম পার্শ্বে প্রায় ৬০০ ফিট্ (৪০০ হস্ত) নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। যে পথ দিয়া আমরা চলিতেছি, তথা হইতে গঙ্গাকে একটী সরু রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে এক সেতুর নিকট আসিলাম। সেতুটী ব্যাস গঙ্গার উপর। ব্যাস গঙ্গা একটা ছোট নদী। উহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়া আমরা "ব্যাস চটীতে" পঁহুছিলাম। এই চটী একেবারে জলের ধারে। অন্যান্য চটী অপেক্ষা এখানে দোকানেরই সংখ্যা কিছু বেশী। এখানে একটী ধর্ম্মশালাও আছে। চটীর নীচেই গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। গঙ্গার ওপারে ছোট বড় অনেকগুলি গাছ। গাছগুলিতে অনেক ময়ূর দেখিলাম। সম্মুখেই ব্যাসদেবের মন্দির আছে। উহাতে ব্যাসদেবের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

আরও ২।৩টী মন্দির দেখিলাম। এই স্থান হইতে ব্যাসগুহা ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে সেখানে ভগবান্ ব্যাসদেব অনেকদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্যাস চটী ছাড়াইয়া প্রায় ৩ মাইল আসিয়া আমরা "ঝালারি" চটীতে পঁহুছিলাম। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া আমি সেই চটীতে উঠিলাম। সেখানে আহারাদি করিলাম। এখানকার চটীওয়ালাদের এই নিয়ম যে যাত্রিগণ যদি তাহাদের নিকট চাউল ডাল ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করে, তবে তাহাদিগকে চটীতে থাকিতে স্থান দিবে এবং তজ্জন্য চটীর কোন ভাড়া লইবে না। দ্রব্যাদি খরিদ না করিলে থাকিবার স্থান দিবে না। তাহারা বলে যে তাহাদের দোকান হইতে জিনিস পত্র ক্রয় করিলে যে লাভ হয়, তাহাতেই তাহাদের দোকানের ভাড়া প্রভৃতি উঠিয়া যায়। চটীওয়ালা যাত্রিদিগের ব্যবহারার্থ তৈজস পত্র দিয়া সাহায্য করে।

উক্ত চটীতে আহারাদি সমাপন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় পুনরায় রওনা হইলাম। দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে আজ সন্ধ্যাকালে আমরা দেব-প্রয়াগে পঁহুছিব। দেব-প্রয়াগ দর্শন করিব বলিয়া মনে বড় আনন্দ লাভ করিলাম। পথক্লেশ আদৌ অনুভূত হইতে লাগিল না। প্রায় ২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "উমরাসু চটী" পাইলাম। উমরাসু চটী ছাড়াইয়া কিছুদূর আসিলে ৩।৪ জন পাণ্ডা আমার দাণ্ডির সন্নিকটে আসিল। আমার সঙ্গে পাণ্ডা

থাকায় তাহারা চলিয়া গেল। ইহারা দেবপ্রয়াগ হইতে কিযদ্দুর অগ্রসর হইয়া যাত্রী সংগ্রহার্থ দণ্ডায়মান থাকে।

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমরা দেবপ্রয়াগে পঁহুছিলাম। দেবপ্রয়াগ সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এই সহরটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। দেব প্রযাগের বাড়ীগুলি দূর হইতে যেন পর্ব্বত গাত্রে চিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দেব-প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া আমার পাণ্ডার বাসায় উঠিলাম। এই স্থানেই বদরিনারায়ণের পাণ্ডাগণ বাস করে। এখানে প্রায় ৪০০ ঘর পাণ্ডার বসতি দেখিলাম। দেব প্রযাগ ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। প্রায ২০০ ফিট নিম্নে অবতরণ করিলে সঙ্গমের জলস্পর্শ হয়। সঙ্গম ঘাটের দৃশ্য অতি চমৎকার। এখানে গঙ্গা সুগভীর; পর্ব্বতের প্রায ৫০০ ফিট বা ততোধিক উচ্চ হইতে জল নিম্নে পড়িতেছে। অলকানন্দার স্রোত অতি প্রবল এবং উহার জল হিমশীতল। দেব-প্রয়াগে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে। একটী মন্দিরে রাম সীতার সুন্দর বিগ্রহ বিরাজিত। এই সকল মন্দিরের অনেক ধন সম্পত্তি আছে। জনশ্রুতি আছে যে কোন এক ব্যক্তি আসিয়া মন্দিরের অনেক সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরগুলির অধিকারী গাড়োয়ালের রাজা। দেব-প্রয়াগে বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা, আদালত প্রভৃতি সমুদয়ই আছে। অনেক দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। ভাগীরথীর সেতু পার হইয়া সহর দেখিতে যাইতে

হয়। সহরে শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকাগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। দেব-প্রয়াগের দৃশ্য শোভা বড়ই মনোরম।

দেব-প্রয়াগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। বাজারটা ইংরাজ-দিগের অধিকারে আর অবশিস্ট অংশ গাড়োয়াল রাজের অধিকারভুক্ত। অলকনন্দা বৃটিশ ও স্বাধীন গাড়োয়ালের সীমা নিদ্ধারিত করিতেছে।

দেব-প্রয়াগের পাণ্ডারা হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষার বেশ চর্চ্চা করে। তাহাদিগের মধ্যে ইংরাজি ভাষা কেহই জানে না। পাণ্ডাদের ঘর দ্বারের অবস্থা তেমন ভাল না হইলেও তাহাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে। ৺বদরিনাথের কৃপায় প্রতি বৎসর এই সময় তাহারা যথেষ্ট উপাৰ্জ্জন করে এবং তদ্দ্বারাই তাহাদিগের সম্বৎসর এক রকম চলিযা যায়। অন্যান্য তীর্থ ক্ষেত্রের পাণ্ডাগণের ন্যায় ইহারা যাত্রিগণের নিকট অধিক অর্থের প্রত্যাশা করে না। দেখিলাম যে, ইহারা অল্পেই সন্তুস্ট।

দেব-প্রয়াগে বেশ শীত। রাত্রে আহারাদির পর বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। তখন অদূরে ৺বদরিনাথের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন হইতেছে শুনিতে পাইলাম। ঐ কীর্ত্তন শ্রবণে মনপ্রাণ বিমোহিত হইল।

দেব-প্রয়াগে যাত্রিগণের শ্রাদ্ধাদি করা বিধেয়।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—অতি প্রত্যুষে আমরা দেব-প্রয়াগ পরি-ত্যাগ করিলাম। এখান হইতে আমরা ক্রমাগত অলকনন্দার

পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রায় ৯ মাইল আসিযা আমরা "রাণীবাগ" চটীতে পঁহুছিলাম। তখন বেলা বেশী দেখিয়া উক্ত চটীতে আহারাদি করিবার জন্য উঠিলাম। এখানে ২।৩ খানা দোকান আছে। সম্মুখে এক ঝরণা; উহাব জল সুমিষ্ট ও শীতল। জলপানে তৃপ্তি লাভ হয়।

বৈকালে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কিছু দূব অগ্রসর হইয়াছি অকস্মাৎ চারিধারে মেঘ উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুসলধারে বৃষ্টিপাত। অগত্যা আমরা সত্বর চটীতে ফিরিয়া আসিলাম। বৃষ্টির সঙ্গে শিল্প ও পড়িতে লাগিল। এক একটা শিলা এক একটা বেলের মত বড়। প্রায় ঘণ্টা দুই বারিবর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হইল। আকাশেব কোথাও মেঘ নাই। চন্দ্রের আলোকে প্রকৃতি এক অপরূপ শোভা ধারণ করিল। ছোট ছোট গাছগুলি হইতে মুক্তাব ন্যায় বারিবিন্দু ঝরিতেছে, পাহাড়ের গা ব'হে বৃষ্টির জল নীচে পড়িতেছে এবং তাহাতে চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় রজতাভা বাহির হইতেছে। এ দৃশ্য দেখিতে কি চমৎকার! পার্ব্বত্যপথে যাইতে আমরা একটা বৈচিত্র্য লক্ষ করিলাম। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ আকাশে মেঘের উদয় হইল [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় বৃষ্টি, এবং অল্পক্ষণ পরে [illegible] পরিষ্কার। বঙ্গদেশে প্রকৃতির এরূপ চঞ্চলতা দেখা যায় না। ঐ চটীতে রাত্রিটা অতিবাহিত করা গেল।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—প্রাতেই আমরা যাত্রা করিলাম।

প্রায় ৫ মাইল আসিয়া আমরা এক ঝরণার ধারে উপস্থিত হইলাম। ঝরণার উপরে এক শিবমন্দির। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ বিরাজমান্। এই শিবলিঙ্গের নাম ভাল কেদার মহাদেব। এই মহাদেবকে বেলপাতা দিতে হয়। আমি দাণ্ডি হইতে নামিয়া মহাদেবকে দেখিতে যাইলাম। দেখিলাম মন্দিরটী বেশ সুন্দর; সম্মুখে বিগ্রহ বহিয়াছেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আবার দাণ্ডিতে আরোহণ করিলাম। এক্ষণে আমরা শ্রীনগর অভিমুখে চলিলাম। প্রায় ৩ মাইল আসিয়া গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করা গেল। শ্রীনগরে আসিবার পথ ঘাট বেশ ভাল। পথের উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী যাত্রিগণকে ছায়া প্রদান করিতেছে।

শ্রীনগর—ভারতের উত্তরে দুইটী শ্রীনগর আছে। একটি হ'চ্চে কাশ্মীর প্রদেশের রাজধানী, যাহাকে লোকে ভূস্বর্গ বলিয়া থাকে এবং যাহার বিবরণ আমি অমরনাথ যাত্রোপলক্ষে বর্ণন করিব। অন্যটী হ'চ্চে এই গাড়োয়াল রাজ্যের প্রধান নগর। কাশ্মীর রাজধানীর তুলনায় এই শ্রীনগর অনেকটা শ্রীহীন বটে, তথাপি ইহার সৌন্দর্য্যে একটা গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। চতুর্দিকে হিমালয়ের [illegible] স্পর্শী শৃঙ্গ সকল; মধ্যে মধ্যে জল প্রবাহ বহিতেছে ও নদীতীরে [illegible] পুষ্প বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান। অল্প দূরে পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও স্থানে স্থানে প্রাচীন জীর্ণ মন্দির সকল অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্রীনগরে প্রবেশ করিয়া আমরা এক ছোট ও পরিষ্কার ঘরে

বাসা লইলাম। তারপর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। দেখিলাম সহরটী বেশ সুন্দর। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পথের উভয় পার্শ্বে দোকান। এখানে আপিস, আদালত, বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা ইত্যাদি সবই আছে। এই সহরটী বেশ বড়; পর্ব্বতের সমতল ভুমির উপর অবস্থিত। অন্য যে সকল পার্ব্বত্য নগর দেখিয়াছি, তাহারা কোনটা পর্ব্বত গাত্রে এবং কোনটা বা অল্প সমভুমির উপর স্থাপিত। শ্রীনগরের ন্যায় এত বড় নগর পার্ব্বত্য প্রদেশে বড় একটা সচরাচর দেখা যায় না। বাজারের প্রায় সমুদয় দোকান কোটা ঘরে। সেই সকল দোকানে নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। দোকানগুলি সবই প্রায় হিন্দুর; দুই একখানিমাত্র মুসলমানের। শ্রীনগরেই যা দুচার ঘর মুসলমান দোকানদার আছে; এতদ্ভিন্ন সমস্ত গাড়োয়াল রাজ্যে আর মুসলমানের বাস নাই। দেখিলাম অধিকাংশই গরম কাপড় ও কম্বলের দোকান। তৈজসপত্রের দোকান এবং অপরাপর আরও অনেক দোকান আছে। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালাও আছে।

শ্রীনগর হইতে এক মাইলের মধ্যে কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ইহা যে কেবল একটী মন্দির তাহা [illegible]। এক ছোট রাজপ্রাসাদ। ইহার চতুর্দ্দিকে [illegible] প্রাচীর রহিয়াছে। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সিংহদ্বার। সিংহদ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনে পড়িলাম। প্রাঙ্গনের সম্মুখে লৌহগরাদযুক্ত এক শিবমন্দির; তন্মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তিতে মহাদেব বিরাজিত। তারকেশ্বর,

বৈদ্যনাথের ন্যায় এখানেও একজন মোহান্ত আছেন। অদূরে পর্ব্বতোপরি এক অতি প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে। উক্ত পর্ব্বতের নাম ইন্দ্রকীল পর্ব্বত। এই সেই মহাভারত বর্ণিত ইন্দ্রকীল পর্ব্বত যথায় পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন তপস্যার্থ গমন করেন এবং যথায় কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের অস্ত্রযুদ্ধ হয়।

শ্রীনগরে অপর একটী পাহাড় দেখিলাম; তাহার নাম অষ্টাবক্র পাহাড়। জনপ্রবাদ আছে যে অষ্টাবক্র মুনি এই পর্ব্বতে বহু কাল তপস্যারত ছিলেন।

শ্রীনগরের জলবায়ু বেশ ভাল। এখানে একমাত্র দোষ এই, যে বিছার ভয় বড় বেশী। বিছার ভয় ব্যতীত আর সব এখানকার ভাল।

বৈকালে আমরা শ্রীনগর ত্যাগ করিলাম। প্রায় ৩ মাইল আসিয়া আমরা "সুকরতা চটী" পাইলাম। ঐ চটী ছাড়াইয়া পুনবায় ৩ মাইল আসিয়া "ভট্টেসরা চটীতে" আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হওয়ায় আমরা এই চটীতে নিশা অতিবাহিত করিলাম। এখানে ২।১ খানি দোকান আছে। একটী ঝরণা ও আছে। মুখ হাত ধুইবার জন্য আমার পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া তোয়ালে ইত্যাদি বাহির করিতেছি, এমন সময় ছোট ছোট পাহাড়ী বালক বালিকারা সেইখানে ছুটিয়া আসিল। পোর্টম্যাণ্টের জিনিসগুলি দেখিয়া তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল। আমার নিকট ছুঁচ সুতা চাহিতে লাগিল। দেখিলাম যে, ছুঁচ সুতা পাইলে তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে বদরিনাথকে স্মরণ করিয়া দাণ্ডিতে উঠিলাম। দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে, আজ বেলা ১০।১১টার মধ্যে আপনাকে রুদ্রপ্রয়াগে পঁহুছাইয়া দিব। ভট্টেসরা চটী হইতে রুদ্রপ্রয়াগ প্রায় ১০ মাইল হইবে। এই দশ মাইল পথ কেবল চড়াই ও উৎরাই। ভট্টেসর চটী হইতে ৩ মাইল পরে "আক্‌রা চটী"। ঐ চটী ছাড়াইয়া আরও ৩ মাইল আসিবার পর "নারকোটা চটী" পাইলাম। নারকোটা চটী হইতে ২ মাইল আসিয়া "গুলাব চটী"। গুলাব চটীতে আসিবার পথে এক পাথরের বাড়ী দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম সেটা ধর্ম্মশালা। কিয়ৎদূর গমন করিবার পর একটা ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটা কিসের কিছুই অনুমান করিতে পারিলুম না। খানিকক্ষণ পরে আমার পূর্ব্বপরিচিত পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, ঐ শব্দ আর কিছুই নহে, একটা বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নিম্নে গড়াইয়া পড়িয়াছে। শিলাখণ্ড পর্ব্বত গাত্রে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ শব্দের উৎপত্তি। আমরা বেলা প্রায় ১১টার সময় রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। এখানে মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল। অনেকে তিনটী প্রয়াগের নাম অবগত আছেন, কিন্তু যাঁহারা উত্তরাখণ্ডের তীর্থ সকল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে এতদ্‌ভিন্ন আরও পঞ্চ প্রয়াগ বিদ্যমান। এলাহাবাদে বটপ্রয়াগ; তথায় অক্ষয় বট রহিয়াছে। উত্তরাখণ্ডে দেব-প্রয়াগ ও তৎপরে ক্রমান্বয়ে

রুদ্রপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণ-প্রয়াগ। উহাদের বিবরণ ক্রমান্বয়ে বিবৃত হইবে। এই সকল তীর্থক্ষেত্রে বাস করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে দুইটী পথ বাহির হইয়াছে। একটী পথ বরাবর অলকনন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত গিয়াছে; অপর পথটী সঙ্গমস্থলের উপর দিয়া মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছে। অধিকাংশ যাত্রিগণ এস্থান হইতে প্রথমে কেদারনাথের পথে গমনপূর্ব্বক ৺কেদারনাথ দেবকে দর্শন করিতে যান। পরে ঐ দিক্ দিয়া যে পথ আছে, সেই পথে আগমন করতঃ বদরিকাশ্রমের পথে উপস্থিত হইয়া থাকেন। আমিও প্রথমে কেদারনাথ যাইব স্থির করিলাম। অলকনন্দার সেতু পার হইয়া আমি রুদ্রপ্রয়াগস্থ এক ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। ঐ ধর্ম্মশালা তত বড় নহে, দুটী ছোট ঘর ও এক বড় বারান্দা আছে। এখান হইতে সঙ্গমঘাট প্রায় এক মাইল হইবে। সঙ্গমঘাট পর্ব্বত হইতে বহু নিম্নে; তজ্জন্য জলের নিকট যাওয়া বড় দুরূহ। মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম অতি সুন্দর দেখায়। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে নয়ন সার্থক হয়। হিমাচলের শিখরের এক দিক্ হইতে মন্দাকিনী প্রবলবেগে ছুটিয়া আসিতেছে এবং অন্য দিক্ হইতে অলকনন্দা গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিয়া মন্দাকিনীর সহিত মিলিতা হইতেছে। উভয় নদীর সম্মিলনে ভীষণ জলোচ্ছ্বাস হইতেছে। প্রচণ্ডবেগে তরঙ্গ আসিয়া পর্ব্বত গাত্রে

আঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। সূর্য্যকিরণ নদীজলে পতিত হওয়ায় উহা সুবর্ণের আভা ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান; জলের ধারে কত রকমের সুন্দর সুন্দর পাথর পড়িয়া আছে। সম্মুখে পর্ব্বত শিখরে রত্নেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দির মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের সুন্দর বিগ্রহ বিদ্যমান। দেখিলাম যে সম্মুখে পুরোহিত বসিয়া বেদাধ্যয়ন করিতেছেন ও কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী বসিয়া ভজন গাহিতেছেন। এইরূপ সাধু সন্ন্যাসী কেদার বদ্রীর পথে অনেক দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই নাম মাত্র সন্ন্যাসী, কার্য্যতঃ নহে। দেব প্রয়াগের ন্যায় রুদ্র প্রয়াগ তেমন বড় সহর নহে; ছোট একটী গ্রাম ও তাহাতে জনকয়েক গৃহস্থের বাস। এখানে একটী বাজার আছে। বাজারে দোকানগুলি যৎসামান্য। এখানে পাণ্ডাদের তেমন গোলমাল নাই।

বৈকালে আর রওনা হইলাম না। সহরের চারিধারে বেড়াইয়া আসিলাম। সে রাত্রে ঐ স্থানে বাস করিয়া পরদিন প্রত্যুষে রুদ্র-প্রয়াগ হইতে বহির্গত হইলাম।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—অদ্য রুদ্রপ্রয়াগ হইতে যাত্রা করা গেল। প্রায় ২ মাইল আসিয়া "ছতৌলি চটী" পাইলাম। এখানে ২।৩ খানা দোকান দেখিলাম। চটীর নিকটে এক ঝরনা রহিয়াছে। এখান হইতে কিয়ৎদূরে মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছেন। এই চটী নামমাত্র চটী; চারিদিক খোলা, কেবল

মাত্র চটীর ছাদ গাছের ডালপালা দিয়া আবৃত রহিয়াছে। কেদার বদ্রীর পথে দেখিলাম যে পথের দূরত্ব অনুযায়ী চটী স্থাপিত হয় নাই; যেখানেই প্যাহাড়ীরা একটু সমতল ভূমি পাইয়াছে, সেইখানেই তাহারা ২।৪ ঘব বসতি করিয়াছে ও এক একটী চটী খুলিয়াছে।

ছতৌলি চটী হইতে প্রায় ২ মাইল আসিয়া "মঠ চটী" পাইলাম। এখানে ৪।৫ খানা দোকান আছে। এখানে ঝরণা ও আছে। দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে বড় "ঘাম" উঠেছে। রৌদ্রকে স্থানীয় ভাষায় ঘাম বলে। তাহারা অল্পকাল বিশ্রাম করিল ও আমাব নিকট কয়েকটা পয়সা লইয়া দোকান হইতে খাবাব কিনিয়া খাইল। বিশ্রামলাভান্তে দাণ্ডি বাহকেরা পুনবায় রওনা হইল। পথিমধ্যে আর কিছুই দেখিবার নাই; যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকেই কেবল মেঘমালার ন্যায় পর্ব্বতশ্রেণী। আমাদের গন্তব্যপথ এখন শুধু বিজন বনপথের মধ্য দিয়া। তখন মনে হইতে লাগিল যে আমরা এই কয়জন মাত্র লোক যেন এই পৃথিবীতে জীবিত আছি। মঠ চটী পার হইয়া পথ ক্রমাগত চড়াই ও উৎরাই। এই পথে চলিতে দাণ্ডি বাহকগণের কষ্ট হইতে লাগিল। প্রায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা এক চটী পাইলাম। উহার নাম "রামপুর চটী।" বেলা অধিক হওয়ায় ও বাহকদিগকে শ্রান্তকলেবর দেখিয়া আমি আর অগ্রসর না হইয়া উক্ত চটীতে আহারাদি সমাপনার্থ আশ্রয় লইলাম।

আহারও বিশ্রাম সমাপনান্তে অপরাহ্নে পুনরায় রওনা হইলাম। যাত্রা করিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গেল, পথে যখন বাহির হইলাম, তখন ও বৃষ্টিবারি পর্ব্বত হইতে গড়াইতেছিল। প্রায় ৫ মাইল আসিয়া আমরা "অগস্ত্য চটীতে" পঁহুছিলাম। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া রাত্রি কালে ঐ চটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। চটীতে ২।৩ খানি ঘর। এখানে ৪।৫ খানি দোকানও আছে। এখানে অগস্ত্যমুনির এক আশ্রম আছে। আশ্রমে অগস্ত্যমুনির ও তাঁহার পত্নী লোপামুদ্রার প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় রহিয়াছে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—প্রভাত হইবামাত্র ইষ্টদেবকে স্মরণপূর্ব্বক বহির্গত হইলাম। আমরা প্রায় ৩ মাইল পথ আসিয়া ছোট নারায়ণের মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দির মধ্যে শ্রীভগবানের সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাহার পূজার্চ্চনা করিয়া আবার পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। প্রায় ২ মাইল আসিয়া "চন্দ্রাপুরী চটি" পাইলাম। এস্থলে এক মন্দির মধ্যে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এইস্থানে চন্দ্রানদার সঙ্গে মন্দাকিনীর সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্গমের উপর এক কাষ্ঠসেতু বর্ত্তমান। নীচে গভীর গর্জ্জনে মন্দাকিনী ছুটিতেছে। সেতুর উপর দিয়া নদী পার হওয়া গেল। নদী পার হইতে প্রত্যেক দাণ্ডির জন্য ৵০ আনা মাসুল ও প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য দুই পয়সা মাশুল দিতে হইল। এখানে দুই তিন খানা দোকান আছে। নিকটে

জলের ঝরণাও আছে। এখান হইতে প্রায় ২ মাইল আসিয়া "ভৈমী চটী" পাইলাম। এখানে মন্দাকিনীর উপর লৌহসেতু নির্ম্মিত রহিয়াছে। এখানেও দোকান হাট রহিয়াছে। দোকানে চাউল ময়দা ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়। সম্মুখে এক ঝরণা হইতে অনবরত জল পড়িতেছে। তিন মাইল পথ আসিয়া "কুণ্ড চটী" দেখিলাম। তথা হইতে মাইল দেড়েক আসিয়া আমরা বেলা ১১টার সময় "গুপ্তকাশীতে" পঁহুছিলাম। ভৈমী চটী হইতে গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত কেবল চড়াই। গুপ্তকাশীতে আমরা এক ধর্ম্মশালায় যাইয়া উঠিলাম।

গুপ্তকাশী পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত। দূর হইতে গুপ্তকাশীর ছোট ছোট বাড়ীগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। পর্ব্বতোপরি ঐ ক্ষুদ্র গ্রামখানি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এখানে অনেকগুলি দোকান আছে। থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয়, আদালত প্রভৃতি সবই আছে। এখানে ২।৩টা ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইয়াছে। আমি যে ধর্ম্মশালায় উঠিলাম, সেখানে দেখিলাম যে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী যাইবার জন্য অনেক যাত্রী রহিয়াছেন। ধর্ম্মশালার পার্শ্বেই বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির অবস্থিত। মন্দির সম্মুখে একটি বৃহৎ কুণ্ড বিদ্যমান। দুই দিক হইতে দুইটী ধারা কুণ্ডে আসিয়া পড়িতেছে। এইকুণ্ডে স্নান করিয়া গুপ্তদান করিলে মহাপুণ্য সঞ্চিত হয়। এখানে শীতের প্রকোপ বড় বেশী।

এই গুপ্তকাশীর দক্ষিণ দিকে মন্দাকিনী পার হইয়া ওখীমঠে

যাইতে হয়। অপর এক পথ কেদারনাথ অভিমুখে গিয়াছে। এখান হইতে চৌখাম্বা ও অন্যান্য তুষারাবৃত উচ্চশিখর সকল দৃষ্ট হয়। এইস্থান হইতে কেদারনাথের পথ দুর্গম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মশালায় দ্রব্যাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডে স্নান করিয়া বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে যাইয়া তাঁহার পূজাদি করিলাম। ঐ দেবালয় বেশ বড় উহার চারিদিকে সুপ্রশস্ত চত্বর রহিয়াছে। পরে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারাদি সমাপন করিলাম।

কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে অপরাহ্ন বেলা ৪টার সময় গুপ্তকাশী হইতে বহির্গত হইলাম। মাইল দেড়েক যাইযা "লালগার" চটী পাইলাম। কেদারনাথ দর্শন করিয়া যাত্রিবর্গকে পুনরায় এই লালগার চটীতে আসিয়া তবে বদরিনারায়ণের পথে যাইতে হয়। ঐ চটী ছাড়াইয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া আমরা "মৌতা চটীতে" পঁহুছিলাম। এখানে মৌতাদেবীর মন্দির রহিয়াছে। দাণ্ডি হইতে নামিয়া দেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ মাইল আসিয়া "নারায়ণ কোটী চটীতে" উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে অনেকগুলি মন্দির আছে; সে সকল মন্দিরে নারায়ণও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত। এখানে ২।৪ খানি দোকান আছে দেখিলাম। এখানে একটী বেশ বড ঝরণা আছে। ঐ ঝরণার জল বেশ পরিষ্কার ও হিম শীতল। উহার সুমিষ্ট জলপানে অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলাম। কেদার-বদ্রীর পথে অনেক ঝরণা

দেখিলাম ; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বড় ও কতকগুলি ছোট। ছোট ঝরণার জল তেমন পরিস্কার নহে, কারণ সেগুলি দেখিলাম নানাবিধ বন্য লতাপাতায় সদাই আবৃত থাকে। বড় ঝরণা-গুলির জল সুপরিষ্কার থাকে। তাহা পান করিলে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। দেবদেবী দর্শন করিয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম। প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া "বেবিঙ্গ চটীতে" উপনীত হইলাম। তখন সন্ধ্যা হওয়ায় উক্ত চটীতে রাত্রিবাস করিবার ব্যবস্থা করিলাম।

এই চটীর নীচেই এক ক্ষুদ্রকায়া নদী বহিয়া যাইতেছে। এই স্থান হইতেই কেদারনাথ যাত্রার চড়াই আরম্ভ হইল। দাণ্ডিবাহকেরা বলিল, "শেঠজী, আগাড়ী ভারি চড়াই মিলেগা।" আহারান্তে বদরি বিশালের নাম স্মরণ পূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—ভোরে উঠিয়া আবার দাণ্ডিতে আরোহণ করিলাম। এইবার পথ দুর্গম হইতে লাগিল। প্রথমে এক সরল চড়াই দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইল। পরে পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া গন্তব্যপথ। কোন কোন স্থানে উত্তরে [illegible] অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী থাকায় পথ অতি সংকীর্ণ। প্রায় মাইল [illegible]ডেক আসিয়া এক মন্দির দেখিতে পাইলাম। উহার নাম শক্তিমন্দির। মন্দির মধ্যে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। দেবদর্শন করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। প্রায় ২ মাইল আসিয়া "ফাঁটা চটী" পাইলাম।

তারপর প্রায় ৪ মাইল আসিয়া "রামপুর চটী" দেখিলাম। এখান হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ দুই মাইল পথ। দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে, আপনাকে বেলা ১১টার মধ্যে ত্রিযুগীনারায়ণে পঁহুছাইয়া দিব। ফাটা চটী হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ অবধি এই ৬ মাইল পথ কেবলই চড়াই। এই রাস্তা অতি কদর্য্য। এখানে শীতও বেশ। যতই পার্ব্বত্য পথে চড়াই উঠিতেছি, ততই প্রচণ্ড শীতে কম্পিতকলেবর হইতেছি। পথের দুর্গমতার সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন ; উক্ত চড়াই এত দুর্গম যে দৈবাৎ যদি একবার কোনগতিকে পদস্খলন হয়, তো আর প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। পথের দুই ধারেই খাদ বিদ্যমান।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা ত্রিযুগীনারায়ণের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে ৮।১০ খানা ঘর আছে এবং ধর্ম্মশালাও আছে। আমি একটী বাসা ঠিক করিয়া ও তথায় মোট ঘাট রাখিয়া অগ্রে ভগবান্ ত্রিযুগীনারায়ণকে দেখিতে যাইলাম। মন্দিরটী দেখিতে বেশ সুন্দর। উহা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত ; তন্মধ্যে অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীভগবানের সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বাম পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমানা। মন্দিরের সম্মুখভাগে এক যজ্ঞকুণ্ড রহিয়াছে দেখিলাম, তাহাতে সর্ব্বদাই অগ্নি জ্বলিতেছে। কথিত আছে যে, এই স্থানে হরগৌরীর বিবাহ হইয়াছিল। মন্দিরের বহির্ভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সরস্বতীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। এখানে ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড ও শিবকুণ্ড আছে। ব্রহ্মকুণ্ড ও শিবকুণ্ডে স্নান করিয়া বিষ্ণুকুণ্ডে তর্পণ করিতে হয়।

উপরি-উক্ত যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি সম্বন্ধে পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম, যে এই অগ্নি তিনযুগ ব্যাপিয়া জ্বলিতেছে। উহার সাক্ষী স্বরূপ নারায়ণ তিনযুগ ধরিয়া এস্থানে অবস্থান করিতেছেন। এইস্থান পর্ব্বতের এক শিখর-দেশে অবস্থিত। সে কারণে এস্থানে শীত খুব বেশী। এখানে অনেক যাত্রীর সমাবেশ দেখিলাম। দেবদর্শন কবিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর বৈকাল বেলায় পুনরায় রওনা হইলাম। প্রায় এক মাইল যাইয়া আমরা এক কাষ্ঠসেতু পার হইলাম। এইস্থানে মোহন গঙ্গার সহিত মন্দাকিনী মিলিতা হইয়াছে। ঐ সেতু পার হইয়া আমরা মোহন-প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। পরে প্রায় ৪ মাইল চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে "মাথাকাটা গণেশ চটীতে" পঁহুছিলাম। এখানে রাত্রি থাকিতে হইল। এই স্থানে এক মস্তকহীন গণেশের মূর্ত্তি আছে।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—অদ্য অতি প্রত্যুষেই যাত্রা করিলাম। আজ ভগবান্ কেদারনাথদেবকে দর্শন করিব বলিয়া মনোমধ্যে অত্যন্ত আনন্দ হইল। এখান হইতে প্রায় ৬ মাইল উৎরাই অবতরণ করিতে হইল। ঐ পথ ঢালুভাবে নীচে নামিয়াছে। সেই ৬ মাইল পথ অবতরণ করিয়া গৌরীকুণ্ডতে পঁহুছিলাম। এখানে ৫।৭ খানা চটী লোকে পরিপূর্ণ দেখিলাম। পাণ্ডা-প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, এই স্থানে গৌরী মহাদেবকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে গৌরীকুণ্ড

রহিয়াছে। তাহার নিকটে গৌরীশঙ্করের মূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দির পার্শে দুইটী কুণ্ড আছে—একটি তপ্তকুণ্ড ও অপরটী শীতলকুণ্ড। নিকটেই মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছেন। এখানে শীতের প্রকোপ বড়ই বেশী। দেখিলাম এখানে কেদার নাথের ২।৪ ঘর পাণ্ডা আছে। এখান হইতে দেড় মাইল আসিয়া ভীমসেন শীলা। এইস্থানে ভীমসেনের এক বিশালমূর্ত্তি দেখিলাম। নিকটেই এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি একপ্রকাণ্ড গুহা দৃষ্টিগোচর হইল। পাণ্ডারা বলিল যে, ঐ গুহাতে পাণ্ডবগণ মহা-প্রস্থানকালে দ্রৌপদীর সহিত কয়েক দিবস বাস করিয়াছিলেন।

এইবার আমাদের গন্তব্য পথ ক্রমাগতই চড়াই। পথ যেমন ভয়ানক তেমনি সঙ্কীর্ণ। এখান হইতে কেদারনাথের পথ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম। ইহাতে কেবলমাত্র অপরিমিত চড়াই ও স্থানে স্থানে উৎরাই। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যেমন দীর্ঘ, তেমনি দুর্গম। পথ যেরূপ দুর্গম ও কৃচ্ছ্রসাধ্য তাহা বলিবার নহে। দক্ষিণপার্শ্ব এমন নিম্ন ও গভীর যে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। একস্থানে ৶কেদারনাথদেবের কৃপায় আমার কোন গতিকে প্রাণরক্ষা হয়। এই সকল স্থানে সততই মেঘের সঞ্চার হয়। বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। এইরূপ এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমরা যে পথে যাইতেছি সে পথ এত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে যে আমাকে দাণ্ডি হইতে নামিয়া চলিতে হইতেছে। আমার হস্তে পার্ব্বত্য লাঠি রহিয়াছে, উহার সাহায্যে পর্ব্বতারোহণ করিতেছি।

আমার উভয় পার্শ্বে দাণ্ডি বাহকেরা উঠিতেছে, আমি তাহাদের একজনের হস্তধারণ করিয়া রহিয়াছি। কিয়দ্দূর আরোহণ করিলে সেই দাণ্ডিবাহকের পদস্খলন হওয়ায় সে প্রায় ২০০ ফিট নিম্নে গড়াইয়া পড়িল। সৌভাগ্যবশতঃ আমি তাহার হস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, নচেৎ তাহার সঙ্গে আমিও নিম্নে গড়াইয়া পড়িতাম। প্রায় মিনিট দশেক পর সে আবার অন্য পথ দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল; পথিমধ্যে আমার আত্মীয়া ২।৩ জন রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা কেদারনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ঐরূপ উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া যাইয়া হস্তে অল্প আঘাত প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে আর অল্পদূর অগ্রসর হইলেই ক্রমাগত তুষারাবৃত পথ। খানিকদূর যাইয়া দেখিলাম যে জনৈক স্ত্রীলোক ঝাম্পানে যাইতেছেন। বাহকদিগের দৈবাৎ পদস্খলন হওয়ায় তাহারা আরোহীসহ নীচে পড়িয়া গিয়াছে। শুনিলাম স্ত্রীলোকটী অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভীমসেন শিলা হইতে ৩ মাইল আসিয়া আমরা "রামবারী চটী" পাইলাম। সেই চটীর পার্শ্ব দিয়া প্রবলবেগে মন্দাকিনী নদী বহিয়া যাইতেছে। এখানে ৫।৭ খানা পুরীর দোকান বসিয়াছে দেখিলাম। এই চটীতে যাত্রীর অত্যন্ত ভীড়। অধিকাংশ যাত্রী এই স্থানে বিছানা পত্র রাখিয়া কেবলমাত্র নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া ৺কেদারনাথদেবকে দেখিতে যান।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে সে সমুদয় দ্রব্য লইয়া যান। এই স্থানকে সত্যপথ কহে। এখান হইতে কেদারনাথের পথ স্বর্ণপথ বলিয়াই বোধ হয়। পথের কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! চতুর্দ্দিকে গিরিশ্রেণী আপাদমস্তক তুষার বিমণ্ডিত রহিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখি যে প্রত্যেক বস্তুই রৌপ্যময় মনোহর শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছে। পথগুলি নিভৃত, উদ্ভিদ্ ও জীবশূন্য। এই পথ যেমন কঠিন, তেমনি বিপজ্জনক। কোন কোন জায়গা এরূপ খাড়াভাবে উঠিয়াছে ও বারিবর্ষণে এরূপ পিচ্ছিল হইয়াছে যে সেখানে আমাদিগকে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে হইতেছে। অল্পদূর যাইতে মুসলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। আমরা নিকটস্থ এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গুহাটী গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। দিবসেও সূর্য্যকিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। মনে হইল অন্ধকার পাপের সহায় বলিয়া সূর্য্যদেব উহার বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায়, প্রাণভয়ে অন্ধকার হিমালয়ের শরণাগত হইয়াছে। মহানুভব হিমালয়ও যেন অন্ধকারকে গুহামধ্যে আশ্রয়দান করিয়াছেন। এই গুহা সন্দর্শনে মহাকবি কালিদাসের সেই বর্ণনা মনে পড়িল,—

দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু
লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারং।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং সতীব॥

"যে হিমালয় দিবাভাগে ভীতও গুহাতে অবস্থিত অন্ধকারকে

সূর্য্য হইতে রক্ষা করেন। উদারচেতা মহাপুরুষগণ যেমন সাধুর প্রতি তেমনি অসাধুর প্রতিও মমত্ব দেখাইয়া থাকেন।”

বৃষ্টি থামিলে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। দূরে ৺কেদার নাথদেবের মন্দির দেখা যাইতে লাগিল। আমাদের চারিদিক বরফে সমাচ্ছাদিত। মন্দিরও তুষারাবৃত; কেবলমাত্র চূড়ার কিয়দংশ দেখা যাইতে ছিল। মন্দাকিনী অদূরে প্রবাহিতা হইতেছেন। তাহার উপর তুষাব জমিয়া যাওয়ায় সেতুর আকার ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের গন্তব্যপথ ক্রমাগতই বরফের উপর দিয়া। যতই অগ্রসর হইতেছি ততই বরফের স্তূপ। এত ঠাণ্ডা যে গায়ের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে। অতি কষ্টে এই ৩ মাইল পথ আসিয়া আমরা কেদারে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই কেদারনাথদেবের পাহাড় দণ্ডায়মান। উহা সমভূমি হইতে প্রায় ২২,০০০ ফিট উচ্চ হইবে। ইহা হিমালয়ের এক শিখর; এই স্থানকে লোকে কৈলাসপর্ব্বত বলে। পর্ব্বতের শিখরদেশ তুষার দ্বারা বিমণ্ডিত। এস্থানের দৃশ্য যেমম মনোরম তেমন গম্ভীর। ঐ রজতশুভ্র চিরহিমানী দর্শকের মন প্রাণ বিমোহিত করে। তদুপরি সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমাগম হয়।

কেদারগিরির উত্তর [illegible] “বাসুকী তলাও” নামে এক কুণ্ড আছে। উহা হইতেই মন্দাকিনী নিঃসৃতা হইয়া হিমাচলের উপর দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। এই মন্দাকিণী নদী রুদ্র প্রয়াগে অলকানন্দার সহ মিশিয়াছে। এতদ্‌সন্নিধানে

মহাভারত প্রসিদ্ধ মহাপ্রস্থানের পথ বিদ্যমান। কথিত আছে যে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া এই পথ ধরিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।

যে স্থানে কেদারনাথের মন্দির অবস্থিত, সে স্থানের উচ্চতা প্রায় ১৫,০০০ ফিট হইবে। কেদারে পঁহুছিয়া পাণ্ডার বাসায় স্থানাভাব হওয়ায় এক ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। সেখানকার ঘর দ্বারের অবস্থা কহতব্য নহে। অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক কুলিরা বরফ কাটিয়া জায়গা করিয়া দিল। এখানে ১০।১২ খানা ঘর দেখিলাম। ঘরগুলি সব কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও তাহাদের ছাদ তক্তা দ্বারা আবৃত। প্রত্যেক গৃহের নিম্নতল বরফের দ্বারা আচ্ছাদিত। গৃহের ছাদ হইতে বরফের জল গড়াইয়া পড়িতেছে। শীতে হাত পা একেবারে অবশ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকেই শুভ্র তুষারময় ছবি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শরীর অল্প গরম করিয়া লইলাম। পাণ্ডা প্রদত্ত মন্দাকিনী বারি স্পর্শ করিলাম। উহার হিম শীতল জলে স্নান করিবার সাধ্য হইল না। মন্দাকিনীর পূতবারি স্পর্শপূর্ব্বক কেদারনাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এতাবৎকাল পায়ে চর্ম্মপাদুকা ছিল, এক্ষণে মন্দির প্রবেশকালে উহা পরিত্যাগ করিয়া ন্যাকড়ার জুতা পায়ে দিলাম।

তুষার দ্বারা ছয় মাস কাল মন্দির আবৃত থাকায়, তখন ৺কেদারনাথের পূজাদি ওখীমঠে সম্পাদিত হয়। আমরা যখন মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখনও মন্দির দ্বারে স্তূপাকার

অন্যতম। জ্যো
উত্থিত হইয়া ' দেখিলাম। মন্দিরের চূড়া তখনও বরফে
• জ্যোতি ' পথ ঘাট তুষারে বড় পিচ্ছিল থাকায় অনেকে
যা যাইতেছেন। এই স্থান বিস্তীর্ণ ও সমতল। মন্দিরের
য়ৎদূরে সরস্বতীগঙ্গা মন্দাকিনী সহ মিশিয়াছে। কেদার নাথের স্থানটী সরস্বতী ও মন্দাকিনী—এই দুইটী নদী দুই দিক হইতে বেষ্টন করিয়াছে।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে উহার মধ্যস্থলে ৺কেদারনাথ দেবের বৃহৎ পাষাণময় বৃষভ মূর্ত্তি বিদ্যমান। ঘৃতাদি দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া বিল্বপত্র ধূপ দীপ ও স্বর্ণ রৌপ্য দিয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা করিলাম। মন্দিরে পুলিশ কর্ম্মচারীরা সুব্যবস্থা করিয়াছেন। যাত্রিগণকে এক পথ দিয়া দর্শন করাইয়া অন্য পথ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। মন্দিরের কপাটগুলি লৌহময় ও সুবৃহৎ। মন্দিরটী বহু পুরাতন; শুনিলাম উহা ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সংস্কারাভাবে উহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মন্দির সংস্কারার্থে পাণ্ডাগণ যাত্রিবর্গের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতেছে।

এই কেদারনাথ সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, এ স্থানে পাণ্ডুর পুত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মহাদেব এক সুড়ঙ্গ দ্বারা নেপালের অন্তর্গত পশুপতিনাথ পর্ব্বতে পলায়ন করেন। তজ্জন্য পশুপতিনাথ পর্ব্বতে মহাদেবের মস্তক ও এস্থানে তাঁহার দেহের অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান।

ন। কথিত আছে
হিন্দুগণের তীর্থক্ষেত্রে অন্ততঃ ত্রিরাত্র বাস উপর রাজাভার
কিন্তু কেদাব পর্ব্বতের ন্যায় চির তুষারাবৃত স্থলে লেন।
অধিক বাস করিতে সমর্থ হইলাম না।

উচ্চতা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—অদ্য কেদাব পরিত্যাগ করিলাম দায়
কেদারনাথের পাণ্ডা রামলাল আমার সঙ্গে কিয়ৎদূর আসিল।

এখান হইতে প্রকৃতির শোভা অতি চমৎকার। প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি তুষাবরাশির উপব নিপতিত হওয়ায় হিমগিরি যেন একটী রৌপ্যময় মুকুট ধারণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয। স্বভাবের এরূপ মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি দর্শকের মনপ্রাণ ভগবদপ্রেমে নিমগ্ন করিয়া দেয়। যাঁহারা দেশ ভ্রমণ ভালবাসেন ও যাঁহাদেব অনবরত তুষারাবৃত পর্ব্বত শ্রেণী দেখিবাব বড বাসনা তাঁহারা যেন বৈশাখ মাসেব প্রারম্ভে একবার কেদাব বদ্রী গমন করেন; তাহা হইলেই তাহাদের মনের বাসনা পরিপূর্ণ হইবে। এদৃশ্য এতই উল্লাসকর যে উহা না দেখিলে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কাশ্মীর প্রদেশস্থ অমরনাথ তীর্থের পথও এইরূপ হিমাবৃত। উহার বিবরণ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই বিচিত্র পার্ব্বত্যশোভা সন্দর্শনে মনে হয় যে, একজন অসীম জ্ঞানময় শিল্পী আমাদের চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া এই সকল সুন্দর জীবন্ত ছবি রচনা করিয়াছেন। এই কেদার নাথ অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্ত্তি এবং ভারতবর্ষে যে সর্ব্বসমেত দ্বাদশটী জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেব আছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে

অন্যতম। জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্ত্তি তাঁহারা যাঁহারা স্বতঃই ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, কাহারও প্রতিষ্ঠিত নহে। শিবপুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

"সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারং মামুলেশ্বরম্॥
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে॥
সেতুবন্ধেতু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে।
হিমালয়েচ কেদারং ঘীশ্বেশঞ্চ শিবালযে॥
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সর্ব্বপাপৈঃ বিমুক্তোহি ব্রহ্মলোকং প্রবিশতি॥"

(১) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, (২) শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, (৩) উজ্জয়িনীতে মহাকাল, (৪) নর্ম্মদাতীরস্থ অমরেশ্বরে ওঁঙ্কারনাথ, (৫) হিমালয়ে কেদারনাথ, (৬) ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, (৭) বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, (৮) গৌতমীতীরে (গোদাবরী তীরে) ত্র্যম্বক; (৯) পরলীতে বৈদ্যনাথ, (১০) দ্বারকায় নাগেশ (১১) সেতুবন্ধে রামেশ্বর, (১২) শিবালয়ে ঘীশ্বেশ। যে ব্যক্তি এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের নাম প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পাঠ করে, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন।

৬/কেদারনাথ দেবকে দর্শন করিয়া যাত্রিগণ পুনরায় সেইপথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লালগার চটীতে আসে; তথা হইতে ওখীমঠ

হইয়া লালসাঙ্গা নামক স্থানে বদরিকাশ্রমের পথে উপনীত হয়। কেদারক্ষেত্রের প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে লালসাঙ্গা এবং তথা হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে বদরিকাশ্রম। কেদারক্ষেত্র হইতে সরল পথে যাইলে, উহা ১৫ মাইল অধিক হইবে না; কিন্তু ঐ সরল পথ সম্বৎসর তুষারে আচ্ছন্ন থাকায় যাত্রিগণকে লালসাঙ্গা দিয়া যাইতে হয়। পুরাকালে ঐ সরল পথ দিয়াই বদরিকাশ্রমে যাওয়া যাইত, এক্ষণে ঐ পথ অগম্য হইয়াছে।

১২ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার—অতি ভোরে কেদার হইতে যাত্রা করা গেল। বেলা প্রায় ১১ টার সময় আমরা মোহন প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। তথায় আহারাদি করিয়া অল্পকাল বিশ্রামান্তে বৈকালে পুনরায় রওনা হইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে "রামপুর চটীতে" আশ্রয় লইলাম। তথায় রাত্রিবাস করিবার ব্যবস্থা করিলাম।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—প্রত্যুষেই যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় ১০টার সময় "নারায়ণ চটীতে" পঁহুছিলাম। এস্থানে কেদার নাথের যাত্রির বড় ভিড় দেখিলাম। কোন প্রকারে চটীতে অল্প স্থান পাওয়া গেল। তথায় আহারাদি সারিয়া বৈকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় ওখীমঠে উপনীত হইলাম।

এই স্থানটী এক সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। ইহার উপরে গুপ্তকাশী দেখা যাইতে লাগিল। এ জায়গা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে অনেকগুলি দোকান রহিয়াছে। সরকার বাহাদুরের এক ধর্ম্মশালাও আছে। নিকটে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় পঞ্চমুখী কেদার বিদ্যমান। এখানে কেদারনাথের

৬ মাস পূজা হয়। পঞ্চমুখীকেদার দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত পাঞ্জাবদেশীয় পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার পথের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলেন। সে রাত্র ওখীমঠে অতিবাহিত করিলাম।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—ভোরে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া ইষ্টদেব স্মরণান্তর বহির্গত হইতেছি, এমন সময় দাণ্ডিবাহকগণের মধ্যে একজন বলিল যে, তাহার জ্বর হইয়াছে, সে চলিতে পারিবে না। পথিমধ্যে বিলম্ব করিব না, যত শীঘ্র পারি বিশাল বদরিকানাথকে দর্শন করিব ইহাই আমার সঙ্কল্প। লোকটীর জ্বরের কথা আমার সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নিকট প্রকাশ করায়, তিনি বলিলেন যে, জ্বরের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; বোধ হয় নিকটে উহার কোন বাসা আছে, সে কারণে এই অছিলা করিতেছে। তখন উক্ত দাণ্ডিবাহককে কহিলাম যে, সে যদি আমার সহিত এইরূপ অন্যায় ব্যবহার করে তাহলে আমি তাহাকে পারিশ্রমিক কিছুই দিব না। তখন সে যাইতে রাজী হইল।

প্রায় ৬ মাইল পথ আসিয়া "দুর্গা চটীতে" উপনীত হইলাম এই ৬ মাইলের মধ্যে অপর কোন চটী নাই, এবং এই ৬ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে দাণ্ডিবাহকদিগের পরিশ্রম কিছু কম হয় নাই। আরও ১ মাইল আসিয়া আমরা "পথিচটী" পাইলাম। যদিও বেলা অধিক হয় নাই, তথাপি রৌদ্রের তেজ অতি প্রখর। দাণ্ডিবাহকেরা গলদ্ঘর্ম্ম হইতে লাগিল;

আর পথ চলিতে পারিল না। অগত্যা আমাকে উক্ত চটীতে আশ্রয় লইতে হইল। এই চটী বড় ছোট; খান দুই মাত্র ঘর আছে। এখানে জন মানবের সম্পর্ক নাই; বোধ হইতে লাগিল যে আমিই এ রাজ্যে এক মাত্র প্রাণী জীবিত আছি। এস্থান পৃথিবীর নিতান্ত বিজন, নেপথ্যে অবস্থিত। ইহা এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকার উপরি সন্নিবেশিত। এখান হইতে একটী পথ তুঙ্গনাথ পর্ব্বতাভিমুখে গিয়াছে। তুঙ্গনাথ কৈলাস শিখরে প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি আরোহণ করা সুকঠিন। তজ্জন্য কেহ বড় তথায় যাইতে পারে না।

এখান হইতে দূরে তুষারাবৃত কেদারনাথ, বদরিনাথ, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর পর্ব্বত চতুষ্টয় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। উহাদের উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়ায় উহারা স্বুবর্ণমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে দৃশ্য দর্শনযোগ্য।

বৈকালে আবার যাত্রা করিলাম। প্রায় মাইল দুই আসিয়া "চৌপত্তী চটী" পাইলাম। প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে আমি ৩।৪ মাইল পদব্রজে যাইতাম; তজ্জন্য আমার জুতা ছিড়িয়া গিয়াছিল। এখানে একজন মুচি জুতা সারাইতেছে দেখিয়া তাহার নিকট আমার জুতা মেরামত করিয়া লইলাম। চামড়ার সুতা দ্বারা সে সেলাই করিয়া দিল। উহা বড় মজবুত হইল। চৌপত্তা চটী ছাড়াইয়া আমাদের প্রায় ৩ মাইল উৎরাই নামিতে হইল। এই পথ অবতরণ করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিকটেই এক চটী পাইলাম। তাহার নাম "ভৈমুড়িয়া চটী"। এই

চটীতে আশ্রয় লইলাম। ইহা নামমাত্র চটী; ইহার তিন দিক অনাবৃত। রাত্রে বৃষ্টিপাত হইল। জলের ঝাপটায় চটী ভাসিয়া গেল। আমরা কোন গতিকে রাত্র অতিবাহিত করিলাম।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার---সকালে উঠিয়া দেখিলাম যে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার ও সূর্য্যদেবের কিরণে চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত হইতেছে। মুখ হাত ধুইয়া এবং মোট বিছানা ঠিক করিয়া যাত্রা করিলাম। কিয়ৎদূর যাইতে না যাইতে দেখিলাম যে অদূরে শিলা বৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু আমরা যে স্থানে রহিয়াছি সে স্থান বেশ পরিষ্কার। তথাপি দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে এখানেও শিলাবৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। অগত্যা চটীতে ফিরিতে হইল। অল্পকাল মধ্যে বৃষ্টি থামিয়া যাইলে আবার চলিতে লাগিলাম।

পথিমধ্যে স্থানে স্থানে দেখিলাম অসংখ্য দেবদারু বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্ববিধাতার মহিমা কীর্ত্তনে নিমগ্ন। স্থানে স্থানে সুকণ্ঠ পক্ষিগণের কণ্ঠস্বর পথিকের কর্ণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছে। স্থানে স্থানে বিবিধ জাতীয় পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া দশদিক আলোকিত করিতেছে; কিন্তু সে জন-মানবহীন স্থানে উহারা বিকশিত হইতেছে ও ঝরিয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কত রকম গাছপালা দেখিলাম। ঐ সকল গাছপালা হইতে মানবের কত উপকারজনক ঔষধাদি প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু কয়জন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সকল স্থানে আগমন করেন

এবং সাধারণ লোকের ঐ গাছ গাছড়া চিনিবার ক্ষমতাই বা কোথায়? পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যৎদ্বারা জন সাধারণের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। সামান্য ব্যক্তি উহা চিনিতে না পারায়, উহারা পড়িয়া থাকে, কাহারও প্রয়োজনে আসে না। কবির ভাষায় বলিতে হয়, —

অমল-কোমল-প্রভা অসংখ্য রতনে,
সাগর অতল-গর্ভে আঁধারে লুকায় ;
কুসুম-স্তবক কত সলাজে গোপনে,
ফুটি মরু-সমীরণে মাধুরী বিলায়।

মাইল ৪ আসিয়া "সাগর সাগা" চটীতে আসিলাম। চটীর নিকটে এক ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছে। নদীর উপর এক কাষ্ঠ সেতু বিদ্যমান। আমাদের ঐ সেতুর উপর দিয়া গন্তব্য পথ। তদুপরি যাইতে যাইতে আমার দাণ্ডি একটা কাঠে সবেগে আঘাত প্রাপ্ত হইল। উহাতে আমি অল্প শিহরিয়া উঠিলাম। দাণ্ডিবাহকগণের মধ্যে পূর্ব্বরাত্রে যে অসুখের ভাণ করিয়াছিল, সে বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই দাণ্ডি কাঠে বাধাইয়া দিয়াছিল। তখন দাণ্ডির অবস্থা না দেখিয়াই চলিতে লাগিলাম। প্রায় ৪৷৷০ মাইল আসিয়া "মন্তাল চটী" পাইলাম। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত দেখিয়া সেখানে আহারাদি করিবার ব্যবস্থা করিলাম। আহারান্তে যখন শৌচ ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় আমার পাচক বলিল যে, মহাশয় আপনার দাণ্ডি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি

মহা ভাবনায় পড়িলাম; এখনও বদরিকাশ্রমে পঁহুছিতে অনেক দিন লাগিবে এবং এখানেও কোনরূপ যান পাওয়া যায় না। ভাবিতে লাগিলাম, "ঠাকুর এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিতেছি, তোমার মনে কি এই ছিল?" ভাবনায় মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। দাণ্ডিব নিকট আসিয়া দেখিলাম যে, দাণ্ডির পশ্চাদ-ভাগের কাষ্ঠ ভাঙ্গিযা গিযাছে; তবে উহাতে যে লৌহ ছিল তাহাব কোনরূপ ক্ষতি হয নাই। তখন বাহকেরা দড়ি দ্বাবা উহা মেবামত কবিযা দিল। দাণ্ডি বলিযাই পুনশ্চ কার্য্যক্ষম হইল, কাণ্ডী বা ঝাম্পান হইলে উহা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত তথাপি দাণ্ডিবাহকেবা বলিল যে, শেঠজী পথে কোনরূপ বিপদ্ আপদ্ হইলে আমবা তাহার জন্য দায়ী নহি। আমি তাহাদিগকে অভয প্রদান কবায় তাহারা যাইতে প্রস্তুত হইল।

অপরাহ্নে আবাব যাত্রা কবিলাম। ৩ মাইল আসিয়া "সিংখোল্লা চটী' পাইলাম। এই পথ আসিতে দাণ্ডির কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। বাত্রে ঐ চটীতে থাকা গেল। শয়নকালে দাণ্ডি আমার শয্যার পার্শ্বেই রাখিলাম। ইতিপূর্ব্বে দাণ্ডি বাহকদিগের নিকট দাণ্ডি থাকিত; এখন হইতে উহাদের নিকট উহা রাখিতে আমার প্রত্যয় হইল না।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—প্রত্যূষেই মস্তাল চটী পরিত্যাগ করিলাম। প্রায় ৩ মাইল আসিয়া "হিমখালি চটী" দেখিলাম। পথে আসিতে আসিতে এক আধ খানা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইতে

লাগিল। সে গ্রামগুলি আর কিছুই নহে; ৫।৭ খানা ঘর, একত্রে সন্নিবেশিত। সকলেরই কতকগুলি মহিষ, গরু ও ছাগল আছে। এই কেদারবদ্রীর পথে সকল স্থানেই দেখিলাম যে, পাহাড়ী পুরুষেরা জমিতে লাঙ্গল দিতেছে এবং স্ত্রীলোকেরা শস্য কাটিতেছে ও শস্য আছড়াইয়া পৃথক্ করিতেছে। তাহাদের বালক বালিকাগণও তাহাদের পিতামাতার কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। এই পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ সকলেই বেশ বলিষ্ঠ ও কষ্ট সহিষ্ণু। রমণীগণের পরণে এক একটী ঘাঘরা ও গায়ে গরম কাপড়ের এক একটী জামা; কেহ এখানে খালি গায়ে থাকিতে পারে না, কারণ শীতের প্রকোপ এখানে বড় বেশী। পথিমধ্যে যাত্রিবর্গকে দেখিলেই বালক বালিকারা ছুটিয়া আসে ও ছুঁচ সুতা চাহিতে থাকে। এই দুই দ্রব্য উহাদের বড় প্রিয় দেখিলাম। এখানে দ্রব্যাদি সব বড় বড় ছাগলের পৃষ্ঠে বাহিত হয়। চাউলের মূল্য এস্থানে বড় বেশী; প্রতি সেরের মূল্য প্রায় ৸৹ বার আনা। আটার মূল্য অনেক কম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই দ্রব্যাদির মূল্য অধিক হইতে লাগিল, এমন কি চাউলের মূল্য প্রতি সের এক টাকা হইল।

প্রায় ২॥৹ মাইল আসিয়া আমরা "গোপেশ্বর চটীতে" উপস্থিত হইলাম। এখানে ৪।৫ খানা দোকান আছে। দাণ্ডিবাহকেরা এখানে একটু বিশ্রাম করিল। এখানে একটী সুন্দর নির্ঝরিণী রহিয়াছে। দাণ্ডিবাহকেরা বিশ্রামকালে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "শেঠজী, আপনি ধূমপান করিবেন কি?"

আসল কথা, আমি যদি ধূমপান করি তাহলে তাহারাও ধূম পানের ২।৪টা দ্রব্য পাইতে পারে। আমি কখনই ধূম পান করি না, কিন্তু তাহাদিগকে পয়সা দেওয়ায় তাহারা নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে উহা কিনিয়া খাইল। এখানে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। আমি দেবদর্শনপূর্ব্বক দাণ্ডিতে আরোহণ করিলাম। প্রায় ২ মাইল আসিয়া আমরা লালসাঙ্গায় পঁহুছিলাম। যাঁহারা রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারনাথ দর্শন করিতে যান, তাঁহারা এখানে আসিয়া বদরিনারায়ণের পথে মিলিত হন। কেহ কেহ রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারনাথ দর্শনে না যাইয়া অলকনন্দার ধার দিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহাদিগকে এক সেতু পার হইয়া এদিকে আসিতে হয়। এস্থলে সর্ব্বদাই যাত্রিগণে পরিপূর্ণ থাকে। এখানে কেদার নাথের ও বদরিনাথের এই উভয় পথের যাত্রিবর্গকে আসিতে হয়। আমি লালসাঙ্গায় অপেক্ষা না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে উহা ভাল করিয়া দেখিব এই স্থির করিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রায় ২ মাইল আসিয়া মঠ চটী দেখিলাম। বেলা বেশী হওয়ায় তথায় আশ্রয় লইলাম। এখানে বিরহগঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল। এস্থানে গঙ্গা খুব প্রশস্ত। স্থানে স্থানে ধস্ ভাঙ্গিয়াছে দেখিলাম।

আহারাদি সারিয়া বৈকালে আবার রওনা হইলাম। দাণ্ডি ভাঙ্গার জন্য কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না। আমরা বেশ চলিতে লাগিলাম। ২ মাইল আসিয়া "বারুণী চটীতে" উপনীত হইলাম।

পথিমধ্যে এক পশলা বেগে বৃষ্টিপাত হইয়া গেল। আমি ওভারকোটে মস্তক আবৃত করিয়া কোন গতিকে বসিয়া রহিলাম। দাণ্ডিবাহকেরা তখনও পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। উভয় পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বতমালা গগণস্পর্শ করিতে প্রয়াসী হইয়া দণ্ডায়মান। এক্ষণে আমাদের গন্তব্য পথ পর্ব্বতের গাত্র দিয়া, সে কারণে উহা বড়ই অপ্রশস্ত। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ীদের ২।৪ খানা ঘর আছে। তবে এই বদরিকাশ্রমের পথ কেদার নাথের পথের ন্যায় তেমন দুরূপ বা বিপজ্জনক নহে। প্রায় ১২।১৩ মাইল অন্তর সরকার বাহাদুর ডাক্ বাঙ্গলা (Dak Banglow) নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই বদরিনারায়ণের পথে বদরিকাশ্রম অবধি টেলিগ্রাফের তার বসিয়াছে। কেদার নাথের পথে এ সব কিছুই নাই। আর ১ মাইল পরে আমরা "সিয়া চটীতে" আসিলাম। এখান হইতে প্রায় ২ মাইল, আমাদিগকে এক উৎরাই অবতরণ করিতে হইল। এই পথ নামিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিকটেই এক চটী ছিল উহার নাম "হাট চটি"। তথায় রাত্রি যাপনার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উক্ত চটীর নাম হাট চটী হইলেও তথায় কোন বাজার হাট নাই। চটীতে বিশ্রাম করিবার জন্য অল্প স্থান মিলিল বটে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য তেমন মিলিল না। যৎসামান্য জলযোগ করিয়া নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম। এই পার্ব্বত্য পথে ভ্রমন কালে দেখিয়াছি যে তথায় অন্যান্য দ্রব্যের অভাব হইলেও নিদ্রা বড়ই সুলভ ছিল। শয়ন মাত্রেই নিদ্রা ও এক ঘুমে রাত্রি অতিবাহিত হইত।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার —রাত্র প্রভাত হইবামাত্র পুনরায যাত্রা আবম্ভ করিলাম। এদিকে ক্রমশঃ গাছপালা কমিয়া আসিতেছে। প্রায় ৫ মাইল পথ চলিবাব পব এক বাজাব দৃষ্টিগোচর হইল। বাজারেব নাম পিপল কুঠী। তাহার সম্মুখেই এক চটী বহিযাছে। ঐস্থান পর্ব্বতেব সমভূমির উপব অবস্থিত। গন্তব্য পথ হইতে খানিক উপরে উঠিলে বাজার পাওয়া যায়। বাজারে ১০।১২ খানা দোকান আছে। প্রযোজনায় দ্রব্যাদি এখানে সমস্তই পাওযা যায। বাজার যেস্থানে অবস্থিত তাহাব চারিদিকে নিম্নভূমি। সেখানে গো মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশু সকল বিচরণ করিতেছে, উপর হইতে তাহাদিগকে ক্রীড়াঘরেব এক একটী পুতুলের ন্যায় দেখাইতেছে। এখান হইতে ২ মাইল আসিয়া "গড়ুইগঙ্গা" চটী পাইলাম। তৎসন্নিকটেই গড়ুরগঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছে। আমি দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিয়া ঐ নদীর ধারে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিলাম। জলের ধারে উপবিষ্ট হইযা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। তথায় কত প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রস্তরখণ্ড নযন পথে পতিত হইল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অশেষগুণ সম্পন্ন শুনিলাম। কোন কোন প্রস্তর খণ্ড আছে, যাহা জলে ঘসিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। কতকগুলি আছে, যাহা নিকটে রাখিলে সর্প বিচ্ছু ইত্যাদির ভয় নিবারিত হয়। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। প্রায় ২ মাইল আসিয়া "সাগ্নী চটীতে" উপনীত হইলাম। তখন বেলা প্রায় ১২ টা

হইবে। এখানে মধ্যাহ্নকালীন আহারাদি শেষ করিয়া লইলাম।

বৈকালে আবার রওনা হইলাম। প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এক চটীতে উপনীত হইলাম। এই তিন মাইল পথ ক্রমাগত উৎরাই। এই পথ আসিতে তখন যদিও সন্ধ্যা হয় নাই তথাপি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় উক্ত চটীতে আশ্রয় লইলাম। এই চটীর নাম "পাতাল গঙ্গা চটী"। চটীর ঠিক সন্নিকটে এক ছোট নদী প্রবাহিতা হইতেছে এবং সেই নদীর নাম পাতাল গঙ্গা বলিয়া তাহারই নামানুসারে চটীর নাম পাতাল গঙ্গা চটী হইল। গন্তব্য পথ হইতে অনেক নীচে নামিলে নদী জল স্পর্শ করিতে পারা যায়। যাত্রিগণকে উক্ত নদীর জল লইতে নীচে অবতরণ করিতে হয় না; চটির পার্শ্বেই এক ঝরণা আছে এবং যাত্রিবর্গ তাহার জল ব্যবহার করে। চটীর অনতিদূরে চটী ওয়ালার ঘর। পূর্ব্বরাত্রে ঐ চটীতে জনৈক বনিকের প্রায় দুই হাজার টাকা চুরি গিয়াছে শুনিলাম। সেজন্য কোতোয়ালি হইতে জমাদার আসিয়া যাত্রিগণকে খুব সতর্ক থাকিতে বলিল। সে রাত্রে আমাদের কাহারও সুনিদ্রা হইল না। প্রকৃত চোর তখনও ধৃত হয় নাই। সকলেই অনুমান করিতে লাগিল যে চোর বিদেশীয় হইবে। এই অশিক্ষিত পর্ব্বতবাসী সকলেই প্রায় ধর্ম্মভীরু, সরল ও বিশ্বাসী। ইহারা যদি চোর ডাকাত হইত তাহলে উত্তরাখণ্ডের পথে কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারিত না।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আমরা যাত্রা করিলাম। পথে আসিয়া দেখিলাম যে চারিদিক হইতে জলধারা বহিতেছে; বুঝিলাম যে গত রাত্রে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২ মাইল আসিয়া "গুলাব চটী" পাইলাম। চটিখানি নিতান্ত ছোট, তাহাতে একখানি মাত্র ঘর এবং সেই ঘরখানিতে দেখিলাম যে একদল সাধু বসিয়া রহিয়াছে। শুনিলাম ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হয়। "গুলাব চটী" পার হইয়া কুম্ভার চটিতে আসিলাম। এই পথে প্রকাণ্ড এক চড়াই অতিক্রম করিতে হইল। এই চটিতে পূর্ব্বোক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছিল দেখিয়াছেন কি ?" আমি উহা দেখি নাই, তবে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাই। তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে করিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়া গেল। তিনি পদব্রজে যাইতেছিলেন; সুতরাং শীঘ্রই দণ্ডিবাহকদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইলেন। প্রায় ৪ মাইল আসিয়া "খতৌলি চটীতে" আসিলাম। এই উত্তরাখণ্ডের পথে ভ্রমণকালে ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে পথের দূরত্ব অনুসারে চটী খোলা হয় নাই; যেখানে ঘর নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা জনক স্থান মিলিয়াছে, ঝরণা নিকটে আছে ও যেক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য প্রচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, এমন স্থানে এক একটী চটী খুলিয়াছে। আবার এক মাইল আসিয়া এক চটী দেখিলাম; উহার নাম "স্রোতধারা" চটী। এখানে ২।৩টি ক্ষুদ্রকায়া নদী অলকানন্দার সহিত মিলিতা

হইয়াছে। কয়েকটি নির্ঝরিণীও এখানে আছে। এই সকল নদী ও নির্ঝরিণী থাকায় এস্থানের নাম স্রোতধারা হইয়াছে। স্থানটি বেশ মনোরম। স্রোতধারা হইতে এক মাইল আসিয়া আমরা যোশীমঠে উপস্থিত হইলাম।

যোশীমঠ—ইহা হিন্দুদিগের নিকট এক মহাতীর্থ। ইহা এক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্ত্তিস্থল। সেই মহানুভব মহাপুরুষের নাম শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য। তাঁহার জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মতামত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশে কালাদি নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্কর চিদম্বরম্ নামক স্থানে অবতীর্ণ হন। এই ত গেল জন্মস্থানের কথা; তাঁহার জন্মকাল লইয়াও নানাজনের নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রফেসর উইলসন সাহেব বলেন যে শঙ্করাচার্য্য ৮০০ হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। যাহা হউক শঙ্করাচার্য্য যে স্থানে, যে কালে এবং যাঁহার গৃহেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি যে ভারতে একজন অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত ও দার্শনিক, আর্য্য ধর্ম্মের উদ্ধারকর্ত্তা ও অদ্বৈতবাদপ্রবর্ত্তক এবং ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদ্ প্রভৃতির ভাষ্যকার ছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইনি হিন্দুর চারিটী মহাতীর্থে —চতুর্দ্ধামে—চারিটী মঠ স্থাপন করেন। বদরিকাশ্রমের পথে এই যোশীমঠ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যে মঠ স্থাপিত আছে তাহার নাম শৃঙ্গগিরি মঠ বা বিদ্যামঠ এবং শ্রী

মঠের শিষ্যগণের নাম ছিল ভারতী-সম্প্রদায়। শঙ্করাচার্য্য দ্বারকাধামে যে মঠ নির্ম্মান করেন তাহার নাম সারদামঠ এবং পুরুষোত্তমে আসিয়া গোবর্দ্ধন নামক এক মঠ স্থাপন করেন। এই চারি ধামে চারি বেদ প্রচারের জন্য চারিটী মঠ স্থাপিত হয়; পুরুষোত্তম বা পুরীধামের গোবর্দ্ধন মঠ ঋগ্‌বেদ প্রচারার্থ, সারদামঠ সামবেদ প্রচারার্থ, বিদ্যামঠ যজুর্ব্বেদ প্রচারার্থ ও যোশীমঠ অথর্ব্ববেদ প্রচারার্থ স্থাপিত হয়।

এই যোশীমঠে অনেক পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল পুঁথি হইতে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক লুপ্তপ্রায় তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

যে স্থানে শঙ্করের মঠ স্থাপিত, সে স্থান যোশীমঠ হইতে এক অনুচ্চ পর্ব্বতোপরি অবস্থাপিত; তৎপাদদেশে যে অল্প পরিমিত সমভূমি বিদ্যমান তথায় ৺বদরিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত। বদরিকাশ্রম বৎসরের বেশীর ভাগ সময় তুষারাবৃত থাকায় কেহ সে স্থানে যাইতে পারেন না; তজ্জন্য এইস্থানে তখন বদরিকানাথের পূজা হইয়া থাকে। মন্দির মধ্যে বদরিনাথ দেবের মূর্ত্তি দেখিলাম। সেখানে যাত্রিগণকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। বেশ সুবন্দোবস্ত দেখিলাম, যাত্রিবর্গকে একে একে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দর্শন করাইতেছে। এখানে দণ্ডধারা আছে, উহাতে স্নান করিতে হয়। ডাকঘর টেলিগ্রাফ অফিস, থানা ইত্যাদি সমস্তই আছে। এখানে সরকার বাহাদুর নির্ম্মিত একটী হাঁসপাতালও আছে। হাঁসপাতালে

১০।১২ জন রোগী রহিয়াছে দেখিলাম। এখানে অনেক গুলি দোকান আছে; দোকানে আহার্য্য দ্রব্য ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। অধিকাংশ দোকান ঘর দ্বিতল। সহরে এক বাজার আছে: তথায় সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়, এমন কি স্বর্ণকারেরও দোকান সেখানে রহিয়াছে। ছবির দোকানে ৺ বদরি নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি বিক্রীত হয়।

এই যোশীমঠ বদরি নারায়ণের মোহন্তের বাস স্থান। এই সকল কারণে যোশীমঠ বেশ সমৃদ্ধ সহর। এখান হইতে বদরি নারায়ণ ক্ষেত্র ২০ মাইল হইবে। যাঁহারা মানস সরোবর দর্শনে গমন করেন তাঁহাদের এই যোশীমঠ হইতেই অপর একটী পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে হয়। তবে এই পথ বড়ই দুর্গম, সর্ব্বদাই বরফাচ্ছন্ন থাকায় বড় কেহ যাইতে প্রয়াসী হন না। আষাঢ় মাসের শেষে যখন বরফ গলিতে থাকে, তখন কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী তথায় গমন করেন। একে এই কষ্টকর পথ, তদুপরি-খাদ্যদ্রব্য ও বাসস্থানের অভাব প্রযুক্ত গমনেচ্ছু ব্যক্তি গণের যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়।

যোশীমঠ কেবল যে হিন্দুগণের উপাস্য দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান তাহা নহে, ইহা পুরাকালের ঋষিগণের কীর্ত্তিকলাপে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতে তথা হইতে যাত্রা করিলাম।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—প্রত্যুষেই রওনা হইলাম। প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। এই এক

মাইল পথ কেবল খাড়া উৎরাই। দাণ্ডি বাহকেরা অতি সন্তর্পণে নীচে নামিতে লাগিল। এমন ঢালুপথ যে কোন প্রকারে যদি একবার পদস্খলন হয় ত আর রক্ষা নাই। খানিক পথ নামিতে দূরে এক গভীর জলকল্লোল শুনিতে পাইলাম। কিসের যে ঐ শব্দ প্রথমে কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না, ক্রমে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা বিষ্ণুগঙ্গা বা ধবলগঙ্গা দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যে এ স্থানে বিষ্ণুগঙ্গা অলকানন্দার সহিত মিলিতা হইয়া এই ভীষণ গর্জ্জন উৎপাদিত করিতেছে। উভয় নদীর সঙ্গমস্থল বিষ্ণু প্রযাগ নামে অভিহিত। বিষ্ণুগঙ্গার স্রোত অতি প্রবল এবং উহা উচ্চ নীচ পথ ধরিয়া প্রবাহিতা হওয়ায় এত গভীর গর্জ্জন করিতেছে। আমরা এক কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু পার হইলাম। শুনিলাম যে উহা সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে নদীর উপর দড়ির পুল ছিল। সেতু অতিক্রম পূর্ব্বক আমরা উচ্চ তীরভূমিতে আরোহণ করিলাম। নদীতটের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। মন্দির মধ্যে শ্রীভগবান হরির সুন্দর বিগ্রহ বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্গমঘাট পর্য্যন্ত পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। নদীর তরঙ্গ সকল সঙ্গমঘাটে প্রবল বেগে আঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে। সোপান হইতে একবার পদচ্যুত হইলে গঙ্গালাভ করিবার বিশেষ সুবিধা দেখিলাম। মন্দির-বহির্ভাগে অল্প বারান্দা রহিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বড় বড় কপাট লাগান আছে, তাহাদের তিনটি সদা সর্ব্বদাই

আবদ্ধ থাকে। শুনিলাম ইন্দোরের রাণী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও সঙ্গমঘাটের উপর এই সোপানাবলী প্রস্তুত করান। ঘাটে নামিতে সাহস হইল না। দাণ্ডিবাহকদের একজন একটু জল আনিয়া দিল, তাহাই স্পর্শ করিলাম।

বিষ্ণু-প্রযাগ বদরিকাশ্রমের দ্বাবস্বরূপ। এই ধবলগঙ্গাই বিষ্ণুগঙ্গা নামে অভিহিতা। মন্দিরের বহির্ভাগে সোপানোপরি বসিযা সেখানকার সঙ্গমঘাটেব শোভা নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলাম। এ পর্য্যন্ত অনেকানেক সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির এমন মনোমুগ্ধকর ছবি সচরাচব নয়নগোচর হয় না। অনেকক্ষণ সেস্থানে উপবিষ্ট থাকিযা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। পার্শ্বে বিশাল পর্ব্বতাবলী যেন গগনস্পর্শ করিবার জন্য প্রয়াসী এবং সম্মুখে তটিনীদ্বয কুলু কুলু রবে অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত। নদীর তটোপরি এই বিষ্ণু মন্দির উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত থাকায় ভক্তের মনোমধ্যে বিপুল আনন্দ প্রদান করিতেছে। বিষ্ণু-গঙ্গাব ও অলকানন্দার উদ্দাম তরঙ্গমালা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে। এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে পারা যায় না। যাহারা উত্তরাখণ্ডের এই পথে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারাই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

তথায় দর্শনীয় সমস্ত বিষয় অবলোকন করিয়া ও গঙ্গাতীরস্থ শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এখান হইতে বদরিকাশ্রম ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ১৯ মাইল

পথ বড়ই খাবাপ। উহা প্রকৃতির স্বভাবজাত পথ বলিলেই হয়। পথ ঘাট পূর্ব্ববৎ সরল নহে। এক্ষণে আমরা ক্রমাগত চড়াই ও উৎরাই পাইতে লাগিলাম। পথে আমাদিগকে এক ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইল। উহার উপর যে কাষ্ঠ সেতু বিদ্যমান ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বাহকদিগকে বহু কষ্টে এই পথে চলিতে হইল। কখন বা তাহাদিগকে চড়াই আরোহণ করিতে হইতেছে এবং পরক্ষণেই তাহাদিগকে উৎরাই নামিতে হইতেছে, ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট পরিশ্রম হইতে লাগিল। পথ ক্রমশঃ দুর্গম হইতে দুর্গমতর হইতে লাগিল। দাণ্ডিবাহকগণ পর্ব্বতনিবাসী বলিয়া প্রত্যহ এই দুর্গম পথে ১২।১৩ মাইল চলিতে পারিত। তবে এই পার্ব্বত্য পথে জলকষ্ট নাই; কারণ ২।৩ মাইল অন্তর ঝরণা আছে। উহা না থাকিলে যাত্রিগণ যাতায়াতকালে তৃষ্ণায় মরিয়া যাইত। প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক আমরা "বলদৌড়া চটী" পাইলাম। এ চটীটা ছোট, দু তিন খানি দোকান আছে। একে ত ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্র, তদুপরি ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এই চটী হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক নদী পাইলাম। নদীর উপর যে ভগ্নপ্রায় সেতু ছিল তাহার উপর দিয়া গমন করিতে আমাদের অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। দাণ্ডিবাহকেরা স্থির পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত লৌহ সেতুর উপর দিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা যায়; কিন্তু এই তো পাহাড়ী কারিগর

দ্বারা নির্ম্মিত এই কাষ্ঠের সেতু, তাহার উপর ইহার এরূপ শোচনীয় অবস্থা. এহেন সেতুর উপর গমন করিতে জন সাধারণের ভয়েব উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে। বোধ হইতে লাগিল যে অচিরেই ইহা নদীগর্ভে বিলীন হইবে। প্রায় ২ মাইল আসিয়া "ঘাটচটী" দেখিলাম। এই চটীর তিনদিক অনাবৃত, কেবলমাত্র একদিক কাষ্ঠ দ্বারা আবৃত। চটীর উপরিভাগ গাছের ডালপাতা আবৃত রাখিয়াছে। উক্ত চটীতে আহার্য্য দ্রব্য যৎসামান্য বহিয়াছে। তথায় বন্ধন কবিবাব জন্য ১০।১২টী মৃন্ময় উনান বর্ত্তমান। এই চটী ছাড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। অদূরে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা দণ্ডায়মান। উহাদের শৃঙ্গ সকল তুষারে আবৃত। আমরা যে পথে চলিতেছি সে পথ এক নির্জ্জন উপত্যকায়. জন মানবেব বসবাস নাই তখন মনে হইতে লাগিল যে, এই সকল স্থান কি পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত? খানিক পথ আসিলে অল্প লোকালয় দৃষ্টিগোচব হইল। লোকালয় অর্থে ২।৪ ঘর পাহাড়ীদের বাসস্থান আছে। তাহারা তথায় অল্প জমীতে চাষ বাস করিতেছে। অনতিদূরে অলকানন্দা বক্রগতিতে প্রবহিতা হইতেছে। আরও প্রায় ৩ মাইল আসিয়া আমরা "পাণ্ডুকেশ্বরে" উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় ১২টা হইবে। সে দিবস তথায় থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

পাণ্ডুকেশ্বর—ইঁহার অপর আর এক নাম যোগবদরী। এই স্থানটী অতি রমণীয়। চটীর চতুর্দ্দিকে নানাজাতীয়

বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান। উহারা পথশ্রান্ত পান্থগণকে ছায়া প্রদান করিয়া যেন আতিথ্য সৎকার করিতেছে। চটীর সন্নিকটে যে নির্ঝরিণী আছে তাহার জল কি সুমিষ্ট! স্থানে স্থানে "বৌ কথা কও" ও "দোয়েল" পক্ষী ঐ স্থানকে তাহাদের কণ্ঠস্বরে মুখরিত করিতেছে। দুই একটি ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী পর্ব্বত হইতে কুলু কুলু রবে নীচে নামিয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে পাণ্ডুকেশ্বর আমার নিকট বড় মনোহর বোধ হইতে লাগিল। এ স্থানের নাম পাণ্ডুকেশ্বর কেন হইল, তাহা অবগত হইবার জন্য আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে এস্থানে মহারাজ পাণ্ডু দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করেন, তজ্জন্য এ স্থানের নাম পাণ্ডুকেশ্বর হইল। স্থানীয় জনপ্রবাদ যে এই স্থানেই মহারাজ পাণ্ডু মৃগ ভ্রমে এক মুনির পুত্রকে শরবিদ্ধ করেন। যখন দেখিলেন যে উহা মৃগ নহে, এক ঋষি তনয়, তখন তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। অনুতপ্তহৃদয়ে তিনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া তপস্যা করিতে থাকেন। পরে তাঁহার পত্নীদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক বহুকাল পত্নীদ্বয় সহ কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপঃ-প্রভাবে তৎস্থানীয় মুনিগণ তাঁহাকে পাপ হইতে মুক্ত করতঃ তাঁহার প্রতি পুত্রবর দান করেন। তৎপরে তিনি সপত্নীক এই পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া বাস করেন। এখানে পঞ্চ পাণ্ডবগণের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য মূর্ত্তি সকল আছে।

এই সেই পুরাকালের পাণ্ডুস্থান। এখানে অতি প্রাচীন কতকগুলি মন্দির দেখিলাম। অনেক কালের পুরাতন মন্দির; উহাদের নিম্নভাগের কিয়দংশ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। মন্দির পার্শ্বে ২।৪ খানি প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ বিদ্যমান। তাহাদের অবস্থাও মন্দিরের ন্যায় শোচনীয়। সেই সকল গৃহের ছাদের উপর নানাবিধ তরুলতা আগাছা প্রভৃতি জন্মিয়াছে। কয়েকটী বৃক্ষের মোটা শিকড় পাথরেব মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই মন্দিরগুলির পুনঃ সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা দেখিলাম না। আর কিছুদিন পরেই উহারা ধূলিসাৎ হইবে সন্দেহ নাই। এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নহে। এই বিশাল প্রকৃতি ও মানব সমাজ হইতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে। আমাদের আত্মা ব্যতীত সমস্ত পদার্থই নশ্বর।

পাণ্ডুকেশ্বরের বাজারটা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; তথায় ১০।১২ খানা দোকান রহিয়াছে। এখানে একটী ধর্ম্মশালাও আছে। গ্রীষ্মকালে ৪।৫ মাস এস্থানে লোকে বসবাস করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অপর ৭।৮ মাস তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকায় এস্থান হইতে লোক সকল স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কেবল এই ৪।৫ মাস দোকানে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে; যদি বার মাস এখানে লোকে বসবাস করিতে পারিত তাহলে বাজারটার আরও উন্নতি হইতে পারিত। বাকী কয়মাস এখানে বরফ পড়িতে থাকায় দোকানী প্রভৃতি বিষ্ণু-প্রয়াগ, যোশীমঠ ইত্যাদি

স্থান সমূহে চলিয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তাহারা পুনরায় এই স্থানে আসিয়া দোকান হাট স্থাপিত করে। এই সকল পার্ব্বত্য স্থানে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ আমাদের বঙ্গদেশের পৌষ মাঘ মাসের শীতের দ্বিগুণ। তাহলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ এখানে শীতের প্রাবল্য কিরূপ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। স্থানে স্থানে দেখিলাম যে, শীতকালে নারিকেল তৈল যেরূপ জমাট বাঁধিয়া যায়, তদ্রূপ পাত্রে জলীয় পদার্থও জমাট হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বরফ গলিত হওয়ায় প্রস্তর খণ্ডসকল তন্মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

বৈকালে পুনশ্চ রওনা না হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে অল্প এধার ওধার বেড়াইয়া আসিলাম। যথা সময়ে সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া ও আহারাদি সারিয়া বিশ্রাম লাভ করিলাম। সে রাত্রে মনোমধ্যে বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। ইহার কারণ এই যে দাণ্ডিবাহকেরা বলিয়া ছিল যে আগামী কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনাকে ৺বদরিকাশ্রমে পঁহুছাইয়া দিব। এই আনন্দোচ্ছ্বাসে রাত্রে সুনিদ্রা লাভ করিতে পারিলাম না। অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিতে হইবে, সুতরাং শেষ রাত্রেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—প্রভাত হইবামাত্র আমি বিশাল, বদরিনাথকে স্মরণ করিয়া বহির্গত হইলাম। যতই ভগবান্ বদরিনাথের পরমধামের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই

বিপুলানন্দাবেগে হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। সে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

কিয়দ্দূর আসিবার পর একটা প্রস্রবণ দেখিলাম। ইহার নাম শেষধারা। নিকটেই এক মন্দির-মধ্যে শেষনাগের মূর্ত্তি বিদ্যমান। পথের উভয় পার্শ্বে গোলাপ বৃক্ষ সকল সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। এই শেষধারা ছাড়াইয়া এক প্রকাণ্ড চড়াই পাইলাম। সেই চড়াই উত্তীর্ণ হইবার পর এক সমভূমির উপর দিয়া আমাদিগকে পথ অতিবাহিত করিতে হইল। প্রায় ২ মাইল আসিয়া আমরা "রামবাড়ীচটী" পাইলাম। এতদিন দূর হইতেই পর্ব্বত গাত্রে ও পর্ব্বতশিখরে বরফের স্তূপ দেখিয়া আসিতেছি, কখন কখন বা তুষারাবৃত অল্প ভূভাগের উপর দিয়া ক্ষণিকের তরে গতায়াত করিতে হইতেছিল বটে; কিন্তু উক্ত রামবাড়ীচটী পার হইবার পর যে দিকে চাহি সেদিকেই দেখি যে ভূখণ্ড শুভ্রবর্ণ ও তুষারবিমণ্ডিত। তদুপরি পথ এরূপ অসংলগ্ন যে দাণ্ডিবাহকেরা কোনপ্রকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। অল্প দূর যাইতেই মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাহকেরা দাণ্ডি নামাইয়া নিকটস্থ এক গুহায় আশ্রয় লইল। আমি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় ওভারকোট ও কম্বলে আত্মগোপনপূর্ব্বক দাণ্ডিতে বসিয়া রহিলাম। তবু কি বৃষ্টির হস্ত হইতে নিস্তার আছে? জলের ঝাপটে কম্বল প্রভৃতি ভিজিয়া গেল। আমি তখন বাহকদিগকে বলিলাম যে এইরূপ পথে বসিয়া কতক্ষণ আমি ভিজিব, তোমরা পথ চলিতে

থাক। সৌভাগ্যক্রমে অল্পকাল মধ্যেই বৃষ্টি থামিয়া গেল। কেদার-বদ্রীর পথে, মোটের উপর সকল পার্ব্বত্য পথেই, যাহারা ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক তাহারা যেন ওভারকোট, মোমের জামা ও ছাতি লইতে না ভুলেন। এই কয়টী দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজনীয। এই সকল স্থানে সময়ে ও অসময়ে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এহেন স্থানে গমনকালে বারিবর্ষণের সময় যদি নিকটে কোনও চটী না থাকে তো যাত্রিগণকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহাদিগকে পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া ভিজিতে হয়। বামবাড়াচটীর নিকটে এক ধর্ম্মশালা আছে। উহা সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত চটীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন আকাশ পরিষ্কার হয় নাই মেঘমালা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতঃস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল। রৌদ্রের লেশ মাত্র নাই। এই চটী ও পর্ব্বতের এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। তথায় লোকালয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমার দাণ্ডিবাহকদিগের মধ্যে একজন অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। সে আমার নিকট হইতে কয়েকটী পয়সা লইয়া উক্ত চটীতে খাবার কিনিতে যাইল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার ভাগ্যে আহার্য্য দ্রব্য জুটিল না। দোকানদার বলিল যে পূর্ব্বরাত্রে একদল সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার দোকানের সমুদয় আহার্য্য দ্রব্য শেষ করিয়া গিয়াছে। সে পুনরায় বলিল যে অল্পক্ষণ মধ্যেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিবে। শুনিলাম এই সকল সাধু সন্ন্যাসী দলবদ্ধ

হইয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করে এবং যে ক্ষুদ্র চটীতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তথায় যে অল্প পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য থাকে তাহা পঙ্গপালের ন্যায় সমুদয় নিঃশেষিত করিয়া চটীটাকে "গজভুক্ত কপিত্থবৎ" অসার করিয়া চলিয়া যায়। সেখান হইতে প্রায় মাইল তিনেক আসিয়া "হনুমানচটী"। এই চটীর নাম কেন যে হনুমানচটী হইল তাহা বলিতে পারি না। শুনিলাম চটীওয়ালা আজ ৫।৭ দিন হইল দোকান খুলিয়াছে, তৎপূর্ব্বে ইহা তুষারে সমাচ্ছাদিত ছিল। উক্ত চটীতে প্রস্তর নির্ম্মিত এক ক্ষুদ্র কক্ষ ও তাহার সম্মুখভাগে এক বারান্দা রহিয়াছে। এখান হইতে ৺বদরিকাশ্রম ৪ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। সম্মুখের গিরিশৃঙ্গটী একেবারেই বরফে আবৃত। আর এক উচ্চ গিরিশিখর হইতে অলকানন্দা ভীমবেগে ও ভীষণ গর্জ্জনে নিম্নে নামিয়া আসিতেছে। অলকানন্দার জল-প্রবাহে তত্রত্য স্থানসমূহ বিকম্পিত হইতেছে। এই হনুমান চটীতে ৩।৪ খানি দোকান আছে। সে সকল দোকানে পুরী সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। তথায় একটী ধর্ম্মশালা ও একটী সদাব্রত আছে। এখানে এক মন্দিরে হনুমানজীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই চটীর কিয়দ্দূরে মরুত্ত রাজার যজ্ঞস্থল বিদ্যমান আছে। পাণ্ডারা বলিল যে এই স্থলের মৃত্তিকারাশি গভীরভাবে খনন করিলে অদ্যাপি যজ্ঞের অঙ্গার জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। মহাভারতে এই যজ্ঞের অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। উক্ত যজ্ঞে সহস্রকোটী বিপ্র সমবেত হন এবং সেই

সকল বিপ্রের ভোজনার্থ তাবৎ সুবর্ণ ভোজ্যপাত্র নির্ম্মিত হয়। তৎকালে পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন ঐ স্থানে আনীত হয়। ইহাই সেই পুরাকালীন যজ্ঞস্থল।

৺বদরিকাধামের এত সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, সুতরাং বেলা ১১টা বাজিয়া যাইলেও সে দিবস ঐ চটীতে আহার না করিয়াই অল্প জলযোগ সারিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। অল্পদূর যাইয়া এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত পাইলাম। এই পর্ব্বত আমাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে। উহা অতিক্রম করিতে দাণ্ডিবাহকদিগকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল প্রথমতঃ তো একেবারে সোজা উপরে আরোহণ করা ও তুষারাবৃত পথের জন্য প্রতিপদবিক্ষেপে পদদ্বয় অসাড় হইতেছে এবং তদুপরি বারি বর্ষণের জন্য পর্ব্বত গাত্র অতিশয় পিচ্ছিল হইয়াছে। সেই স্তূপাকার বরফরাশি ভেদ করিয়া আমরা এক মাইল আসিয়া বৈখানস মুনির আশ্রমে পঁহুছিলাম। এখানে কি ভীষণ শীত! শীতে আমাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। আশ্রমটী নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। সেই শান্ত আশ্রমপদে প্রবেশ করিলে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধ হয়। চতুর্দ্দিকেই শুভ্রবর্ণ পর্ব্বত শ্রেণী তুষারে বিমণ্ডিত থাকায় অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে তখন মনে হইতে লাগিল, যেন আমরা মেঘরাজ্যে উপনীত হইয়াছি। পথিমধ্যে অনেক যাত্রীর সহিত দেখা হইতে লাগিল। তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া ও ৺বদরিকানাথের ভাবে উদ্বেলিত হইয়া বারম্বার

"জয় বদরিবিশালের জয়" ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পথে দেখিলাম পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষেরা দলে দলে চলিতেছে। উহাদের সহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাম ছাগল রহিয়াছে। সেই সকল ভারবাহী ছাগের পৃষ্ঠদেশে চাউল, আটা, কাষ্ঠ ইত্যাদি সামগ্রী সংরক্ষিত রহিয়াছে। উহারা এই কয় মাসের জন্য বদরিকাশ্রমে দোকান করিতে যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে ছোট বালক বালিকাও রহিয়াছে। উহারা যাত্রী দেখিলেই "বদরিবিশালজী কি জয়" বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিতেছে। কেহ কেহ ছুঁচ সূতা চাহিতেছে। উহারা এই দুই দ্রব্য বড়ই প্রিয়জ্ঞান করে। তবে বঙ্গদেশের ভিক্ষুকের ন্যায় কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত করে না বা প্রদানী ব্যক্তির পশ্চাদনুধাবন ও করে না। প্রায় সকল বালক বালিকা দেখিলাম হৃষ্টপুষ্ট ও সবলকায়। তাহাদের মধ্যে একটা জীবন্ত ভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই, যে বঙ্গদেশের ন্যায় ঐ সকল প্রদেশ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নহে। যদিও তাহাদের অঙ্গে মলিন বসনভূষণ, তথাপি তাহাদের মুখমণ্ডলে হাস্যময় আভা ফুটিতেছে। সকলেই কেমন ধীর ও শান্ত।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে এক উৎরাই নামিতে হইল। সেই উৎরাই কি ভয়ঙ্কর—ঢালু পর্ব্বত গাত্রে তুষারময় পথ দিয়া আমাদিগকে পর্ব্বতারোহণ করিতে হইল। পর্ব্বতের নিম্ন দিয়া কাঞ্চনগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। উহার অপর এক নাম ধবলগঙ্গা। এই গঙ্গার জল দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। এই

ঢালু পথটী দুই মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত। পথটী বড়ই পিচ্ছিল ও সমূহ বিপজ্জনক। প্রতিপদে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। এখান হইতে বৃক্ষ, লতা, তৃণ ইত্যাদি আদৌ নাই। খানিক পথ যাইবার পর এক চড়াই আরোহণ করিতে হইল। তথায় দাণ্ডি যাইতে পারিল না। আমি অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম। দেখিলাম পাহাড়ীরা কোদাল দ্বারা বরফ কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতেছে। আমরা তাহার উপর দিয়া এক পা এক পা করিয়া চলিতে লাগিলাম। অদূরে অলকানন্দা অতি মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছেন। কোথাও সামান্য স্রোত দেখা যাইতেছে এবং কোথাও বা একেবারেই জল দেখা যাইতেছে না, কারণ শক্ত ও প্রগাঢ় বরফস্তূপ অলকানন্দার জল আবৃত করিযাছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রাকার বরফখণ্ড সকল ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া স্রোতের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে লাগিল। এখান হইতে নদী নির্ঝরিনী, ভূভাগ প্রভৃতি চির তুষারাবৃত। ক্রমে বরফের স্তূপে অলকানন্দার জল একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল। বরফের নদী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতে লাগিল না। আমরা কি ঊর্দ্ধে, কি পদতলে, কি পার্শ্বে—যে দিকেই ফিরাই আঁখি, সেই দিকেই কেবল স্তূপাকার বরফ দেখি। এইরূপ প্রায় ৪।৫ মাইল পথ অবিচ্ছিন্ন তুষারের উপর দিয়া চলিতে হইল। তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়ায় উহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে আমাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইল। অল্পক্ষণ পরেই

চাহিয়া দেখি আমাদের সম্মুখভাগে নরনারায়ণ পর্ব্বতের তুষার-বিমণ্ডিত উচ্চশিখর ও তদুপরি নারায়ণের মন্দির। বদরিকাশ্রমের প্রবেশপথ হইতে এই নরনারায়ণপর্ব্বত দৃষ্ট হয়। কিয়দ্দূর আসিয়া এক সমতল ক্ষেত্রে পঁহুছিলাম। সেই সমভূমিকে দুইটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত উভয় পার্শ্ব হইতে বেষ্টন করিয়াছে। সে স্থানে ৺বদরিনাথের পাণ্ডাগণ যাত্রীসংগ্রহার্থ আগমন করে। দেখিলাম তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাত্রিগণকে "ঐ নারায়ণজীর মন্দির, ঐ অলকানন্দা' ইত্যাদি দর্শন করাইয়া তাহাদিগের পাণ্ডা হইবার উপক্রম করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, যদ্যপি পাণ্ডাগণ নবাগত যাত্রিবৃন্দকে ঐ সকল পদার্থ দেখাইয়া না দিত, তথাপি তাহারা নিজেই সেই সকল পদার্থ চিনিতে পারিত; তাহাতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা হইত না। যাহা হউক, তাহারা এইরূপে যাত্রীসংগ্রহ করিতে লাগিল। কাষ্ঠময় এক সেতুর উপর দিয়া অলকানন্দা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে ৺বদরিকাধামে প্রবেশ করিতে হইল। তখন আমার মনে হইল যে, এতাবৎ কাল আমি নিরর্থক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি মাত্র, আজ এই বিষ্ণুক্ষেত্রে আসিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। আজ আমি সেই চিরবাঞ্ছিত বদরিকাধামে উপনীত হইলাম।

বদরিকাশ্রম।

—

বদরিকাশ্রম এক উপত্যকার উপরি অবস্থিত। এই সমভূমির দৃশ্য অতি চমৎকার। দুই দিকে দুইটী পর্ব্বত যেন আকাশ ভেদ করিতে যাইতেছে এবং সেই পর্ব্বতদ্বয়ের ছায়া বদরিকাশ্রমকে রৌদ্রাতপ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছে! পাণ্ডাগণ এই পর্ব্বত দুইটীর নাম "নর" ও "নারায়ণ" বলিলেন। তাহাদিগের মুখে শুনিলাম যে, এই পর্ব্বতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, এই পর্ব্বতদ্বয়ের অঙ্গ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে বদরিকাশ্রমকে চিরদিনের জন্য হিমালয়বক্ষে আবৃত করিবে। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বদরিকাশ্রমে সত্যযুগে নরনারায়ণ নামক ঋষিদ্বয় উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে উদ্ধব এস্থানে আসিয়া যোগারূঢ় হন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই স্থান হইতেই স্বর্গারোহণ করেন। শুক, সৌতি, নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের এই বদরিকাশ্রম সাধনক্ষেত্র ছিল। মহামতি ব্যাসদেব এই স্থানে অষ্টাদশ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবৎ রচনা করেন। বদরি শব্দের অর্থ বঙ্গদেশের কুল গাছ। ইহার তলায় বসিয়া বেদব্যাস তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বাদরায়ণ হইল।

বদরিবিশালকে স্মরণ করিয়া নারায়ণের মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় ২॥০ হইবে। দেখিলাম মন্দিরটী বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার; কিন্তু সংস্কারাভাবে উহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই মন্দির বহুকালের পুরাতন। স্থানীয় জনসাধারণ বলে যে, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু মন্দির দেখিয়া বোধ হয় উহা আরও অনেক দিনের পুরাতন। সোপানশ্রেণী আরোহণপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের বাহিরের চারিপাশে সামান্য চত্বর রহিয়াছে। এই চত্বরের চতুর্দ্দিকে এক মহল ছোট চক বিদ্যমান, তথায় অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছেন। মন্দির মধ্যে নারায়ণের সুন্দর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সেই মূর্ত্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত। শ্রীবিগ্রহ বহুমূল্য অলঙ্কারে সুশোভিত। অলঙ্কার দ্বারা নারায়ণের আপাদমস্তক আবৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ রত্নসিংহাসনে আসীন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে নারদ উদ্ধব ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। একটী কথা এ স্থানে বলা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীবিগ্রহ যথায় প্রতিষ্ঠিত, তথায় অন্য কোন দেবমূর্ত্তি নাই। সেই কক্ষের বহির্ভাগের বারান্দায় এবং শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর বামভাগে লক্ষ্মীদেবী দণ্ডায়মানা। লক্ষ্মীদেবীর বামপার্শ্বে ও কিঞ্চিদ্ নিম্নপ্রদেশে নারায়ণ ও নর যোগাসনে আসীন। শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর দক্ষিণ পার্শ্বের বারান্দায় কুবের ও গণপতির মূর্ত্তিদ্বয় অবস্থাপিত। সম্মুখ ভাগের

বারান্দায় ও শ্রীভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে উদ্ধব যোগারূঢ় অবস্থায় ও যুক্তহস্তে উপবিষ্ট আছেন। সেই বারান্দার বামপার্শ্বে বাদ্যযন্ত্রহস্তে দেবর্ষি নারদ রহিয়াছেন। উদ্ধবের বামেতর ভাগে ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে বিষ্ণুবাহন খগেন্দ্র গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী বিগ্রহ দেখিলাম। জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের অন্ন প্রস্তুত করেন। প্রভুর মন্দিরের পুরোভাগে নাটমন্দির। শ্রীশ্রীবদ্রীনাথদেবের মণি মুক্তার জ্যোতিতে সমগ্র গৃহ আলোকিত। শুনিলাম ভাদ্র মাসে যে দিন মন্দির দ্বার বন্ধ হয়, সে দিন মন্দির মধ্যে যে প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়, সেই প্রদীপ বৈশাখ মাসের অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন যখন সর্ব্বপ্রথম দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, তখনও জ্বলিতে থাকে। কি প্রকারে উক্ত প্রদীপ এই নয় মাস কাল অনবরত জ্বলিতে থাকে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে ভগবদনুগ্রহে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। দেবদর্শন করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলাম। তারপর পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া অলকনন্দার তটোপরি ব্রহ্মকপাল নামক স্থানে গমন করিলাম। এই ব্রহ্মকপাল পরম পবিত্র স্থান। এস্থানে পিতৃলোকের ও আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করিতে হয়। এখানে পিণ্ড দান করিবার কালাকাল বা পাত্রাপাত্র নাই। যে কোন সময়ে ও যে কেহ এই ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দান করিতে পারেন। এখানে পিণ্ড দান করিলে পুনশ্চ গয়া

প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয় না। কিন্তু কয়জন এতাদৃক্ ভাগ্যবান্ যাঁহাদের কোন বংশধর এরূপ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মকপালে আসিয়া পিণ্ডদান করে? এই স্থানটী বদরিনাথের মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অলকানন্দার তটোপরি অবস্থিত। তথায় গমনপূর্ব্বক আমি মহাপ্রসাদ ও অন্যান্য উপকরণাদির দ্বারা আমার আত্মীয় স্বজন, পিতৃলোক ও সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলাম। তখন এক নিরুদ্যম উদাসীন ভাব মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। সে সময় হৃদয়ে সুখদুঃখের লেশমাত্র অনুভূত হইল না। তৎকালে সংযোগবিয়োগধর্ম্মশীল মানবের চিত্তে দ্বন্দ্বাতীত ও শান্তভাব বিরাজ করিতে থাকে। যদুদ্দেশ্যে এই সুদূর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহা সুসম্পন্ন হইল। কার্য্যসমাপনান্তে আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার আত্মা এ স্থূল জগৎ পরিত্যাগ করিয়া কোন এক অনির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্ম জগতে বিহরণ করিতেছে। তৎকালে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হৃদয়ে স্থান পায় না। বিষয়বাসনা দ্রবীভূত হইয়া বৈরাগ্য-স্রোতে ভাসিয়া যায়। তখন আমার মনে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীত মোহমুদ্গরের সেই বিখ্যাত শ্লোক পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল,—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

কস্য ত্বং বা কুত আযাত,
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥”

তোমার স্ত্রী কে এবং তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসার অতীব বিচিত্র; তুমি কার, কোথা হইতে আসিলে এখানে,—হে ভ্রাতঃ! একবার এই তত্ত্ব চিন্তা করিয়া দেখ।

পরে পাণ্ডার সহিত বাসায় ফিরিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মকপাল সম্বন্ধে আমার দু একটী কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। বদরি বিশাল মাহাত্ম্যে এইরূপ লিখিত আছে যে, এস্থান এরূপ পবিত্র যে এ স্থানে পিতৃলোক বা যে কোন আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করা যাক না কেন, তাহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ করিবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই স্থান সম্বন্ধে এক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। পূর্বকালে এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একত্র সমাসীন ছিলেন। তৎকালে এক অশেষরূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। সেই কন্যাকে দেখিয়া পদ্মযোনির চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। কামদেবের এতাদৃক্ প্রভুত্ব যে সাধারণ মানবের কথা দূরে থাকুক, দেবগণেরও স্থৈর্য্য নাশ করে, এমন কি শ্মশানবাসী দেবাদিদেব মহাদেবেরও চিত্ত-বৈকল্য আনয়ন করিয়াছিল। সেজন্য কামদেব দেবরাজ ইন্দ্রকে সগর্ব্বে বলিয়াছিল—

“তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি
সহায়মেকং মধুমেব লব্ধা।

কুর্য্যাং হরস্যাপি পিণাকপাণেঃ
ধৈর্য্যচ্যুতিং কা কথা ধন্বিনোহন্যে ॥”

সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মার এরূপ চঞ্চল ভাব দেখিয়া মহাদেব অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূলাঘাতে পদ্মযোনির শিরচ্ছেদ করিলেন, কিন্তু ঐ ছিন্ন মুণ্ড হরের হস্ত হইতে ভূমিতে পড়িল না, হস্তেই লাগিয়া রহিল। মুণ্ডহস্তে মহাদেব ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও ঐ মুণ্ড হস্তচ্যুত হইল না। পরিশেষে দেব ও ঋষিগণের পরামর্শানুসারে তিনি শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া সমুদয় ইতিহাস বিবৃত করিলেন। বিষ্ণু ব্রহ্মার অর্দ্ধাংশ স্বরূপ। তিনি ব্রহ্মাকে বদরিকাতীর্থে গমন করিতে উপদেশ দেন এবং তথায় গমন করিলে তাহার পাপক্ষয়ও হইবে তাহাও বলেন; তথায় শ্রীভগবান্ হরি নিয়ত সন্নিহিত আছেন। অতঃপর মহেশ্বর বদরিকাশ্রমে আগমন করেন এবং তথায় এক প্রকাণ্ড শিলোপরি ঐ মুণ্ড হরের হস্ত হইতে পতিত হয়। তদবধি এই প্রস্তরের নাম ব্রহ্মকপাল হইল। এখানে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গবাস হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মার সেই ছিন্নমুণ্ড আবার যথাস্থানে সংযোজিত হয়।

বদরিনাথদেবের মন্দিরের বহির্ভাগে এক ক্ষুদ্র কক্ষে সাময়িক ডাকঘর বসিয়াছে। যে কয়মাস তথায় যাত্রিগণ যাতায়াত করিবে, সেই কয় মাসের জন্য উহার কার্য্য চলিবে। যাত্রিবৃন্দের গমনাগমন বন্ধ হইলে উক্ত ডাকঘরও বন্ধ হইবে।

ডাকঘরে আমার প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষকরতঃ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমার পাণ্ডা আমার জন্য এক দ্বিতল গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। তথায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম যে, গৃহের নিম্নতল তুষারাবৃত রহিয়াছে, তবে দ্বিতলের কক্ষে বসিবার অল্প স্থান পাওয়া গেল। বাটীর উঠানগুলি তখনও বরফে সমাচ্ছাদিত। সেখানে কি প্রচণ্ড শীত! শীতে আমার শরীর অবশ হইয়া গেল। পাণ্ডা পূর্ব্বেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই কাষ্ঠ জ্বালাইয়া শরীর অল্প গরম করিলাম। সেই হিমপুরীতে অগ্নির অতি সন্নিকটে থাকিয়াও যেন উষ্ণা নাই বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রামলাভার্থ শয়ন করিলাম। আমার গাত্রে ২।৩টী গরম কাপড়ের জামা, তদুপরি আবার কম্বল; কিন্তু সেথায় শীতের প্রকোপ এত বেশী, যে কিছুতেই আর শীতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, অল্প নিদ্রালাভান্তে অতি প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করিলাম। কোন বিদেশে গমন করিলে দেখিয়াছি যে, রাত্রে আমার গৃহের ন্যায় তেমন সুনিদ্রা হয় না। কারণ বিদেশে নিদ্রালাভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভাবিতে থাকি, কল্য প্রভাতে আমাকে এই সকল কার্য্য করিতে ও এই সকল স্থান দেখিতে হইবে। সুতরাং মন উদ্বিগ্ন থাকায় সুনিদ্রা লাভ করিতে পারে না।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া লইলাম। প্রভাতের

তুষার শীতল বায়ু বহিতেছে ও আকাশ বেশ পরিষ্কার। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নারায়ণদর্শন করিতে যাইলাম।. যাইয়া দেখিলাম যে, তখনও মন্দিরদ্বার উদঘাটিত হয় নাই। পাণ্ডাগণ বলিল যে, বেলা ৮টা বাজিলে মন্দিরদ্বার খোলা হইয়া থাকে। আমার পাণ্ডা আমাকে তীর্থ সলিলে স্নান করিতে বলিলেন। মন্দিরের নীচেই অলকনন্দার ঘাট। উহার হিমশীতল সলিলে কাহার সাধ্য অবগাহন স্নান করে? তাহার উপর অলকানন্দা আবার এক উচ্চ গিরিশিখর হইতে ভীমবেগে নীচে নামিতেছে। পাণ্ডা অল্প জল আমার মস্তকে সেচন করিল। তারপর পাণ্ডাসহ আমি তপ্তকুণ্ড দেখিতে যাইলাম। মন্দিরের বহির্ভাগে এক অনতিবৃহৎ আহার (চৌবাচ্চা) নির্ম্মিত আছে; নারায়ণের মন্দিরের পাদদেশে এবং পূর্ব্বোক্ত আহারের পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ নির্ঝরিণী রহিয়াছে। উহার জল অতি উষ্ণ; এতাদৃক্ উষ্ণ যে উহাতে লোকে স্নান করিতে পারে না। সেইজন্য পাণ্ডাগণ ঐ আহারে এই উষ্ণবারি আনিয়া ফেলিয়াছে এবং অপর এক ঝরণার শীতল জলও তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছে। উভয় ঝরণার জল একত্র মিশ্রিত হইয়া ঈষদুষ্ণ জলে পরিণত হইয়াছে। দেখিলাম অনেক যাত্রী এই জলে স্নান করিতেছে। ভগবানের কি মহিমা! তিনি এই হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বতমধ্যে কি সুন্দর তপ্তকুণ্ড সৃজন করিয়াছেন। মন্দিরদ্বার উন্মোচিত হইলে নারায়ণ দর্শনে যাইলাম। দ্বারে রক্ষিগণ স্বর্ণময় আশাসোটা লইয়া

দণ্ডায়মান। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। বদ্রীনাথ দেবের মস্তকে এক মণিমুক্তাখচিত মুকুট শোভা পাইতেছে। আমি পূজার উপকরণগুলি পুরোহিত হস্তে প্রদান করিলাম। আমার পত্নীর সোনার নোয়া বদরিনাথের গদিতে দিলাম। এখানকার পূজারিগণ অতি নম্র ও বিনয়ী। তাহারা সকল যাত্রীকেই সযত্নে দেবদর্শন করাইতেছে দেখিলাম। তাহারা অতি শুদ্ধাচারী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। সেদিন ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদ পাইলাম। বাসায় আসিলে পাণ্ডা আমাদের স্তুফল দিতে আসিলেন। এই স্তুফল দান করিয়া তাহারা বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করে। প্রত্যেক যাত্রীকে স্তুফল দান করিয়া যথেষ্ট অর্থ আদায় করিতেছে। তবে অন্যান্য কয়েক স্থানে দেখিয়াছি যে, স্তুফল দান করিবার কালে তাহারা যাত্রিগণের নিকট, বিশেষতঃ স্ত্রী যাত্রিবর্গের নিকট, বেশ জোর করিয়া অপরিমিত অর্থ অন্যায়পূর্ব্বক আদায় করে; এখানে তদ্রূপ দেখিলাম না। তারপর মন্দিরের মোহান্ত মন্দির সংস্করণার্থ আমার নিকট অর্থ সাহায্য চাহিলেন। আমি তাঁহাকে যথাসাধ্য প্রদান করিলাম। তৎপরে শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বদরিকাধাম দেখিতে পাণ্ডার সহিত বহির্গত হইলাম।

বদরিকাশ্রম এক সমভূমির উপর অবস্থিত। ইহা উত্তর দক্ষিণে লম্বা; এবং ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। শ্রীনগর সহরে ও দেবপ্রয়াগে যাহা কিছু সমতল ভূমি পাইয়াছিলাম, তদ্‌ভিন্ন আর কোথায় এরূপ সমভূমি

দৃষ্ট হয় নাই। বদরিকাশ্রমের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি গম্ভীর। দূরে পর্ব্বত হইতে অনেকগুলি ঝরণা আসিয়া অলকানন্দায় মিশিয়াছে। এই সকল ঝরণা থাকায় তত্রত্য লোকের অশেষ উপকার সাধিত হয়। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"তব রাজ্যে বহু হ্রদ, তারাও তো নদী নদ,
প্রসবিয়া জনপদ-হিত সদা করে ;
সে সব নদীর জন্য, ভারত হ'য়েছে ধন্য,
হেন নদী ধরে অন্য কোন মহীধরে ?
সাগরে পাঠাও সবে, তথা গিয়া মিলে যাবে,
বাষ্পরূপ ধরি তবে, শূন্যে তারা উঠে ;
মেঘরূপে বায়ুভরে, ভারত ভ্রমণ ক'রে,
ফিরে তব শিরোপরে, আসে তারা ছুটে।
জলরূপে দূরে গিয়া, জলদরূপে আসিয়া,
তোষে পুনঃ বরষিযা, তব রাজ্যময়।
এসব অদ্ভুত কাজ, দেখি তব গিরিরাজ,
উদয় হৃদয় মাঝে পুলক বিস্ময় !"

বদরিকাশ্রমের অধিকাংশ বাটী দ্বিতল। ঘরগুলি সব কাষ্ঠনির্ম্মিত। পথের উভয় পার্শ্বে দোকান রহিয়াছে। ঐ সকল দোকান যাত্রিগণের জন্য বসিয়াছে ও উহাতে আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। সকল দোকানেই কিঞ্চিৎ আহার্য্য দ্রব্যের আয়োজন থাকে এবং প্রত্যহ

ছাগপৃষ্ঠে দ্রব্যাদির আমদানিও হইয়া থাকে। এই পার্ব্বত্য পথে ছাগই ভার বহন করে; ছাগলের দ্বারাই এ প্রদেশে রেল-ওয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক এক ছাগল ১০।১৫ সের দ্রব্য অনায়াসে বহন করে।

বদরিকাশ্রমে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা দেখিলাম। সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি তথায় যাইলেই পাণ্ডাগণ তাহাদিগকে এক একটি বাড়ী ক্রয় করিতে অনুরোধ করে ও তাহাতে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিতে বলে। ঐ সকল বাটি ক্রয় করিতে ন্যূনাধিক সহস্রমুদ্রা ব্যয়িত হয়। উহা ক্রয় করিয়া অনেকেই তথায় ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পরে পাণ্ডা আমাকে পঞ্চ-তীর্থ দর্শন করাইলেন। প্রথমে তপ্তকুণ্ড, উহার জল ঈষ-দুষ্ণ; দ্বিতীয় হৃষীকেশ-গঙ্গা বা ঋষি-গঙ্গা; তৃতীয় কুর্ম্মধারা,—ইহা বদরিকাশ্রমের বাজারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অলকানন্দায় পড়িতেছে; চতুর্থ প্রহ্লাদ-ধারা এবং পঞ্চম নারদকুণ্ড। এখানে অনেক পাণ্ডার বাড়ী রহিয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য এখানে বড় বেশী; চাউলের মূল্য প্রতিসের একটাকা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যও চাউলের মূল্যের অনুযায়ী। দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডাকে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলাম; উহাতে সে বড়ই প্রীত হইল। আরও সে বলিল যে, এ তো কেবল একবারের জন্য নহে, প্রতিবৎসরই আপনার কলিকাতার বাসায় যাইব। প্রত্যা-বর্ত্তনকালে পাণ্ডাকে অল্প ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম; কারণ

পাণ্ডাগণ যাত্রিবর্গকে বলে যে, পথে আপনাদের কোনরূপ কষ্ট হইবে না, রেলযোগে হরিদ্বারে পঁহুছিয়া হৃষীকেশ হইতে দাণ্ডিতে আরোহণ করিবেন আর আপনি একেবারে বদরিকা-ধামে আসিয়া দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিবেন। পথের দুর্দশার কথা যাত্রিগণকে পূর্ব্ব হইতে অবগত করায় না। যাত্রিগণ পূর্বে এরূপ কষ্টদায়ক পথ জানিলে এপথে আসিতে দ্বিধা বোধ করিত। পাণ্ডা তখন আমায় বলিল যে, আপনি কলিকাতায় যাইয়া এতাদৃক্ ভয়াবহ পথের বৃত্তান্ত কাহাকেও জানাইবেন না।

প্রথম হইতেই আমার ইচ্ছা ছিল যে বদরিকাধামে ত্রিরাত্র বাস করিব; কিন্তু শীতের আধিক্যবশতঃ আমার মনোবাসনা মনোমধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। পুণ্যতীর্থ বদরিকাশ্রমে দুইদিন ও একরাত্রি বাস করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ২॥০টার সময় বদরিকা-ধাম পরিত্যাগ করিলাম। যাত্রা করিবার পূর্বে আর একবার দেবদর্শন করিতে যাইলাম। শ্রীভগবানের দর্শনে পাপ তাপ দূরীভূত হইল। বদরিকাধাম বিষ্ণুধাম। তথায় পূজাপাঠ ভোগ প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। দিবাভাগে অন্ন-ভোগ প্রদত্ত হয়। দিবসে দুগ্ধ, ক্ষীর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। রাত্রে অন্নভোগ হইয়া থাকে। পুরী-ধামের ন্যায় এখানেও অন্নস্পর্শে জাতিবিচার নাই। বদরিকা-দেবের পূজার তৈজসাদি সমস্ত সুবর্ণময়। নয়ন ভরিয়া চতুর্ভুজ

বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলাম; একমাত্র অনুশোচনার বিষয় পাণ্ডাগণ কোনও যাত্রীকে শ্রীবিগ্রহস্পর্শ করিতে দেয় না। তবে কিয়ংপরিমাণে আনন্দের বিষয় এই যে, পাণ্ডাগণ যাত্রীবর্গকে তবু এস্থানে শ্রীবিগ্রহের সন্নিকটে যাইতে দেয়; সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শ্রীমুর্ত্তি হইতে যাত্রিগণকে বহুদূরে থাকিতে হয়। এই বিগ্রহস্পর্শসম্বন্ধে দ্বারকাধামের ন্যায় আর কোথাও অবাধ অধিকার যাত্রিগণের নাই; তথায় মূর্ত্তিস্পর্শ, তাঁহার গাত্র ঘৃত দ্বারা মার্জ্জন ইত্যাদি কার্য্য যাত্রী সকল সম্পাদন করিয়া থাকে।

এই বদরিকাশ্রম চির আনন্দময় স্থল। এখানে আসিলে সকলেরই মন হইতে বিদ্বেষভাব বিদূরিত হয়। সকলেই ভগবদ্দর্শনে উৎফুল্ল। নাটমন্দিরে কত সাধুমহাত্মা দেখিলাম, তাঁহারা সুললিত কণ্ঠে বেদগাথা গান গাহিতেছেন। আমিও শ্রীভগবানের মধুর নাম পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

অতঃপর শ্রীহরির চরণকমল হইতে বিদায় লইয়া বদরিকা ধাম পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলাম। এই চির তুষারময় পুণ্য ক্ষেত্রে আসিয়া বরফের স্তুপ দেখিবার বাসনা দূরীভূত হইল। শৈশবে ভূগোলে তুষারাবৃত পর্ব্বতের বিবরণ পাঠে উহা দেখিতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে উদিত হইত এবং তাহা নিবৃত্ত করিবার জন্য সিমলা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি শৈলে ভ্রমণ করিতে যাই; কিন্তু এই পথে আসিয়া আমার

হিমাবৃত পর্ব্বত দেখিবার সাধ একেবারে মিটিল। এমন কি বিরক্তিও জন্মিল। চারিদিকেই বরফ, বরফের উপর দিয়া যাতায়াত এবং তাহার উপর আহার, বিহার ইত্যাদি করিতে হইত।

বদরিকাশ্রম হইতে ৬ মাইল দূরে বসুধারা তীর্থ। সে পথ চির তুষারবিমণ্ডিত থাকায় যাত্রিগণ কেহ তথায় যাইতে পারে না। ঐ পথে ইন্দ্রধারা দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রধারার পরে গণেশগুহা ও তৎপরে ব্যাসাশ্রম নামক পর্ব্বত। সেই স্থান হইতেই পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন। তথায় ভীমসেতু নামক এক প্রস্তরময় সেতু আছে। ঐ সকল পথ অতি দুর্গম। তৎপরে আরও কতকগুলি তীর্থ আছে, যথা সহস্রধারা, চক্রতীর্থ ইত্যাদি। সাধারণ মানব ঐ সকল স্থানে যাইতে পারে না, যোগী ঋষিগণ তথায় যাইয়া থাকেন। যাহা হউক, পাণ্ডাপ্রমুখাৎ এই সকল তীর্থ-বৃত্তান্ত অবগত হইলাম; পুণ্য স্থানের বৃত্তান্ত শ্রবণেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। নিতান্ত অনিচ্ছাবশতঃ বদরিকাধাম পরিত্যাগ করিলাম। ভারতে অনেক রমনীয় স্থান আছে, কিন্তু এমন শান্তিপ্রদ স্থান সচরাচর দেখা যায় না।

বৈকালে বিষ্ণুক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নামিতে লাগিলাম। নামিবার পথও বড় কষ্টদায়ক। দাণ্ডি-বাহকেরা ধীরপদবিক্ষেপে নামিতে লাগিল। পথটী এক ঢালু উৎরাই এবং উহা বরফে বড়ই পিচ্ছিল হইয়াছিল। নীচে

কাঞ্চনগঙ্গা খরস্রোতে প্রবাহিতা হইতেছে। পথে বৃক্ষ, লতা, তৃণ প্রভৃতি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। চারিধারে তুষারাবৃত ভূখণ্ড সকল বিশ্ববিধাতার নির্ম্মাণ কৌশল ঘোষিত করিতে লাগিল। খানিক পথ আমাদিগকে বসিয়া নামিতে হইল। একেবারে ৯ মাইল্ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে "রামবগড় চটীতে" আসিলাম। এখানে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে। কোন গতিকে আমার অল্প স্থান মিলিল। সেখানে শুনিলাম যে, গত রাত্রে জনৈক বণিকের অনেক অর্থ অপহৃত হইয়াছে। এই কেদার-বদ্রীর পথে চুরির কথা বড় সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ীরা বেশ সরল ও বিশ্বাসী; তাহারা পরের দ্রব্যাদি লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করে। তবে বৎসর দুই দুর্ভিক্ষের জন্য তাহাদের বড়ই অন্নকষ্ট হইতেছে।

বদরিকাশ্রমে প্রবল শীতের প্রকোপে আমার শরীর অল্প অসুস্থ হইয়াছিল, রাত্রে তেমন সুনিদ্রা লাভ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমরা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে চলিতেছি। সুতরাং সংসারের চিন্তা, যাহা আগমনকালে হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা পুনর্ব্বার মনোমধ্যে জাগিতে লাগিল।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—অতি প্রত্যূষেই আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই সুদূর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা সিদ্ধ হওয়ায়, এক্ষণে মনে হইতে লাগিল যে যত শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যায়, ততই

মঙ্গলের বিষয়। আমাদের লক্ষ্য অধুনা গৃহাভিমুখে থাকায় আমাদের সকলেই যথাশক্তি চলিতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১১।১২টা পর্য্যন্ত যাইয়া কোন চটীতে আহারাদি সমাপন করিতাম; আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আবার বেলা ৩।৪টার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যাকালে কোন চটীতে আশ্রয় লইতাম। পূর্ব্বেকার ন্যায় এবারও জোশীমঠে বেলা ১১টার সময় আসিয়া পড়িলাম। তথায় আহারাদি করিয়া বৈকালে আবার বহির্গত হইলাম। এস্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে দোকান হইতে আর ২।৪ খানি ছবি ক্রয় করিলাম। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে "গুলাব চটীতে" উপনীত হইলাম। এ স্থানটী বড়ই মনোরম। এই চটী এক অত্যুচ্চ গিরিশিখরে অবস্থিত। তথায় একখানি গ্রামও আছে। এখানে কয়েকখানি দোকান, ডাকঘর ইত্যাদি আছে। এখানে শীত কিয়ৎপরিমাণে কম বোধ হইতে লাগিল; সেজন্য রাত্রে সুনিদ্রা লাভ করিলাম।

১৩শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—অদ্য শয্যা ত্যাগ করিতে অল্প বিলম্ব হইল। আমাদের যাত্রা আরম্ভ করিতে বেলা প্রায় ৭॥০টা বাজিয়া গেল। এবার লালসাংগা পর্য্যন্ত আমার পরিচিত পথ; সুতরাং কবে কতদূর যাইয়া কোন চটীতে আশ্রয় লইব; তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া লইতাম। গুলাব চটী হইতে পীপল চটী প্রায় ১১ মাইল পথ হইবে। এই ১১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময়

শেষোক্ত চটীতে আহারাদি করিবার জন্য উঠিলাম। চটীতেই দোকানদারকে দেখিতে পাইলাম। দোকানের সম্মুখেই তাহার ঘর। চটীটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তথায় ২।৩টী যাত্রী রহিয়াছে। চটীর সম্মুখভাগে অল্প সমভূমির উপর চটীওয়ালার ২।৪টা গরু চরিতেছে, দেখিলাম। সেখানে অনেকগুলি গাছ দেখিলাম; তাহাদের গোড়া সকল পাথর দিয়া বাঁধান। আমাদের দেশে গাছের গোড়া যেরূপ ইষ্টক দ্বারা বাঁধান হয়, উহা সেরূপ নহে। দেখিলাম পাথরগুলি সব আলগা। তদুপরি উপবেশন করিলে পাথর খসিয়া পড়ে।

আমার আহারের সময় দোকানদার খানিকটা গরম দুধ আনিয়া দিল। এই পার্ব্বত্য পথে বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ প্রায় পাওয়া যায় না। নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে দোকানদারের এক ছোট ছেলে আমার জন্য এক তাল গুড় লইয়া আসিল। অতি পরিতোষপূর্ব্বক আহার সম্পন্ন করিলাম। আহারান্তে যখন বিশ্রাম করিতেছি, তখন দোকানীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি আমার নিকট আসিয়া বসিল। তাহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখিলাম। তাহাদের মুখমণ্ডল সরলতায় পরিপূর্ণ।

বৈকালে আবার যাত্রারম্ভ করিলাম। আসিবার কালে সেই সকল ছেলে মেয়েদের হস্তে কিছু দিয়া আসিলাম। প্রথমে কিছুতেই তাহারা লইতে চাহে না; অবশেষে তাহাদের পিতার আদেশে উহা লয়। পীপল চটী পরিত্যাগ করিতে বেলা প্রায় ৪টা বাজিয়া গেল। হাট চটী, সিয়া চটী, ইত্যাদি

অতিক্রম করিয়া যখন আমরা মঠ চটীর নিকট আসিলাম, তৎকালে এক ভীষণ শব্দ কর্ণগোচর হইল। অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বজ্রপতনের ন্যায় আর এক শব্দ। চতুর্দ্দিকে চাহিতে থাকি কোথাও কিছুই দেখিতে পাই না। আকাশ ও বেশ পরিষ্কার; মেঘের লেশ মাত্র নাই। তবে এ ভীষণ শব্দ কিসের—কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। পরে দাণ্ডি-বাহকদের একজন অদূরে এক পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া নদীগর্ভে নিপতিত হইতেছে তাহা দেখাইল। সে স্থানে বিরহগঙ্গা অলকানন্দা সহ মিশিয়াছে। আমরা নদীর যে পার দিয়া গমন করিতেছি তাহার পরপারে উক্ত ঘটনা ঘটিতেছে। আমরা তথায় আর ক্ষণকালও অপেক্ষা না করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। "পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্" এই মহাবাক্যাংশ স্মরণ করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। প্রকৃতির এই সকল ঘটনা সন্দর্শনে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভগবানের অনন্ত রাজ্যে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, সকল বস্তুই কালপ্রভাবে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা লালসাঙ্গায় উপস্থিত হইলাম। আসিবার পথে আমাদিগকে এক সেতুর উপর দিয়া অলকানন্দা পার হইতে হইল।

লালসাঙ্গা স্থানটী অতি রমণীয়। এই সহরটী নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ। ইহার অপর আর এক নাম চামেলা। জোশীমঠ

হইতে লালসাঙ্গা অবধি অনেক শস্যক্ষেত্র দেখা যায়। লাল-সাঙ্গা এখানকার সব ডিভিজন্। এখানে থানা, পুলিশ, আদালত, ডাকঘর ইত্যাদি রহিয়াছে। একটী বিদ্যালয়ও এস্থানে আছে। এখানে এক দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিলাম। আমরা বাজারের নিকট এক দ্বিতল গৃহে বাসা লইলাম। এখানকার বাটীগুলি অধিকাংশই দ্বিতল। বাজারের দোকান-সমূহে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা যে স্থানে বাসা লইলাম সে স্থানটী নির্জ্জন নহে, অনেক লোকের তথায় বসতি আছে। ইহার কারণ এই যে, কেদার-বদরীর, উভয় পথের যাত্রী এখানে সমাগত হয়। এস্থান হইতে অলকানন্দা অনেক নিম্নে প্রবাহিতা হইতেছে। নদীকূলে অবতরণ বা তথা হইতে আরোহণ করা বড় কষ্ট সাধ্য। নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলাম। সেখানে প্রকৃতির কি মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। সম্মুখভাগে এক উচ্চ পর্ব্বত দণ্ডায়মান এবং তাহার নিম্নপ্রদেশ দিয়া অলকানন্দা কলনাদে বহিয়া যাইতেছে। পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে বসিয়া কূজন করিতেছে। চতুর্দ্দিক চন্দ্রকিরণে সমুদ্ভাসিত। এই সকল শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইলাম। কিয়ৎকাল নদীতটে বিশ্রাম-পূর্ব্বক বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জলযোগ সারিয়া নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইলাম।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—প্রাতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। তদনন্তর ভগবানের নাম

স্মরণপূর্ব্বক যাত্রারম্ভ করিলাম। এক্ষণে আমাদিগকে নূতন পথ ধরিয়া চলিতে হইতেছে। প্রভাতে আমি পদব্রজে যাইতে বড়ই আরাম বোধ করিতাম। সেজন্য প্রত্যহ প্রাতে প্রায় ২।৩ মাইল পথ পদব্রজে যাইতাম। প্রায় ২ মাইল পথ আসিয়া এক ছোট চটী পাইলাম। তথায় আমার তৃষ্ণা পাওয়ায় নিকটস্থ এক ঝরণা হইতে জলপান করিয়া দাণ্ডিতে আরোহণ করিলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে অসংখ্য গোলাপ গাছ দেখিলাম; উহাদের সদ্যঃবিকসিত পুষ্পসৌরভে দশদিক আমোদিত হইতেছে। তারপর ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানে নন্দা নদী অলকানন্দা সহ মিলিতা হইয়াছে। নন্দার জল দেখিলাম কৃষ্ণবর্ণ, উহা শুভ্রবর্ণ অলকানন্দার জলে পড়িতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, অলকানন্দা সহ গঙ্গার সঙ্গম হওয়ায় এস্থানের নাম অলকানন্দা বা নন্দপ্রয়াগ হইয়াছে। সঙ্গমঘাট হইতে পথের ধারে এক সুন্দর উদ্যান দৃষ্টি গোচর হইল। উহাতে নানাবিধ ফল ফুলের বৃক্ষ রহিয়াছে। পাণ্ডাগণ বলিল, এক ধনী শেঠ এই উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এই নন্দপ্রয়াগে নন্দ মহারাজের অনেক কীর্ত্তিকলাপ বিদ্যমান আছে। এখানে কণ্বমুনির আশ্রম আছে। আশ্রমটী শান্তিপূর্ণ। সেই ব্রহ্মপরায়ণ ঋষির অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ অদ্যাবধি যেন প্রত্যেক তরুলতায় বিরাজ করিতেছে। এই স্থানে মহারাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার শুভ সম্মিলন হয়।

আশ্রম দর্শনান্তর সঙ্গমঘাটে যাইয়া জলস্পর্শ করিলাম। ঘাটের উপর বশিষ্ঠ-প্রতিষ্ঠিত শিব ও তৎপার্শ্বে চণ্ডিকামাতার মন্দির অবস্থিত। চণ্ডিকামাতার ও শিবের পূজার্চ্চনা সমাপনান্তে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

এস্থানে একটী বাজার আছে। তাহার দোকানগুলি দ্বিতলোপরি অবস্থাপিত। গৃহ সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত; উহাদের দ্বিতলস্থ কক্ষের ছাদও কাষ্ঠময়। ঘরের মেঝে শ্লেট পাথরে আবৃত। শ্রীনগরের পর এরূপ বাজার আর পাওয়া যায় নাই। প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই এস্থানে প্রাপ্ত হয়। এখানে ৩।৪টী ধর্ম্মশালা আছে। একটী বিদ্যালয় সম্প্রতি এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। কয়েকজন ছাত্র সঙ্গে এক শিক্ষক আমার নিকট বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সাহায্য প্রার্থনা করিল। আমি তাহাদিগকে যথাসাধ্য প্রদান করিলাম। এখানে দেখিলাম জনকয়েক বদরিনাথের পাণ্ডা বাস করেন। তাঁহারা এখান হইতে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এখানে মহাদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে; তথায় অনবরত নহবৎ বাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে বংশীধ্বনিও শ্রুত হইল। সেস্থানে পুরুষ ও রমণী নিঃসঙ্কোচে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছেন। সকলেরই প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগরিত। তাঁহাদের মুখমণ্ডল সরলতায় পরিপূর্ণ। সকলেই ভক্তিভরে মহেশ্বরের পূজার্চ্চনা করিতেছে। আমি মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম।

পথিমধ্যে অনেক প্রকার নূতন নূতন বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম।

আম্র বৃক্ষ ও অনেক রহিয়াছে। প্রায় ৩ মাইল আসিয়া "ভরত চটী" পাইলাম। নিকটেই এক ক্ষুদ্র গ্রাম। দেখিলাম পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষেরা কৃষিকার্য্য করিতেছে। অলকানন্দার উভয় পার্শ্বে শস্যশ্যামল হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সকল রহিয়াছে। যবাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ভরত চটী পার হইয়া আরও ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আমরা "লাংগাসু চটী" পাইলাম। তখন বেলা অধিক হওয়ায় উক্ত চটীতে আহারাদি সারিবার জন্য উঠিলাম। আহারান্তে বিশ্রাম লাভ করিলাম।

বৈকালে পুনরায় রওনা হইলাম। এখান হইতে প্রায় ২ মাইল পথ এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া "সোনালা চটী" পাইলাম। তথা হইতে আরও ২ মাইল আসিয়া "জয়কান্তি চটী" এস্থান হইতে কর্ণপ্রয়াগ ২ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অল্পক্ষণ পরেই কর্ণ প্রয়াগে পঁহুছিলাম।

এইস্থানে কর্ণ-গঙ্গা অলকানন্দা সহ মিলিতা হইয়াছে। কর্ণ-গঙ্গার অপর এক নাম পিণ্ডর গঙ্গা। সঙ্গম ঘাটের জল স্পর্শ করিলাম। এখানে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর জল কিনিতে পাওয়া যায়। আমি সেই গঙ্গোত্তরীর ও যমুনোত্তরীর জল একটী জল-পাত্রে পূর্ণ করিয়া ঐ পাত্রের মুখ দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিলাম। উক্ত জল কলিকাতায় আনয়ন পূর্ব্বক যখন তিন মাস পরে ৺শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বে রামেশ্বর ধামে গমন করি, তখন ঐ জল রামেশ্বর দেবের মস্তকে সেচন করি। অনেকে হরিদ্বার বা হৃষীকেশ হইতে জল আনিয়া সাগরসঙ্গমে কপিল মুণির মস্তকে ঢালিয়া থাকেন।

সঙ্গম ঘাটের সোপানোপরি এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষ বহুকালের পুরাতন। যাত্রিগণকে উহাতে জলদান করিতে হয়। সঙ্গম ঘাটের জল বেশ স্থির, মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। এইস্থানে নদী তেমন গভীর নহে। যাত্রিবর্গ স্বচ্ছন্দে স্নান করিতে পারে। এস্থানে এক শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি দেখিলাম। পাণ্ডাপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, কর্ণ এখানে আসিয়া ঐ মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করেন। তথায় এক কুণ্ড দেখিলাম। উহার নাম কর্ণ কুণ্ড। কথিত আছে, এস্থলে বসিয়া মহাত্মা কর্ণ বহুশত সুবর্ণ মন্দির ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। দানের জন্যই কর্ণ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি ঘাটে বসিয়া সমাপন করিলাম। পরে বাসায় আসিয়া জলযোগ সারিয়া কর্ণপ্রয়াগ দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। এখানে বাজার, দোকান, ডাকঘর, থানা প্রভৃতি যেরূপ প্রত্যেক সহরে থাকে সেইরূপ আছে। ২।৩ টী ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা ও দেখিলাম। এই সকল সদাব্রতে সাধু সন্ন্যাসী ও দরিদ্র যাত্রিবর্গকে আহার্য্য প্রদত্ত হয়। এখানে একটী চিকিৎসালয়ও আছে। তথায় বিনামূল্যে ঔষধ বিতরিত হয়। বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সমুদয় পাওয়া যায়। আমরা বাজারের নিকট এক বাসা লইলাম সে রাত্র দোকান হইতে মিষ্টান্ন কিনিয়া আহার করিলাম। তৎপরে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম। এই কর্ণ প্রয়াগে অল্প জলকষ্ট পাইলাম; কারণ এখানে কোনও ঝরণা নাই এবং নদীগর্ভ সহর হইতে বহু নিম্নে।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—অদ্য শয্যা ত্যাগ করিতে অল্প বিলম্ব হইয়াছিল। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যাত্রা করিতে বেলা প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। এই কর্ণ প্রয়াগ হইতে দুইটা পথ দুই দিকে গিয়াছে। একটী পথ দক্ষিণাভিমুখে কর্ণগঙ্গার ধার দিয়া রামনগরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং তথা হইতে যাত্রিগণ রেলগাড়ী ধরিয়া থাকে। অপর পথটী অলকানন্দার ধার দিয়া রুদ্রপ্রয়াগ অভিমুখে গিয়াছে এবং তথা হইতে শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া যাত্রিগণ হরিদ্বারে উপনীত হয়। তবে কর্ণপ্রয়াগ হইতে রামনগরের পথে যাওয়াই বিশেষ সুবিধা-জনক। একটী কথা এখানে বলিবার আছে। উত্তরাখণ্ডের এই পঞ্চপ্রয়াগ, এমন কি যত স্থান পরিভ্রমণ করিলাম, তন্মধ্যে দেব-প্রয়াগের ন্যায় সুন্দর স্থান আর দেখিলাম না। কর্ণপ্রয়াগ হইতে প্রায় ২ মাইল আসিয়া "সেমেলী চটী" পাইলাম। এখানে চণ্ডী-কাদেবীর এক মন্দির আছে।

তথা হইতে কিয়ৎদূরে আটাগর নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেমেলী হইতে ২ মাইল আসিয়া "শিরোলী চটী।" পথি মধ্যে কতপ্রকার বনফুল দেখিলাম। স্থানে স্থানে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। অদূরে পর্ব্বত শিখর হইতে ক্ষীণতোয়া নদী সকল খরস্রোতে নিম্নে নামিয়া আসিতেছে ও তদুপরি সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়ায় উহা রজতাভা ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির এই সকল দৃশ্য বড় মনোমুগ্ধকর। আরও ২মাইল আসিয়া এক চটী পাইলাম।

উহার নাম "সিমুলিয়া চটী"। এইখানে আহারাদি সারিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামলাভ করিলাম।

সকালে শয্যাত্যাগ করিতে বিলম্ব হওয়ায় যাত্রা করিতেও বেলা হইয়াছিল ; সেজন্য অধিক পথ অগ্রসর হইতে পারি নাই। বৈকালে বেলা ৩টা বাজিলেই আমরা বহির্গত হইলাম। সিমুলিয়া চটী হইতে প্রায় ৭ মাইল পথ আসিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে "আদ বদরিতে" উপস্থিত হইলাম। এই সাত মাইল পথের মধ্যে কোথাও একটী চটি দেখিতে পাইলাম না। এই জনমানবহীন পথ অতিক্রম পূর্ব্বক আদবদরীতে আসিয়া লোকালয় দেখিলাম।

প্রথমেই আদি-বদরিকানাথ দেবকে দর্শন করিতে যাইলাম। মন্দির মধ্যে ভগবান্ বদরিকানাথের যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা তাঁহার যোগকালীন মূর্ত্তি। নররূপী নারায়ণ নিমীলিত নয়নে নিবিষ্টচিত্তে যোগাসনে বসিয়া আছেন। দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমাসীন। উপরিভাগে বৃষভারূঢ় মহাদেব ও তৎপার্শ্বে গৌরীদেবী রহিয়াছেন। হর পার্ব্বতীকে যোগতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। সম্মুখে অপর এক কক্ষে হরপার্ব্বতী ও কার্ত্তিক গণেশের মূর্ত্তি বিদ্যমান। এই মন্দির বহুকালের পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ভগ্নপ্রায় মন্দির দেখিলাম। তাহাতেও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। আদিবদরিকানাথের পূজার্চ্চনা সারিয়া বাসায় আসিলাম। এইখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

এই আদি-বদরীতে অনেক পাহাড়ীর বাস আছে। ইহা একটী

ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে অনেকগুলি দোকানও আছে। একটী ধর্ম্মশালাও আছে। এই সকল পথে অনেক ধর্ম্মশালা স্থাপিত আছে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—প্রভাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তবে বৃষ্টিপাত হইতেছিল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, অল্প বেলা হইলেই রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রখর হয়। রৌদ্রে পথ অতিক্রম করিতে বড়ই কষ্টবোধ হয়। আবার এদিককার পথে সর্ব্বত্র ঝরণা না থাকায় যাত্রিগণকে তৃষ্ণায় অতিশয় ক্লেশভোগ করিতে হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মাত্মা সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক ধর্ম্মশালা ও জলশালা থাকায়, যাত্রিগণের কষ্টের অনেক লাঘব হয়। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকগণ সেই সকল সাধু মহাত্মাদিগের কৃপায় জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিতেছে।

কিয়দ্দূর যাইয়া আমাদিগকে এক প্রকাণ্ড চড়াই আরোহণ করিতে হইল। তখন আকাশ মেঘাবৃত থাকায় বাহকদিগের বড় বেশী বেগ বোধ হইল না। সেই চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় ৩৷৷০ মাইল পথ আসিয়া আমরা "গোয়াড চটী" পাইলাম। এখানে দাণ্ডিবাহকেরা অল্প বিশ্রাম পূর্ব্বক পুনরায় চলিতে লাগিল। খানিক পথ অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় এক পশলা খুব বৃষ্টিপাত হইল; তবে উহা অধিক্ষণ স্থায়ী ছিল না। এখান হইতে পথের পার্শ্বে বিজন বন। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল যেন বিশ্ব-বিধাতার উপাসনার উদ্দেশে উচ্চশির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান

আছে। স্থানে স্থানে পক্ষিগণের কলরব শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অনেক আম্রবৃক্ষ দেখিলাম, তাহাতে অসংখ্য সুপক্ক আম্রফল ঝুলিতেছে। কোথায় একটী ক্ষুদ্রকায়া নদী বহিয়া যাইতেছে। অদূরে অনেকগুলি তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এইরূপ মাইল খানেক পথ চলিবার পর একটা সপ্ সপ্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রথমে মনে হইল যে প্রবল বেগে ঝটিকা বহিতেছে। তার পর শূন্যপথে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া দেখি যে অতি বৃহৎ একপাল শকুনি উড়িয়া আসি-তেছে। তাহাদের কি ভীষণ আকৃতি! তাহারা বসিলেও মানুষের অপেক্ষা বৃহৎ হইবে। তাহাদের বর্ণ বহুবিধ—যথা লাল, নীল, সাদা, হলদে ইত্যাদি। সে রকম শকুনি এ প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এত শকুনি এখানে আসিবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দাণ্ডিবাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে মৃত গো মহিষ বা অন্য কোন জন্তু পড়িয়া আছে, তাহারা ঐ মৃত দেহ ভক্ষণ করিতে আসিতেছে। দাণ্ডিবাহকেরা দাণ্ডি একস্থানে নামাইয়া রাখিল। পরে যখন ঐ সকল শকুনি এক পর্ব্বতোপরি বসিল, তখন পুনরায় আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা প্রায় ১১টার সময় এই বিজন বনের মধ্যে এক চটী পাইলাম। জঙ্গলের ভিতর অবস্থিত বলিয়া উহার নাম "জঙ্গল চটী"। এই স্থানকে "দিবালী" বলে। দেখিলাম এখানে জন কতক পাহাড়ীদের বসবাস আছে। চটীতে যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্যও সঞ্চিত আছে। যাহা হউক, আহারাদি

সারিবার উদ্যোগ এখানে করিলাম। আহারান্তে অল্প বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক বৈকালে জঙ্গল চটী পরিত্যাগ করিলাম। উক্ত চটী ছাড়াইয়া অল্প লোকালয়ের আভাস পাওয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধমাইল আসিয়া রামগঙ্গা পাইলাম। ইহা একটী ছোট নদী। এই নদীর ধারে অনেক পাহাড়ীদের ঘর বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এস্থান হইতে মেলচৌরী ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। পথে আসিতে আসিতে জনকয়েক বাহকদিগের সহিত দেখা হইল। তাহারা মেলচৌরী হইতে যাত্রা পৌঁছাইয়া আসিতেছে। তাহারা বলিল যে, কয়েকটী মাজাকে মেলচৌরীতে পৌঁছাইয়া আসিতেছি। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। পশ্চিমগগণ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বাহকদিগকে দ্রুত চলিতে বলিলাম। তাহারা সন্ধ্যাকালে আমাকে মেলচৌরীতে লইয়া আসিল। মেলচৌরীতে উপস্থিত হইয়া এক চটীতে আশ্রয় লইলাম।

চটীতে উঠিয়া দেখি যে তথাকার ঘরগুলি যাত্রিগণে পরিপূর্ণ। চটীওয়ালা আমার জন্য কোন গতিকে অল্পস্থান ঠিক করিয়া দিল। এস্থানে আসিয়া আমার কয়েকজন আত্মীয়ার সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। সে রাত্র তাঁহাদিগের সহিত পথের বিবরণ সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প করিয়া অতিবাহিত করিলাম।

এই মেলচৌরীতে দাণ্ডি প্রভৃতির বাহকগণকে তাহাদের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া বিদায় দিতে হয় ও পুনরায় অন্যান্য

বাহক নিযুক্ত করিতে হয়। এই স্থানের এরূপ প্রথা যে গাড়োয়াল জেলার কুলি আলমোরা বা কুমায়ূন জেলায় যাইবে না। অগত্যা সকল যাত্রীকে এখানে আসিয়া বাহক ও কুলিগণকে তাহাদের প্রাপ্য টাকাকড়ি চুকাইয়া দিতে হয়। এই মেলচৌরী গাড়োয়াল জেলার শেষ সীমানা। আমি দাণ্ডিবাহক, পাচক ও বোঝাওয়ালার সমস্ত প্রাপ্য মিটাইয়া দিলাম। পরে সেখানকার চৌধুরী অপর চারিজন বাহক ও অপর একজন বোঝাওয়ালা আমার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিল। এখান হইতে তাহারা আমাকে শ্রীকোট পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে এই বন্দোবস্ত হইল। বলিতে ভুলিয়াছি যে পুরাতন পাচকের পরিবর্ত্তে এক নূতন পাচক নিযুক্ত করিলাম। মেলচৌরী হইতে শ্রীকোটের দূরত্ব প্রায় ৩২ মাইল পথ হইবে। এই অল্প পথের জন্যই বাহকগণ ২০৲ বিশটাকা লইল। দেখিলাম এখানকার চৌধুরী যাত্রিগণের নিকট অবসর বুঝিয়া দ্বিগুণ মূল্য আদায় করিয়া লয়। তজ্জন্য—অনেকেই এখান হইতে শ্রীকোট অবধি পদব্রজে যাইয়া থাকে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—প্রভাত হইবামাত্রই আমার আত্মীয়গণ যাত্রা করিলেন। আমি অল্প বেলায় বহির্গত হইলাম। এক্ষণে আমার সঙ্গে নূতন বাহক চতুষ্টয়, নূতন বোঝাওয়ালা ও নূতন পাচক। আসিবার কালে পুরাতন লোকদিগকে কিছু দিয়া আসিলাম। তাহারা অতি অল্প পাইয়াই সন্তুষ্ট দেখিলাম।

এই মেলচৌরীর ধার দিয়া রামগঙ্গা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এইস্থান এক পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। এখানে দোকান হাট সমুদয়ই আছে। এখানে দেখিলাম গাড়োয়াল ও কুমায়ুন এই উভয় জেলার অধিবাসী রহিয়াছে। অনেক কুলি, পাচক, যান ইত্যাদি এস্থানে যাত্রিবর্গের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অশ্বও অনেক এখানে আছে। কেহ কেহ অশ্বারোহণে এই পথ অতিবাহিত করে।

মেলচৌরী ছাড়াইয়া প্রায় ২ মাইল আসিয়া আমাদিগকে এক ভীষন চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইল। এই চড়াই আরোহণ করিতে দাণ্ডিবাহকেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পথিমধ্যে কোথাও ছায়াযুক্ত স্থান নাই। একেতো পার্ব্বত্য পথ, তাহার উপর আবার রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ। পিপাসায় সকলেই কাতর হইয়া উঠিল। আমাদিগকে তারপর এক ঢালু উৎরাই নামিতে হইল। সেই উৎরাই নামিবার পর এক চটী পাইলাম। উহার নাম "রিউয়ারী চটী।" মেলচৌরী হইতে এই ৯ মাইল পথে আর কোন চটী দেখিলাম না। রিউয়ারী চটীতে আসিয়া বাহকগণ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিল। আমিও নিকটস্থ ঝরণা হইতে জলপান করিলাম। এই পার্ব্বত্য পথে ঝরণার জল কি সুমধুর! এই শীতল ও সুমিষ্ট জল পথশ্রম দূর করিবার একমাত্র উপায়। এখান হইতে রাস্তা কেবল উৎরাই, স্থানে স্থানে দু'একটা মাত্র চড়াই। ক্রমে যতই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই শীতের প্রকোপ হ্রাস হইতে

লাগিল। এই জন্য গাড়োয়াল জেলার লোক অন্য কোন স্থানে যাইতে চাহে না। প্রায় ৪ মাইল আসিয়া "তিউয়ারী চটী" পাইলাম। সকলেই শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম। বাহকগণও আর চলিতে পারিল না। তাহারা সকলেই স্নানাহারের চেষ্টায় গেল। আমিও উক্ত চটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

ঐ চটীতে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, আমার আত্মীয়ারা কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তথায় আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। সেদিন তাঁহারা আমায় আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন। তীর্থক্ষেত্রে অন্যের দ্রব্য আহার করিতে নাই; সুতরাং আমি তাঁহাদিগকে দোকান ও বাজার হইতে চাউল, ঘৃত, কপি, ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্য কিনিয়া দিলাম। সেখানে মৎস্যও কিনিতে পাওয়া যায়; তবে সেদিন একাদশী তিথি বলিয়া মৎস্য লইলাম না। তাঁহারা পাকাদি করিলেন। প্রায় মাসাবধি কাল এই পাহাড়ী পাচকের হাতের রান্না খাইতেছি এবং সে রান্না আর কি— একটু আলু ভাতে, মুগের ডাল সিদ্ধ ও ক্বচিৎ একটু তরকারী। উহাতে আমার মুখের তার বদলাইয়া গিয়াছিল। আজ প্রথমতঃ বাঙ্গালী রমনীর হাতের রন্ধন এবং তাহার উপর নানাপ্রকার ব্যঞ্জন পাইয়া বড়ই পরিতোষের সহিত আহার সম্পন্ন করিলাম। আহারের সময় তাঁহারা আমার নিকটে বসিয়া আমার কি প্রয়োজন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

আহারান্তে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বেই

আমি বহির্গত হইলাম। আসিবার সময় শুনিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিধবা থাকায় তাঁহারা সেরাত্র উক্ত চটীতে থাকিয়া পরদিন প্রভাতে তথা হইতে যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে এক স্থানে এক শিব মন্দির দেখিতে পাইলাম; তথায় বুড়া কেদারনাথ রহিয়াছেন। তাঁহার মন্দিরটী সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিকটেই এক পর্ণ কুঠীরে উহার পূজারী বাস করেন। ঠাকুর ও পূজারী—উভয়েরই অবস্থা সমান দেখিলাম। এখান হইতে রামগঙ্গা অতি নিকটে। আশে পাশে ২।১টা গ্রামও আছে। খানিক পথ আসিয়া দেখিলাম পাহাড়ীরা এক শব বহন করিয়া গঙ্গার তীরে লইয়া যাইতেছে। ঐ শবের সঙ্গে অনেক পাহাড়ী চলিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই হস্তে এক এক খণ্ড কাষ্ঠ রহিয়াছে। আমি দাণ্ডিবাহকগণকে উহাদের কাষ্ঠ বহনের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল যে, ঐ মৃত ব্যক্তি একজন ধনী লোক হইবে। যে সকল লোক কাষ্ঠখণ্ড হস্তে লইয়া ঐ শবের সঙ্গে যাইতেছে, তাহারা কেহ কেহ ঐ মৃত ব্যক্তির প্রজা এবং কেহ কেহ বা প্রতিবাসী হইবে। তাহারা ঐ কাষ্ঠখণ্ড সকল তাহার চিতায় নিক্ষেপ করিয়া মৃত ব্যক্তির বিদায়কালীন সম্মান দেখাইবে। পরে অশৌচান্তে মৃত ধনীর আত্মীয় স্বজন ঐ সকল লোকদিগকে ভোজন করাইবে।

প্রায় ৪ মাইল আসিয়া আমরা "লালধি চটীতে" উপস্থিত হইলাম। তখন দিবা অবসানপ্রায় দেখিয়া আর অধিকদূর

অগ্রসর না হইয়া এই চটীতে নিশা যাপনার্থ উঠিলাম। এখানে দোকান হইতে লুচী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি কিনিয়া আহার করিলাম। আহারান্তেই নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—প্রভাতে পুনরায় যাত্রারম্ভ করিলাম। এখান হইতে পথ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক্ষণে আমাদিগকে ক্রমশঃ নীচে নামিতে হইতেছে। প্রায় ৫ মাইল আসিয়া "লাওলা চটী" পাইলাম। তথা হইতে ৩ মাইল আসিবার পর "ভিকাসেন চটি"। এখানে আহারাদি সারিয়া লইলাম।

অপরাহ্নে ভিকাসেন চটি ত্যাগ করিলাম। পথি মধ্যে এক নদী পাইলাম। ঐ নদীর উপর সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তখন জল অল্প থাকায় বাহকগণ এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া নদী পার হইল। বর্ষাকাল হইলে উহা পার হইতে পারিত না। নদীপার হইয়াই শ্রীকোট পর্ব্বত পাইলাম। অতি সন্তর্পণে নদীতীর হইতে বাহকেরা পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিল। ঘাটে দেখিলাম অনেক পাহাড়ী স্ত্রীলোক জল লইতে আসিয়াছে। বুঝিলাম নিকটেই কোন গ্রাম আছে। সন্ধ্যার সময় আমরা শ্রীকোটে পঁহুছিলাম। এস্থানে উপনীত হইয়া নূতন বাহক চতুষ্টয়ের, বোঝাওয়ালার ও পাচকের প্রাপ্য অর্থ মিটাইয়া দিলাম। এখান হইতে "রামনগর" ৩৮ মাইল দূর হইবে। গরুর গাড়ী ভিন্ন এখানে অপর কোন যান পাওয়া যায় না। আমি ১১৲ এগার টাকায় একখানি উৎকৃষ্ট গো-শকট

ভাড়া করিলাম। আমি যে দাণ্ডি ক্রয় করিয়াছিলাম তাহা উক্ত গোশটকের চালককে ২৲ দুই টাকায় দিয়াছিলাম; কারণ ঐ দাণ্ডি কলিকাতায় লইয়া আসিতে সুবিধাজনক বিবেচনা করিলাম না। রাত্রে ঐ গাড়ীতেই আমার বিছানা, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি লইয়া থাকিলাম। সে রাত্র ভালরূপ নিদ্রা লাভ করিতে পারিলাম না।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—অতি প্রত্যূষেই শকট চালককে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলাম শ্রীকোট হইতে পূর্ব্বরাত্রে পথে আহারের জন্য কিঞ্চিৎ চাউল, ডাল ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইযাছিলাম। সেদিন ২০ মাইল পথ আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে "গোদরী চটী" পাইলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় বেলা দ্বিপ্রহরে আহারাদি সারিয়া লইয়াছিলাম। রাত্রিকালে ঐ চটীতে না উঠিয়া গাড়ীতেই নিদ্রাব ব্যবস্থা করিলাম।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—অদ্য প্রভাত হইবার ঘণ্টা তিন পূর্ব্বেই চালক রাত্রি ঠিক করিতে না পারায় গাড়ী চালাইয়া দিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই মুসলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। সেই আলোকবিহীন পথে বলদদ্বয় গাড়ী টানিতে লাগিল। আমি চালককে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। আমার গাড়ীর অগ্রপশ্চাতে আরও ৩।৪ খানি গাড়ী ছিল; তাহাতে বিভিন্ন দেশীয় কয়েক জন যাত্রী ছিল। সেই সকল গাড়ীতে লণ্ঠনের আলোক ছিল এবং তাহাতেই

অাঁধারে আলোক হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বৃষ্টি থামিয়া যাইল। তখন পূর্ব্বাকাশ অরুণের সংস্পর্শে ঈষদ্রক্ত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিক পক্ষিগণের কলরবে নিনাদিত হইতেছে। বারিবর্ষণান্তে প্রভাতের মৃদু সমীরণে শরীর পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। প্রায় ১১, মাইল পথ আসিয়া আমরা "সাওরাল চটীতে" উপস্থিত হইলাম। এই চটীতেই আহারাদি করিয়া লইলাম। এখান হইতে রামনগর ষ্টেশনের দূরত্ব মোটে ৭ মাইল। আহারান্তে পুনরায় রওনা হইলাম। পথিমধ্যে অনেক আম্রকানন দেখিলাম। সন্ধ্যাকালে আমরা "রামনগর ষ্টেশনে" পঁহুছিলাম। তথায় খাদ্য দ্রব্য বড় কিছুই পাওয়া গেল না। নিকটেই এক আম্রকানন দেখিতে পাইলাম। সেখান হইতে সদ্য উন্মুলিত আম্রফল ক্রয় করিয়া রাত্রে আহার করিলাম। সে রকম সুপক্ক ও সুমিষ্ট আম্রফল এসব দেশে পাওয়া বড় কঠিন। রাত্র ২॥০ টার সময় ট্রেণ ধরিলাম। এই রামনগর ষ্টেশন রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন লাইনের অন্তর্গত একটী ষ্টেশন। এখান হইতে কাশীপুর, বাজপুর প্রভৃতি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া পরদিন সকাল ৭॥০ টায় (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার) লালকুয়া জংশন ষ্টেশনে আসিলাম। এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া বেরিলি বিভাগের ট্রেণে আরোহণপূর্ব্বক বেলা ১১॥০ টায় বেরিলি জংশনে আসিলাম। তথা হইতে ডাক গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি দাণ্ডিতে করিয়া ৩০ দিনে ৺কেদারনাথ ও বদরিকানাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। দাণ্ডিবাহক দিগের নিকট অবগত হইলাম যে, এত শীঘ্র কেহ ৺কেদারনাথ ও বদরিকানাথ দর্শন করিয়া ফিরিতে পারে নাই। যাহারা পদব্রজে গমন করিয়া থাকেন তাহাদের দেড় মাসের অধিক সময় লাগে। কাণ্ডি বা ঝাম্পানে যাইলেও প্রায় ৪০ দিন সময় যায়।

ভগবান্ বদরিকানাথের কি এক অপূর্ব্ব মহিমা! কত শত বৃদ্ধ নর নারী, যাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে ইহারা কদাচ বিষ্ণুক্ষেত্রে যাইতে সমর্থ হইবে না, তাহারাই নিরাপদে শ্রীভগবান্ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ইহা আমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলাম। এই সকল ব্যাপার সন্দর্শনে ও আমিও বা কি প্রকারে এই দুর্গম কৃচ্ছ্রসাধ্য পথ অতিক্রম পূর্ব্বক শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিলাম, তাহাতে—

"হৃষিত শরীর মুহুর্মুহুঃ মম,
হৃষিত আবার আবার স্মরিয়া।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামেশ্বর তীর্থাভিমুখে।

উত্তরাখণ্ডে পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কর্ণপ্রয়াগ হইতে গঙ্গোত্তরী—যমুনোত্তরীর পূতবারি লইয়া আসি। তিন মাস স্বগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সেতুবন্ধে যাইবার জন্য মনস্থির করিয়া লইলাম। তথায় গমন করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য, উপরি উক্ত পূতবারি ৺রামেশ্বরের মস্তকোপরি সেচন করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল; তাহার উপর সে বৎসর কালশুদ্ধ থাকায় আরও সুবিধা হইল। শারদীয়া মহাপূজার দুই দিন পূর্ব্বে যাত্রা করিবার দিনস্থির করিলাম। এবার আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধুকে আমার সঙ্গে লইলাম। তাহার অধিকাংশ ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইল।

সন ১৩২৬ সালের ১২ই আশ্বিন, সোমবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় উক্ত বন্ধু-সমভিব্যাহারে হাবড়া ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলাম। তথায় যাইয়া দুইখানি রাজমহেন্দ্রীর টিকিট মান্দ্রাজগামী মেলে যাইবার জন্য ক্রয় করিলাম। অপরাহ্ণ ৫টা ৩৪ মিনিটে ঐ ডাকগাড়ী হাবড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ

করিল। বাষ্পীয়-যান অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যথাকালে খড়গপুর জংশন ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। তথা হইতে গাড়ী ক্রমে ক্রমে দাঁতন, বালেশ্বর, ভদ্রক প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া খুরদা রোড্ ষ্টেশনে আসিল। এইস্থান হইতে একটী লাইন বরাবর শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে গিয়াছে। অনেকবার পুরুষোত্তম দর্শন হইয়াছে বলিয়া এবার আর এখানে অবতীর্ণ হইলাম না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমরা চিল্কাহ্রদ দেখিতে পাইলাম। তারপর ওয়ালটেয়ার ইত্যাদি ষ্টেশন ছাড়াইয়া ১৩ই আশ্বিন, মঙ্গলবার প্রায় রাত্র ৮॥০ ঘটিকায় রাজমহেন্দ্রীতে উপনীত হইলাম।

এই রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী জেলার এক প্রধান নগর। এখান হইতে সমুদ্র অনেক দূরে অবস্থিত; কিন্তু গোদাবরীর দূরত্ব এক ক্রোশের অধিক হইবে না। সহর ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল হইবে। এখানে কোটী-লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে। এস্থানে অনেক দ্রষ্টব্য তীর্থ আছে। কথিত আছে যে, একদা কোন হিন্দু নরপতি এই রাজমহেন্দ্রীকে আর্য্যাবর্ত্তের বারাণসী সদৃশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এক পর্ব্বত হইতে কোটী লিঙ্গ প্রস্তুত করাইতে ছিলেন; তখন দেবগণ উহা হইতে একটী শিবলিঙ্গ অপহরণ করিয়া নরপতিকে বিফলমনোরথ করেন।

সে রাত্র আমরা এক হিন্দু হোটেলে যাইয়া উঠিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে গোদাবরীতে স্নান করিতে যাইলাম; ইহাতে স্নান করিলে স্বর্গলাভ হয়। এই নদী ভারতবর্ষে যে সাতটী

পুণ্যতোয়া নদী আছে তাহাদের অন্যতমা ও পুরাণোক্ত যে নয়টী বিষ্ণুপাদপ্রসূতা নদী আছে, তাহাদেরও মধ্যে অন্যতমা; সুতরাং এই পুণ্যপ্রদ নদীর নাম যে গোদাবরী (গাম্ স্বর্গম্ দদাতি ইতি গোদা তাসু বরী শ্রেষ্ঠা) হইয়াছে, তাহাতে বাক্যার্থ কোনরূপে অসমত্ব দোষে দূষিত হয় নাই। এই নদীকে গৌতম মুনি ত্র্যম্বক পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া আনয়ন করেন। সেই জন্য ইহার অপর এক নাম গৌতমী গঙ্গা। ইহার উৎপত্তির বিবরণ পরে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত নদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

বৈকালে রাজমহেন্দ্রী পরিত্যাগ করিলাম। রেল গাড়ী বদল করিয়া পরদিন বেলা ৯ টায় আমরা কালহস্তী ষ্টেশনে নামিলাম। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সহর অবস্থিত। এই সহরের পার্শ্ব দিয়া সুবর্ণমুখী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। আমরা গো-শকটে নদী পার হইলাম, জল অধিক থাকিলে নৌকা ব্যবহৃত হয়। এই রামেশ্বরের পথে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে এস্থানে তাঁহার বায়ু-মূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরটী অনেক কালের পুরাতন। ইহার গো-পুরম্ বা প্রধান প্রবেশপথ অতি বৃহৎ ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। এই বিশালত্ব ও কারুকার্য্য দাক্ষিণাত্যের মন্দির সমূহের এক বিশেষত্ব। মন্দির মধ্যে চতুষ্কোণাকৃতি শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তর বড়ই অন্ধকারে আবৃত; কারণ কোনও দিকে বায়ু বা আলোক

প্রবেশের পথ নাই। মন্দিরের চতুর্দ্দিকেই দীপ জ্বলিতেছে। মূর্ত্তির উপরিভাগে এক দীপালোক রহিয়াছে। উহার এক বিশেষত্ব এই যে, উহা সর্ব্বদাই বায়ুভরে দুলিতেছে। অপর আলোকগুলি আদৌ নড়িতেছে না। এই জন্য এই মূর্ত্তি বায়ু মূর্ত্তি নামে অভিহিত। দেব মূর্ত্তির সন্নিকটে এক ব্যাধ মূর্ত্তি বিদ্যমান। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, কন্নাপমম্ নামক জনৈক ব্যাধ প্রত্যহ আহার্য্য দ্রব্য মহাদেবকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত। এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে পর, ব্যাধের মনে ধারণা হইল যে মহাদেব এক চক্ষু হীন হইয়াছেন। তখন সে নিজের এক চক্ষু উৎপাটন করিয়া মহাদেবের চক্ষুতে বসাইয়া দিল। কিছুকাল পরে পুনরায় তাহার মনে হইল যে, হরের দ্বিতীয় চক্ষুটীও নষ্ট হইয়াছে। তখন সে মহাদেবের দ্বিতীয় চক্ষুঃস্থানে নিজপদ স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটন করতঃ মহাদেবের চক্ষুঃস্থলে বসাইয়া দিল। অদ্যাপি ভক্তগণ হরের চক্ষুতে ভক্ত ব্যাধের পদচিহ্ন দেখিতে পান। এখানকার দেবীর নাম জ্ঞানপ্রসন্না; অপর এক দেবী আছেন, তাঁহার নাম দুর্গা। মন্দিরপ্রবেশপথে নাগ ও হস্তীর মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের সম্বন্ধে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। এক নাগ ও এক হস্তী উভয়েরই মহেশ্বরের তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। নাগ মহেশ্বর-মস্তকে নিজ মনি স্থাপন করিয়া ও হস্তী নদীজল শুণ্ড দ্বারা সেচন করিয়া তাঁহার পূজা করিত। একদিবস

হস্তীর শুণ্ড-জল দৈবাৎ নাগের গাত্রে লাগায়, নাগ হস্তীকে দংশন করে। তীব্র বিষজ্বালায় অস্থির হইয়া হস্তীও নাগকে এক ভীষণ পদাঘাত করে। তাহাতে নাগের মৃত্যু হইল; হস্তীও সর্পবিষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাদেব উভয়ের পূজায় সন্তুষ্ট ছিলেন; সে কারণে তিনি উভয়কেই পুনর্জীবিত করেন এবং তাহাদের নামানুসারে এই স্থানের নাম কালহস্তী বা নাগহস্তী রাখিলেন।

এখানে আর একটী শিবমন্দির আছে। তথায় বিগ্রহ মণিকুণ্ডেশ্বর স্বামী নামে অভিহিত। এখানকার হিন্দু অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, এই স্থানে মহাদেব মুমুর্ষু ব্যক্তিগণের কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন।

এখানে চতুর্মুখ ব্রহ্মার এক মন্দির আছে। ইহার নিকটেই এক পর্ব্বতোপরি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম আছে। প্রত্যহ তথায় মুনিবরের পূজাদি হইয়া থাকে। পর্ব্বতের পাদদেশে একটি সুন্দর ও সুবৃহৎ জলাশয় রহিয়াছে; উহার ঘাট সকল প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত।

স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ এই তীর্থকে কাশী সদৃশ জ্ঞান করেন। কথিত আছে ব্রহ্মা এই স্থানে তপস্যার্থ কৈলাস পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ আনয়ন করেন; তদবধি ইহা দক্ষিণ কৈলাস নামে বিখ্যাত।

এখান হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে বিয়ালিঙ্গকোণা নামক পর্ব্বতে সহস্রলিঙ্গ মহাদেব আছেন।

শিবরাত্রির সময় কালহস্তীদেবের উৎসব মহাসমারোহে

সাধিত হয়; তৎকালে তাঁহার ভোগমূর্ত্তি শোভাযাত্রার সহিত নগরে বাহির করা হয়। ঐ বিগ্রহের গাত্র বহুমূল্য অলঙ্কারে সুশোভিত। শুনিলাম পূর্ব্বে উক্ত বিগ্রহের আরও অনেক মণিমুক্তা ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই অপহৃত হইয়াছে।

কালহস্তী ষ্টেশনের ৫।৬টি ক্ষুদ্র ষ্টেশনের পর তিরুপতি নামক স্থানে তিরুপতি বালাজীকে দর্শন করিতে যাইলাম। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া এক পর্ব্বত পাদ-দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে এক মাইল পথ পর্ব্বতা-রোহণ পূর্ব্বক তবে দেব মন্দির পাওয়া যায়। ছয়টি পর্ব্বত শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া শ্রীব্যঙ্কট-রমণাচলম্ বা শেষাচলম্ নামক সপ্তম শৃঙ্গে দেব মন্দির অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের সন্নিকটে কয়েকটি ছত্রবাটি রহিয়াছে। এস্থানে কারুকার্য্যময় এক সহস্রস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ আছে। যে পর্ব্বতোপরি এই মন্দির, মণ্ডপ, ছত্রবাটি ইত্যাদি বিদ্যমান তাহার অভ্যন্তরস্থান প্রায় সাত মাইল হইবে। এই পর্ব্বতের গাত্রে কপিলতীর্থ নামে এক মনোরম জলপ্রপাত বর্ত্তমান। পর্ব্বতে উঠিতে দাণ্ডি বা অপর কোন যান পাওয়া যায় না।

পুরাকালে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এস্থানে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। পরে দ্বাপরে পাণ্ডবগণও বন-বাসকালে এক বৎসর এখানে থাকেন। জ্ঞানাবতার শ্রীশঙ্কর যখন এস্থানে আগমন করেন, তখন অত্রত্য জনসাধারণ এই

মন্দির শিবমন্দির বলিয়া জানিত। পরে রামানুজাচার্য্য এস্থানে আসিয়া বলেন, এই মন্দির শিবমন্দির নহে, ইহা বিষ্ণুমন্দির। তখন আচার্য্যেব সহিত পাণ্ডাগণেব ঘোর তর্ক বিবাদ আরম্ভ হইল। অতঃপর যখন তর্ক বিবাদ কোন প্রকারেই মীমাংসিত হইল না, তখন বামানুজাচার্য্য বলেন যে, অদ্য মন্দিরদ্বার রুদ্ধ থাকুক, কল্য যে মূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে, সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা হইবে। স্থানীয কিংবদন্তী এই যে, রামানুজাচার্য্য মন্দিরের জল যে স্থান দিযা নির্গত হয সেই স্থান দিযা অণিমাসিদ্ধিযোগে মক্ষিকারূপধাবণকরতঃ মন্দিবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিগ্রহকে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তিতে পবিণত করেন। তদবধি ইহা বৈষ্ণবগণের এক প্রধান তীর্থ হইল।

এস্থান পরিত্যাগ করিযা আমবা বেলযোগে গুডুর জংশনে আসিলাম। পবে গাড়ী বদল করিয়া ও মেল লাইন ধরিয়া পবদিবস প্রাতে মাদ্রাজে উপনীত হইলাম।

এই মাদ্রাজ সহর কলিকাতা ও বোম্বের ন্যায় একটি ঐশ্বর্য্য-শালী নগব। এই নগরে অনেকগুলি ষ্টেশন আছে—(১) ওয়সারমানপেট্, (২) রায়পুরাম্, (৩) বিচ্, (৪) এগমোর, (৫) সেণ্ট্রাল বা মধ্য ষ্টেশন। সহরের ভিতর দিয়াই রেলগাড়ী চলিতেছে। এই মহানগরী সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। সমুদ্রের ধারে এক প্রশস্ত পথ আছে; তথায় ধীবরগণ সামুদ্রিক মৎস্য সকল ধরিয়া আনিতেছে। পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের সম্মুখভাগে মাদ্রাজের বন্দর সমুদ্র

বেষ্টন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা একটি দর্শনযোগ্য স্থান। এই মাদ্রাজ সহরে এরূপ কোনও বড় নদী নাই, যাহার সাহায্যে বাণিজ্য দ্রব্যাদি সহরের মধ্য দিয়া আনীত বা সহর হইতে স্থানান্তরিত হইতে পারে; সুতরাং কতকগুলি ছোট ছোট খাল সমুদ্র তীর হইতে কাটিয়া সহরের ভিতর আনা হইয়াছে। এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। পথ সকল সুবিস্তৃত ও সুপরিষ্কৃত। বৃষ্টি হইলে পথে বেশী কাদা হয় না। এখানে শীতকালেই প্রায় বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। এখানকার প্রত্যেক প্রশস্ত পথে ইলেক্‌ট্রিক ট্রামগাড়ী চলিতেছে। এখানে ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ্জ (St. George) নামক ইংরাজ বাহাদুরের এক দুর্গ আছে। দুর্গের অনতিদূরেই লাটভবন বিদ্যমান। পিপিল্‌স পার্ক নামক এক বৃহৎ উদ্যান আছে; উহাতে শতাধিক কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মিত রহিয়াছে। উদ্যানটি দেখিতে অনেকাংশে কলিকাতাস্থ ইডেন উদ্যানের ন্যায় হইবে। এখানে যে যাদুঘর আছে, তাহাতে কলিকাতার মত অনেক প্রকার মৃত পশুপক্ষী ও নানাদেশের নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দুর্গের পশ্চিমদেশে সুন্দর পাচ্চাপার কলেজ ভবন; এই বিদ্যালয় উদারচেতা পাচ্চাপার মুদালিয়ার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সিনেট্‌হাউস, নূতন হাইকোর্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বোটানিকেল গার্ডেন প্রভৃতি অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। এখানে কয়েকটী মন্দির আছে; তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণের উপাসনার স্থান পার্থসারথির মন্দির ও স্মার্ত্তগণের ঈশ্বর স্বামীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা দেখিলাম।

রাত্রে মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিলাম। এগ্মোর নামক ষ্টেশন হইতে গাড়ীতে উঠিয়া ও দক্ষিনাভিমুখে গমন করিয়া আমরা ভারতপ্রসিদ্ধ কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইলাম।

এই কাঞ্চী নগরী দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) শিবকাঞ্চী, ও (২) বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে শৈবগণের ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য দৃষ্ট হইল। শিবকাঞ্চীতে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির ক্ষিতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এস্থানে দেবাদি দর্শন পূর্ব্বক এস্থান হইতে বহির্গত হইলাম। অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় এখানে আছে। ইহা সপ্তমোক্ষপ্রদ তীর্থের অন্যতম। এই তীর্থের সবিশেষ বিবরণ পঞ্চম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর আমরা চিদম্বরমে উপনীত হইলাম। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রায় দেড় মাইল পথ হইবে। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির ব্যোমমূর্ত্তি অবস্থিত আছে। আকাশরূপী মহাদেবের মন্দিরে অন্য কোন মূর্ত্তি নাই। এই চিদম্বরম্ মূর্ত্তি মানবচক্ষুর অগোচর, ইহাকে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে হইবে। মন্দির সম্মুখে এক পর্দ্দা আছে; সেই পর্দ্দায় আকাশলিঙ্গ এই কয়টি অক্ষর লিখিত আছে। পর্দ্দা সরাইলে কেবলমাত্র প্রাচীর দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। এই মন্দির অতিবৃহৎ এবং বহুকালের পুরাতন। এরূপ কারুকার্য্যময় মন্দির এই দাক্ষিণাত্যের জনপদেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্দির মধ্যে চারিটি সুবৃহৎ মণ্ডপ আছে—(১) চিৎ-সভা, (২) কনক-সভা, (৩) দেব-সভা (৪) নৃত্য-সভা। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, স্বয়ং ব্রহ্মা এই মন্দির

নির্ম্মাণ করেন। এখানে নটেশ্বর মহাদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে। এই মন্দিরের চূড়া স্বুবর্ণপাত দ্বারা বিমণ্ডিত। 'সম্মুখের মণ্ডপটী রৌপ্যপাত দ্বারা আচ্ছাদিত। এই মহাদেবের সম্বন্ধে এক পৌরানিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। একদা দুর্গার সহিত মহাদেব একপদে নৃত্য করেন ও অবশেষে সেই নৃত্যে দেবী পরাজিতা হন। তদবধি তিনি নটরাজরাজ নামে অভিহিত হন। বিগ্রহের মূর্ত্তি মনুষ্যের ন্যায় গঠিত; মহাদেব একপদ ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন।

এখানে অপর একটি মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর শেষশায়ী মূর্ত্তি দেখিলাম। এখানকার বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল প্রধান মূল মন্দিরে কোনও বিগ্রহ বিদ্যমান নাই। এখানে যাঁহারা পূজা ও বেদপাঠ করেন তাঁহারা দীক্ষিত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। এইরূপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা এখানে অনেক।

চিদম্বরম্ হইতে প্রায় ২৪ মাইল রেলযোগে আসিয়া আমরা মায়াভরমে উপস্থিত হইলাম।

এই সহর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। এস্থানে এক শিবমন্দির আছে; তন্মধ্যে ময়ূরস্বামী নামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান। অপর এক মন্দিরে অভয়াম্বা দেবী রহিয়াছে। ময়ুর স্বামীর মন্দির অতি বৃহৎ। শুনিলাম প্রত্যহ প্রায় দেড়মণ তণ্ডুলের অন্নে মহাদেবের ভোগ হইয়া থাকে। বিগ্রহের বহুবিধ মনিমুক্তার অলঙ্কার আছে। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস।

তাঁহাদিগের উদ্যমে ৪।৫টি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নটকোটার শেঠেরাও ২।৩টি দানছত্র করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর উপকার করিয়াছেন। এখান হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে পেরুমল রঙ্গনাথের বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির। শ্রীহরি অনন্ত শয্যায় শায়িত আছেন। এই বিগ্রহ "অন্তরঙ্গম্" নামে অভিহিত। ত্রিচিনাপল্লীস্থ শ্রীরঙ্গমূর্ত্তি "আদিরঙ্গম্" নামে ও কুম্ভকোণমে "মধ্যরঙ্গম্" নামে যথাক্রমে অভিহিত হয়। এই তিন মূর্ত্তিই শেষ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। অন্য এক মন্দিরে পেরুমল নায়িকা নাম্নী এক দেবী বিরাজমানা।

পরে আমরা কাবেরী নদীতে স্নান করিতে যাইলাম। ইহা গঙ্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া। যেমন গঙ্গার তীরে স্থানে স্থানে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে, যাহাকে কুম্ভমেলা কহে, সেইরূপ তুলা রাশিতে বৃহস্পতি গমণ করিলে এই মায়াভরম্ নগরে কাবেরীর ঘাটে পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই যোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও কথিত আছে,

"মেষে চ গঙ্গা বৃষভে চ নর্ম্মদা
যুগ্মে চ বাণী যমুনা কুলীরে।
গোদাবরী সিংহগতে চ কৃষ্ণা
কন্যাগতে জীব ইতি ক্রমেণ॥
কাবেরী তৌল্যামলিতাম্রপর্ণী
ভীমাখ্যনন্থামিতি চাপ পুষ্কর।

মৃগে চ ভদ্রা ঘট সিন্ধুনন্দ্যাম্
বাচস্পতৌ মীনগতে পিনাকিণী ॥”

বৃহস্পতি মেষরাশিতে গমন করিলে গঙ্গায়, বৃষরাশিতে নর্ম্মদায়, মিথুনে সরস্বতীতে, কর্কটরাশিতে যমুনায়, সিংহগত হইলে গোদাবরীতে, কন্যাগত হইলে কৃষ্ণায়, তুলায় গমন করিলে কাবেরীতে, বৃশ্চিকস্থ হইলে তাম্রপর্ণীতে, ধনুরাশিতে থাকিলে ভীমানদীতে, মকর গত হইলে তুঙ্গভদ্রায়, কুম্ভে যাইলে সিন্ধু নদীতে, এবং মীনরাশিতে পিনকিনী নদীতে পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে।

এই কাবেরা নদীর উভয় তীরে শস্যশ্যামল ক্ষেত্রসকল রহিয়াছে। উভয় পার্শ্বেই হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা খর্জ্জুর ও নারিকেল কুঞ্জ, কোথায়ও বা ফলভরে আনত কদলী বৃক্ষ সমুহ প্রকৃতির শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দয্য সন্দর্শনে মনোমধ্যে বঙ্গদেশের কথা স্বতঃই উদিত হইতে লাগিল। নদীতে অবগাহনস্নান সমাপনপূর্ব্বক দেবদর্শনে যাইলাম। দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া আমরা তত্রত্য এক ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। সেখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকে থাকিতে দিবে না। এই রামেশ্বরপথে সকল স্থানেই দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরগণের মধ্যে জাতীয়তা লইয়া আদৌ সদ্ভাব নাই। ব্রাহ্মণগণ নিরামিষাশী। তাহারা মৎস্য মাংসাদি স্পর্শ করে না, ভোজন করা ত দূরের কথা। আমার ব্রাহ্মণ-বন্ধু ভোজনকালে মৎস্যের নাম উল্লেখ করায়

সে স্থানের ব্রাহ্মণগণ বড়ই অসন্তুষ্ট হইল দেখিলাম। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণবর্গ মৎস্যাদি ভক্ষণ করে শুনিয়া তাহারা অতিশয় বিস্মিত হইল। এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমি বন্ধুকে বলিলাম, "ভাই, আর কোথায়ও যেন মৎস্য মাংসের নাম মুখে আনিও না।" উক্ত ধর্ম্মশালায় নিশাযাপন করিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে মায়াভরম্ পবিত্যাগ করিলাম।

বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা ত্রিচিনাপল্লীতে আসিলাম। ষ্টেশন হইতে শ্রীরঙ্গদেবেব মন্দির প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আমবা এক অশ্বযান করিযা সহরের অন্তরে প্রবেশ করিলাম। পথে আসিতে আসিতে অদূরে পর্ব্বত শ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। এক পর্ব্বতশিখরে গণেশদেবের শ্বেতবর্ণের মন্দির দেখিলাম। কিয়দ্দূব আসিলে আমাদের অশ্বযান কাবেরী নদীব সেতুর উপর আসিল ; এই নদী অতিক্রম করিয়া আমরা শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরের সুবৃহৎ গোপুরম্ বা প্রধান প্রবেশদ্বারপথে উপনীত হইলাম। তথায় এক বাসা ঠিক করিলাম। স্নানাদি সমপনান্তে আমরা দেবদর্শন করিতে চলিলাম। শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরের কি সুবৃহৎ গোপুরম্! এই মন্দিরে সর্ব্বসমেত সাতটী প্রাকার অতিক্রমপূর্ব্বক মূলমন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। ইহারই মধ্যে অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, হাট, বাজার, বসত বাড়ী ইত্যাদি রহিয়াছে। হিন্দুভিন্ন অপর কোন জাতীয় লোক চতুর্থদ্বার অতিক্রম করিতে পারে না। মন্দিরটীর চতুর্দ্দিকের সীমানা লইয়া প্রায় এক মাইলের উপর হইবে। এই মন্দিরের চারি ধারে

১৫ গোপুরম্ আছে। এরূপ বৃহৎ মন্দির ভারতে আর নাই। মূল মন্দির ছোট হইলেও তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সপ্তম দ্বারের পর শ্রীরঙ্গদেবের মূল মন্দির। প্রাচীরে শেষপর্যঙ্কে ভগবান্ শ্রীরঙ্গনাথ শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার নিম্নে ও এক সুন্দর সিংহাসনে ভগবানের নানালঙ্কার ভূষিত বিগ্রহ বিরাজমান। ইহা তাঁহার ভোগমূর্ত্তি। দেবতার গাত্রে বহুমূল্য হীরক, নানাবর্ণের পান্নাচুনিনির্ম্মিত অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে গরুড় মূর্ত্তি অবস্থাপিত। তিনি যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভগবানের স্তুতি করিতেছেন। মন্দিরের পুরোভাগে এক সুবর্ণময় তাল বৃক্ষ দেখিলাম। তথায় অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণেরও মূর্ত্তিদ্বয় তথায় আছে। এই মন্দিরমধ্যে এক পুষ্করিণী ও তাহার তীরে এক প্রাচীন ও প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান। শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরটী এত বড় যে সারাদিন উহা দেখিলেও সকল স্থান সবিশেষ দেখা হয় না। এই অদ্ভুত মন্দির দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। পুরাকালে হিন্দু নরপতিগণ ও ধনকুবেরগণ তাঁহাদের প্রায় সমুদয় অর্থ এই সকল মন্দিরনির্ম্মাণে ব্যয় করিতেন। যাহাদের অর্থে ও উদ্যোগে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। শ্রীরঙ্গনাথদেবকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার পূজার্চ্চনা করিয়া আমরা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তথায় আহারাদি সমাপনান্তে অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া জম্বুকেশ্বর দর্শন করিতে যাইলাম।

এই জম্বুকেশ্বরের মন্দির শ্রীরঙ্গদেবের মন্দিরের অতি সন্নিকটে —অর্দ্ধ মাইল মাত্র দূরে—অবস্থিত। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অপ্‌মূর্ত্তি রহিযাছে। মূল মন্দিরের প্রবেশপথের নিকটেই এক ক্ষুদ্র কূপ হইতে সর্ব্বদাই অল্পপরিমাণে জল উঠিতেছে। মন্দিরমধ্যে যে স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সে স্থান ও মন্দিরেব মেজে জলমগ্ন দেখিলাম। এখানে আপনা আপনিই জল উঠিতেছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিগণেব ধ্রুব বিশ্বাস যে, ভগবান্ জলরূপী হইয়া এখানে প্রবাহিত হইতেছেন। আমবা জম্বুকেশ্ববেব মহাদেবকে দর্শন করিয়া পূজারি ব্রাহ্মণবর্গকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিলাম। মন্দির পার্শ্বে এক জম্বু বৃক্ষ দেখিলাম। ইহাবই তলদেশে বসিয়া মহেশ্বব তপস্যা কবিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাব নাম জম্বুকেশ্বর হইল। এই মন্দিব যদিও শ্রীবঙ্গদেবের মন্দিবের ন্যায় সুবৃহৎ নহে, তথাপি ইহার গঠণপ্রণালী অতি উত্তম। ইহার চারিটী উচ্চ প্রাকাব আছে; তন্মধ্যে এক পুষ্করিণী ও এক নারিকেল বৃক্ষের উদ্যান আছে। প্রাঙ্গনমধ্যে এক সহস্রস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ বিদ্যমান। জম্বুকেশ্বরের ও শ্রীরঙ্গজীর মন্দিবদ্বয় দেখিযা বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়। এই সকল মন্দিব নির্ম্মাণ করিতে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে ও কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দাক্ষিণাত্যের পথে, প্রায় সকল স্থানেই, দেখিলাম পাণ্ডাগণ যাত্রিবর্গকে যথেষ্ট যত্ন করে। যাত্রিগণ স্ব-ইচ্ছায় তাহাদিগকে যাহা দেয় তাহা লইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট।

এই জম্বুকেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে কয়েকটী শীলমোহর কৃত বাক্স আছে। তাহাতে যাত্রিগণ যাহার যাহা ইচ্ছা দান করিয়া থাকে। উক্ত অর্থ পূজায় ব্যয়িত হয়। আরও অপরাপর দর্শনীয় স্থান সমূহ দর্শন করিয়া আমরা জম্বুকেশ্বর পরিত্যাগ করিলাম।

সন্ধ্যাকালে আমরা ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট ষ্টেশনে আসিলাম। ত্রিচিনাপল্লীর অপর এক নাম ত্রিশিরাপল্লী। পুরাকালে এই নগর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং ত্রিশিরা নামে এক রাক্ষস এখানে বাস করিত। তাহার ভয়ে কেহ তথায় যাইতে সাহস করিত না। পরে জনৈক বীরপুরুষ উক্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া এই নগরীর নাম ত্রিশিরাপল্লী রাখেন। এক্ষণে সেই ত্রিশিরাপল্লী ত্রিচিনা-পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

রাত্র ৯ ঘটিকায় রেলগাড়ী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল। আমরা শ্রীহরি স্মরণ করিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। সারা নিশা ট্রেণে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে মেডুরায় আসিলাম। এস্থানে গাড়ী হইতে অবতরণ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে উহা দর্শন করিব স্থির করিলাম। মেড়ুরা অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ৯ টার সময় মাণ্ডাপামে আসিলাম। এখান হইতে রেলগাড়ীর নাম সিলোন বোট্ মেল (Ceylon boat mail) মাণ্ডাপাম হইতে রেলগাড়ী সরকার বাহাদুর নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া চলিতেছে। সেতুর উভয় পার্শ্বেই সমুদ্র। চতুর্দ্দিকেই জলরাশি। অনন্ত আকাশের সহিত অনন্ত জলরাশি যেন মিশিয়া গিয়াছে।

স্থানে স্থানে অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের অদ্ভুত কীর্ত্তি, সেতুর বিশ্লিষ্ট বিভাগ, বিদ্যমান রহিয়াছে; কোন স্থান জলের উপর জাগিয়া আছে এবং কোন স্থান বা জলমগ্ন অবস্থায় আছে। এই লবণাক্ত সমুদ্রজলের স্থানে স্থানে মিষ্ট জল আছে। সে স্থান হইতে নৌকাসাহায্যে জল তুলিতেছে দেখিলাম। অতঃপর আমরা পাম্বাম্ ও আর একটী ষ্টেশন অতিক্রম পূর্ব্বক ৺ রামেশ্বরধামে উপনীত হইলাম। ইহার পর আর একটী মাত্র ষ্টেশন আছে, তাহার নাম ধনুষ্কোটী পিয়ার। এইখানে ভারতের লৌহবর্ত্ম শেষ হইয়াছে। মাণ্ডাপাম্ হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক শোভা কি মনোমুগ্ধকর! ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রকৃতির এরূপ অপরূপ রূপ কদাচ দৃষ্টিগোচর হইল। উভয়দিকে অনন্ত বারিধিরাশি এবং তাহার উপর দিয়া রেলগাড়ী চলিতেছে। এই দৃশ্যই কি চমৎকার! বেলা প্রায় ৯টায় আমরা রামেশ্বর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ষ্টেশনের প্লাটফরম্ হইতে ৺রামেশ্বর দেবের মন্দির চূড়া দেখা যাইতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া এক মাঠ পাইলাম। ঐ মাঠ অতিক্রম করিয়া এক বড় রাস্তায় উঠিলাম। এই পথ বরাবর শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে।

রামেশ্বর-ধাম।

শ্রীমন্দির সন্নিকটে আমাদের জন্য পাণ্ডা এক সুন্দর বাসা ঠিক করিয়া দিল। বাসাটীর চতুঃপার্শ্বে উদ্যান আছে। তথায় দ্রব্যাদি স্থাপনপূর্ব্বক ধুলাপায়ে দেব দর্শন করিতে যাইলাম। সঙ্গে কেদার বদ্রীর পথে কর্ণ-প্রয়াগ হইতে আনীত গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরীর জল লইলাম। প্রথমে মন্দিরের গোপুরম্ বা সিংহদ্বারের নিকটে আসিয়া রামেশ্বর দেবের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তৎপরে অনেক স্থল পর্য্যটন করিয়া মূল-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। নাট মন্দির হইতে ঠাকুর দর্শন করিতে হয়। যে গৃহে রামেশ্বরদেব আছেন তথায় পুজারি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি, ব্রাহ্মণই হউন, আর ব্রাহ্মণেতরই হউন, প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যাত্রিগণ গঙ্গোদক, বিল্বপত্র, পূজার খরচ ইত্যাদি পুরোহিতহস্তে প্রদান করিলে, পুরোহিত তাহাদের উদ্দেশে পূজা করিয়া থাকেন। রামেশ্বরদেবের পূজার প্রধান অঙ্গ গঙ্গাজল; শুনিলাম এই পূতবারি বারাণসী হইতে পদব্রজে আনীত হয়। যে পাত্রে আমি গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরীর জল আনয়ন করিয়াছিলাম সেই পাত্র ও পূজার উপকরণাদি পুরোহিত হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি আমাদের সমক্ষে রামেশ্বরদেবকে উক্ত জলে স্নান করাইলেন। উক্ত বারি মহাদেবের মস্তকে সেচন করিতে পুরোহিত আমার নিকট ২৲ দুই টাকা লইলেন

এবং ঐ জলপাত্র ফেরৎ লইতে আরও ২৲ দুই টাকা দিতে হইবে বলিলেন, নচেৎ উহা রামেশ্বরদেবের সম্পত্তি হইয়া যাইবে। আমি উহা রামেশ্বরদেবের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। প্রভুর মস্তকে মৎকর্ত্তৃক আনীত সেই সুদূর পার্ব্বত্যপথের গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরীর জলসেচন সন্দর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলাম। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, আজ আমার সার্থক হইল। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে এই সকল সুকৃতি হইয়া থাকে। ভগবদ্দর্শনে ভক্ত যাত্রিগণের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। তৎকালে সংসারের দুঃখদৈন্য দূরীভূত হয়। আমরা দেবদর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পাণ্ডা আমাদের জন্য প্রসাদ লইয়া আসিল। তারপর আমরা সমুদ্রে স্নান করিতে যাইলাম। সমুদ্রের আবাহন, নমস্কার ও অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক সমুদ্রে স্নান করিলাম। এখানে স্নানান্তে যাত্রিবর্গকে দেব-তর্পণ, ঋষি-তর্পণ ও পিতৃ-তর্পণ করিতে হয়। এখানে একখণ্ড শিলা স্থাপন করিতে হয়। শিলা স্থাপন না করিলে কোন ফললাভ হয় না। সমুদ্র স্নানকালে পাণ্ডাগণ যাত্রিগণকে নিম্নলিখিত এই মন্ত্র পাঠ করায়,—

“বেদাদির্য্যো বেদ বশিষ্ঠঃ যোনিঃ
সরিৎপতিঃ সাগর রত্নযোনিঃ।
অগ্নিশ্চ তে তেজ ইলা চ তেজো
রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভি॥”

হে সমুদ্র! তুমি বেদেরও পুরাতন, তোমা হইতেই বেদ ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সমুদয় সরিৎগণের পতি ও সকল

বস্ত্রের আকর। অগ্নি ও পৃথিবী তোমার তেজ ধারণ করে। বিষ্ণু হইতেই তুমি শক্তিলাভ করিয়াছ। তুমি অমৃতের নাভি স্বরূপ।

সমুদ্রজলে স্নান করিয়া সর্ব্বশরীর বালুকাময় হইয়া গেল। সর্ব্বশরীরে এত অধিক বালুকা সংলগ্ন হইল যে, পুনরায় বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া স্নান করিতে হইল। স্নানান্তে রামেশ্বর দেবের প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। প্রসাদে অন্নভোগ ও তৎসঙ্গে কয়েকটী বাদাম ও নারিকেলখণ্ড মিশ্রিত রহিয়াছে দেখিলাম।

আজ শারদীয়া মহাপূজার বিজয়া দশমী। বৈকালে রামেশ্বরদেবের ও রামেশ্বরী দেবীর শোভাযাত্রা বহির্গত হইল। সেই সময় নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। শোভাযাত্রাকালে সুবর্ণ সিংহ, রৌপ্য হস্তী প্রভৃতি শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। জনতা, কোলাহল, সুমধুর বাদ্যধ্বনি ও বিবিধ শোভা যাত্রার দ্রব্যে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য সমুৎপন্ন হইল। আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়া উক্ত শোভাযাত্রা যাইতেছিল। আমার বন্ধু উহাদের সহিত অল্পপথ গমন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিল।

রামেশ্বর ও রামেশ্বরীর নিত্য পূজা ব্যতীত সময়ে সময়ে মহাসমারোহে উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে বসন্তোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে প্রতিষ্ঠা উৎসব, আষাঢ়ে রামেশ্বরী দেবীর ধ্বজোৎসব, শ্রাবণ মাসে পঞ্চ দিবস ব্যাপিয়া বিবাহোৎসব, আশ্বিনে শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ হইতে

দশমী অবধি নবরাত্রোৎসব, কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ব্রহ্মোৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে দেবীর দ্বিতীয় ধ্বজোৎসব এবং লক্ষ দীপোৎসব ও শিবচতুর্দ্দশীতে মহাসমারোহে শিবরাত্রোৎসব হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসে মহাভিষেকোৎসব হয়।

সন্ধ্যার পর আমরা রামেশ্বর দেবের আরতি দেখিতে যাইলাম। গোপুরমের উপর এক প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছে দেখিলাম। নাটমন্দির হইতে প্রভুর আরতি দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম। প্রভু রামেশ্বরের আসল লিঙ্গমূর্ত্তি ডেকের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। পূজার সময় ঐ মূর্ত্তি ডেক হইতে পুরোহিত বহির্গত করেন। যখন ডেক দ্বারা আবৃত থাকে, তখন ডেকের উপর মুখ ও সর্পফণা বিরাজ করে। নাটমন্দিরে এক স্বুবর্ণময় তালবৃক্ষ রহিয়াছে। উহার দক্ষিণ দিকে অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও হনুমানের মূর্ত্তিত্রয় স্থাপিত আছে। সেস্থানে আর একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে, তাহা সুগ্রীবের। যেখানে রামেশ্বরদেব আছেন, তথায় প্রায় তিনহস্ত লম্বা ও দুই হস্ত চওড়া এক কারুকার্য্য বিশিষ্ট স্বর্ণমণ্ডিত বেদী রহিয়াছে। ঐ বেদীর উপর অর্দ্ধহস্ত পরিমিত মুখ ও সর্পফণা দৃষ্ট হইতেছে। এই রামেশ্বরদেব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্ত্তির অন্যতম। শিব পুরাণে উক্ত আছে,—

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমরেশ্বরম্,
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্

বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে,
সেতুবন্ধে চ রামেশং নাগেশং দারুকাবনে,
হিমালয়ে তু কেদারং ঘীশ্চেশঞ্চ শিবালয়ে,
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ
সর্ব্বপাপৈর্বিমুক্তো হি অন্তে যাতি পরাং গতিম্॥

এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেবের নাম মানব সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে স্মরণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্ত কালে শ্রেষ্ঠ ধামে গমন করে।

এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে দু'তিনটি এরূপ দুর্গম স্থানে আছে, যে তথায় সচরাচর কেহ যাইতে সমর্থ হয় না।

'রামেশ্বরদেবকে দর্শন করিয়া আমরা রামেশ্বরী দেবীর দর্শনার্থ গমন করিলাম। ইহার স্বতন্ত্র মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে মা জগদম্বার মণিময় মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। দেবীর কি অপরূপ শোভা! মনে হইল যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বিরাজমানা। দেব-দেবীর দর্শন লাভ করিয়া মনোমধ্যে অপার আনন্দ পাইলাম। তারপর বাসায় যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

পরদিন রামেশ্বর-ধামে দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ ও তীর্থাদি দর্শন করিবার মনস্থ করিলাম।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা ধনুষ্কোটি তীর্থে গমন করিলান। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রামেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে যাইলাম। রামে-শ্বরের মন্দিরদ্বার অল্প বেলা হইলে উদ্ঘাটিত হয়। দেব-

দর্শনের বিলম্ব দেখিয়া আমরা শ্রীমন্দির ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম্।

গোপুরমের ভিতর উভয় পার্শ্বে কার্ত্তিক ও গণেশের মূর্ত্তিদ্বয় অবস্থাপিত আছে। এই গোপুরম্ হইতে এক প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত সুন্দর পথ বরাবর শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। পথের দক্ষিণ পার্শ্বে এক পুষ্করিণী দেখিলাম। উহার নাম মাধবকুণ্ড। এই পথের দুই ধারেই অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় সুদৃশ্য স্তম্ভ শ্রেণীর উপর ছাদ দণ্ডায়মান আছে। উহা যে স্থানে শেষ হইয়াছে, তথা হইতে দুইটি পথ মন্দিরের দিকে গিয়াছে। সেই পথের সংযোগস্থলে সিদ্ধিদাতা গণেশের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি রহিয়াছে। সিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রণাম করিয়া চলিতে লাগিলাম। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক স্তম্ভেই নানা দেবদেবীর ও রাজগণের মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। তারপর আর একটি পুষ্করিণী পাইলাম। উহার নাম শিবকুণ্ড। ইহাও এক তীর্থ বিশেষ। মূল মন্দিরের সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৃষভ রহিয়াছে। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বেই উচ্চ স্তম্ভ শ্রেণী ও সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ। রামেশ্বর দেবের মন্দির যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এ স্থানে আগমন পূর্ব্বক এক মঠ স্থাপনা করেন। তাহার নাম শৃঙ্গগিরি মঠ। মন্দির পার্শ্বে এক স্থানে গঙ্গোদক বিক্রীত হইতেছে। অতি ক্ষুদ্র এক শিশি জলের মূল্য এক টাকা বলিল। বড় এক শিশির মূল্য ৪৲।৫৲ টাকা হইবে। রামেশ্বর দেবের মন্দিরটি প্রায় অর্দ্ধ মাইল বা ততোধিক স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান।

মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা দেবদর্শন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

পরে রেলযোগে ধনুষ্কোটি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ইহা রামেশ্বর হইতে প্রায় ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথ পদব্রজে অতিক্রম করা বড় কষ্টকর; কারণ পথ বড়ই দুর্গম ও বালুকাময় এবং পথের উভয় পার্শ্বেই সমুদ্র। মধ্যস্থলে বালুকাময় ভূভাগ, তাহার অনেক অংশই জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায়।

ধনুষ্কোটী এক ক্ষুদ্র ষ্টেশন; এখানে কয়েকখানি কুঠীর যাত্রিগণের জন্য নির্ম্মিত আছে। তথা হইতে সংগমস্থল প্রায় ২ মাইল হইবে। আমরা গোশকটে ষ্টেশন হইতে সংগমস্থলে উপনীত হইলাম। প্রথমে আমার বন্ধু পদব্রজে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্তু উক্ত বালুকাময় পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া গোযানে আরোহন করিতে বাধ্য হন। সংগমস্থলে পঁহুছিয়া আমরা স্নানাদি সমাপন করিলাম। এখানে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে বিহিত নাই তৎসমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভারতপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের নিদ্রিত পঞ্চপুত্রকে হত্যা করিলে সুপ্তমারণ নামক পাপে লিপ্ত হন। সে পাপ কোন তীর্থে বিনষ্ট হইল না। পরে মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশে তিনি এই ধনুষ্কোটী তীর্থে আসিয়া স্নানদানকরতঃ সুপ্তমারণ পাপ হইতে বিমুক্ত হন। রামায়ণে কথিত আছে,

যখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যার পথে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন সাগর মূর্ত্তিমান হইয়া রঘুনন্দনের নিকট প্রার্থনা করেন, "প্রভো, আপনার কার্য্য শেষ হইল, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার বন্ধন মোচন করুন, নচেৎ শৃগাল, কুক্কুরও আমায় পদাঘাত করিয়া যাইবে।" তখন শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ ধনুষ্কোটী অর্থাৎ ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সেতুভঙ্গ করেন। তদবধি এই স্থান ধনুষ্কোটী নামে বিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন যে, যখন শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় ও সীতা উদ্ধার করিয়া এস্থানে আগমন করেন, তখন বিভীষণ রাঘবেন্দ্র রামচন্দ্রকে এই অনুরোধ করেন, "প্রভো, এই সেতুর সাহায্যে আপনার কার্য্যোদ্ধার হইল, এক্ষণে সাগরের বন্ধন ছেদন করুন।" তখন শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন। তদবধি ইহা ধনুষ্কোটী তীর্থ নামে অভিহিত। এই সেতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিতেছি। ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত ভাগ হইতে লঙ্কা দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রামেশ্বর ও মান্নার দ্বীপ লইয়া সর্ব্বসমেত ৬০ মাইল পথ। ইহার মধ্যে কিয়দংশ সেতু, কিয়দংশ দ্বীপ এবং কিয়দংশ ভগ্নসেতু। রামেশ্বর দ্বীপের পরে ১৬ মাইল ভগ্নসেতু; জোয়ারের সময় এই স্থানে জল থাকে কিন্তু ভাঁটার সময় পাথর ও বালি বাহির হইয়া পড়ে। তারপর মান্নার দ্বীপ, ইহাও সমুদ্রের অংশ। আরও ২ মাইল পরে লঙ্কা দ্বীপ। এক্ষণে এই ধনুষ্কোটী হইতে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে। তবে তথায় যাইতে হইলে

যাত্রিগণকে সাত দিন ধনুষ্কোটীতে থাকিতে হয় এবং তার পর যাইতে দেওয়া হয়। কি নিমিত্ত এই সেতু নির্ম্মিত হইল তাহার বিবরণ সকলেই প্রায় রামায়ণপাঠে অবগত আছেন। পবন-নন্দন হনুমান্ যে গন্ধমাদন পর্ব্বত আনিয়া এই সেতুনির্ম্মাণে সহায়তা করে, রামেশ্বর তীর্থ সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। সেতু নির্ম্মিত হইলে দুরাত্মা রাবণ উহা ভাঙ্গিয়া দেয়। পুনঃপুনঃ তিনবার সেতু ভঙ্গের পর শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের পরামর্শে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা কবিতে আরম্ভ করেন। সেতুর উপর যে লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাই রামেশ্বর নামে অভিহিত। মহাদেব সেতুরক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, রাবণ আর উহা ভাঙ্গিতে সাহস করিল না। তখন রঘুকুলপতি অনায়াসে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক লঙ্কেশ্বরকে নিধন করেন। সেতুমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া এই শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন। এই সেতুকে শ্বেতাঙ্গ গণ এডামস্ ব্রিজ (Adam's bridge) কহে।

ধনুষ্কোটী উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। এক দিকে ভারত-সমুদ্রের নীল সলিলরাশি পবনের সঙ্গে যেন গর্জ্জন ও লম্ফ প্রদান করিতেছে এবং অপর দিকে মান্নার উপসাগর কেমন স্থির, ধীর ও গম্ভীর। ভারত সমুদ্রের তরঙ্গ সকল বেলাভূমিতে প্রচণ্ড বেগে আঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। সে সকল দৃশ্য দেখিতে অতি চমৎকার।

অপরাহ্নে আমরা রামঝরকা দেখিতে যাইলাম। ইহা এক তীর্থস্থান। কথিত আছে যে, ভগবান্ রামচন্দ্র এই স্থানে বসিয়া সেতুর নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই তীর্থ-স্থল এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। তথায় এক দ্বিতল মন্দির আছে। তন্মধ্যে নিম্নতলস্থ মঞ্চোপরি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সংস্থাপিত আছে। এ স্থানটী বড়ই রমণীয়, পবিত্র ও শান্তিপ্রদ। আরও এক তীর্থ আছে, তাহার নাম দর্ভশয়ন। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র বরুণদেবের সাহায্য ব্যতিরেকে এই অগাধ জলরাশি উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না বলিয়া বরুণদেবের কৃপাপার্থী হইয়া দর্ভশয্যায় প্রায়োপবেশনপূর্ব্বক শয়ন করেন। প্রায়োপবেশন করিয়াও যখন তিনি বরুণদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইযা শরনিক্ষেপ করিয়া সাগরজল শুষ্ক করিতে উদ্যত হইলে, বরুণদেব মানবদেহ ধারণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলের দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ প্রদানকরতঃ অন্তর্হিত হন। যথায় শ্রীরামচন্দ্র দর্ভশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থান দর্ভশয্যা নামক পুণ্যতীর্থ। এই সকল দেখিয়া আমরা সন্ধ্যাকালে রেলযোগে রামেশ্বরমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরদিন রামেশ্বরমে অন্যান্য তীর্থসকল দর্শন করিতে যাইলাম। প্রথমে পাণ্ডা আমাদিগকে চক্রতীর্থে লইয়া যাইল। ইহাই সেতুর মূল অংশ। এখানে ধর্ম্মপুষ্করিণী নামে এক কুণ্ড আছে। কথিত আছে যে, পুরাকালে ধর্ম্ম মহাদেবের তপস্যা করিবার সময় স্নানার্থ ইহা খনন করেন। ইহার তীরে বসিয়া অহির্বুধ্ন

নামক এক ঋষি বিষ্ণুকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করেন। তখন বিষ্ণু সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলায়, অহির্বুধ্ন বলেন, "আমি কি আর চাহিব, কি আর কহিব, চাহিতে কাহকে আমার রেখেছেন কি? অদ্য আপনাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমার জন্ম সার্থক হইল।" তখন ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তকে এই স্থানে থাকিয়া উপাসনা করিতে বলেন এবং তাঁহার রক্ষার্থ সুদর্শন চক্র তথায় স্থাপিত করেন। এখানে বিষ্ণুচক্র অবস্থিত বলিয়া এই তীর্থের নাম চক্রতীর্থ। ইহার উত্তরদিকে নব-পাষাণ নামক তীর্থ। এখানে সপ্তখণ্ড পাষাণ প্রদানপূর্ব্বক সমুদ্রে স্নান করিতে হয়। ধর্ম্ম-পুষ্করিণীর সন্নিকটে দেবীপত্তন আছে। পুরাকালে মহিষাসুরযুদ্ধে মহিষাসুর দেবীর প্রহারে রক্তাক্তকলেবর হইয়া এই পুষ্করিণীতে আত্মগোপন করে। দেবীও মহিষাসুরের পশ্চাদনুধাবন করেন। পরে এস্থানে আসিলে দেবী এক আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া এই সকল ঘটনা জানিতে পারেন। তখন দেবীর আদেশানুসারে মৃগেন্দ্র এই পুষ্করিণীর জলশোষণ করিলে, দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়া এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। দেবগণ এই পুরীর নাম দেবীপত্তন রাখেন।

চক্রতীর্থের দক্ষিণে ও সমুদ্রতীরে বেতালবরদতীর্থ। এস্থানে স্নান করিলে মানবগণ জীবন্মুক্ত হয়। শাস্ত্রেও এইরূপ কথিত আছে—

"যে ইদং তীর্থমাসাদ্য চক্রতীর্থস্য দক্ষিণে।
স্নানং কদাচিৎ কুর্ব্বন্তি জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে।"

এই তীর্থ সম্বন্ধে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। কান্তিমতী নাম্নী গালব মুনির এক রূপবতী কন্যা পুষ্পচয়ন করিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সুদর্শন ও সুকর্ণ নামক দুই বিদ্যাধরকুমার ঐ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হরণ করে। গালব ইহা অবগত হইয়া বিদ্যাধরকুমারদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করেন। সুদর্শনে বলিলেন, "তুমি মানব হইয়া জন্মগ্রহণ কর এবং সহসা বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়া মাংস শোণিতাদি পান আহার করিবে।" সুকর্ণকে কহিলেন, "তুমিও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞপ্তিকৌতুক বিদ্যাধরকে দর্শন না করিবে, ততদিন পৃথিবীতে অবস্থান করিবে।" তখন গালব মুনির অভিসম্পাতে তাহারা যমুনাবাসী এক বিপ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। সুদর্শনের নাম বিজয়াশোক এবং সুকর্ণের নাম অশোক-দত্ত হইল। একদা বিজয়াশোক এক শ্মশানে যাইয়া হঠাৎ বেতা-লত্ব প্রাপ্ত হইল। অশোকদত্ত বিজ্ঞপ্তিকৌতুক বিদ্যাধরকে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিল। পরে তাহার ভ্রাতা বিজয়াশোককে এইস্থানে আনয়ন করিলে স্থানস্পর্শেই উহার বেতালত্ব দূরীভূত হইল। তদবধি এই তীর্থের নাম বেতালবরদতীর্থ হইল।

এক্ষণে যাহা পাম্বাম্ ও রামেশ্বরম্ তাহাই সেতুমাহাত্ম্যে গন্ধমাদন পর্ব্বত নামে অভিহিত। এই পর্ব্বতের বায়ু অঙ্গে লাগিলে কোটী ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়। ইহার শিখরদেশে পাপবিনাশ তীর্থ রহিয়াছে। এখানে স্নান করিলে বৈকুণ্ঠলাভ হয়। এই পর্ব্বতের অপর এক শিখরে সীতাসর তীর্থ। ইহা

একটা ক্ষুদ্র কুণ্ড মাত্র। সীতাদেবী লঙ্কা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তা হইয়া ও সর্ব্বলোকের সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া এই কুণ্ডে স্নান করেন। এই জলাশয়ে স্নান করিলে মানবগণ গুরুতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তকালে ব্রহ্মলোকে গমন করে।

গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক প্রান্তে মঙ্গলতীর্থ বিরাজিত। এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন। এখানে স্নান করিলে মানব সহজেই কমলার কৃপালাভ করিতে পারে। ইহার নিকটেই রামনাথক্ষেত্রে অমৃত-ব্যাপিকা তীর্থ বিদ্যমান। শাস্ত্র-কারগণ বলেন যে, এস্থানে বসিয়া শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান্ প্রভৃতি রাবণবধের মন্ত্রণা করেন। এই তীর্থে স্নান দান করিলে মানবগণ সর্ব্ববিধ ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হয়।

তারপর ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ। পুরাকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, এই বিষয় লইয়া ঘোর তর্ক উপস্থিত হয়। ইত্যবসরে তথায় এক বিরাট্ জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হন। তখন তাঁহাদের বিবাদের এইরূপ মীমাংসা হইল, যে এই অনাদি লিঙ্গের আদ্যন্ত দর্শন করিবে, সেই প্রভু হইবে। বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক অধোদিকে গমন করিয়া লিঙ্গের মূল দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আসিয়া সত্য কথা বলিলেন। ব্রহ্মা হংসোপরি আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে গমনপূর্ব্বক উহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া এই মিথ্যা কথা বলিলেন যে, "আমি উহার অন্ত

দেখিয়াছি।” এই বাক্যশ্রবণে লিঙ্গরূপী মহাদেব বলিলেন, “ব্রহ্মন্! যেহেতু তুমি মিথ্যা কথা বলিলে, অতএব লোকে তোমার পূজা করিবে না এবং চিরকাল তোমার অপযশ ঘোষণা করিবে।” তখন ব্রহ্মা মহেশ্বরের স্তুতি করায় মহেশ্বর স্তবে তুষ্ট হইয়া চতুরাননকে গন্ধমাদন পর্ব্বতের এই কুণ্ডসন্নিধানে বসিয়া তপস্যা করিতে বলিলেন। তদবধি এই স্থান ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত হইল। এখানে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মকুণ্ডের কিঞ্চিদ্দূরে হনুমৎ-কুণ্ড। রাবণ ব্রহ্মবীজ-জাত। তাহাকে নিধন করায় শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হন। তখন তিনি উক্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভার্থ ঋষিগণের পরামর্শানুসারে ভক্ত হনুমানকে কৈলাস পর্ব্বত হইতে শিবলিঙ্গ আনিতে প্রেরণ করেন। হনুমান লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টন করিয়া উক্ত লিঙ্গ আনয়ন করে। তাহা রামচন্দ্র এই কুণ্ড—তীরে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই কুণ্ডের নাম হনুমৎকুণ্ড রাখেন। এখানে স্নান করিলে অপুত্রক গুণবান পুত্র লাভ করে। কুণ্ড--সন্নিকটে প্রস্তরময় এক হনুমৎ-মূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে। শিবলিঙ্গ—গাত্রে ভক্ত হনুমানের লাঙ্গুলচিহ্ন দৃষ্ট হয়।

তারপর আমরা অগস্ত্যতীর্থ দেখিতে যাইলাম। একদা মেরু ও বিন্ধ্য পর্ব্বতদ্বয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিন্ধ্যপর্ব্বত সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া স্বশরীর বৃদ্ধি করিতে থাকিলে প্রাণিগণের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। তখন সকলে মিলিত হইয়া

কৈলাসে মহাদেবসন্নিকটে গমনপূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মহাদেব বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুরু অগস্ত্যকে উক্ত পর্ব্বতের শাসনার্থ প্রেরণ করেন। মুনিবর পর্ব্বতের নিকট আসিলে বিন্ধ্যগিরি গুরুদেবকে নতশিরে প্রণাম করিল। অগস্ত্যও বিন্ধ্যকে বলিলেন, "যাবৎ আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তাবৎ তুমি অবনতমস্তকে এখানে অবস্থান কর।" পরে অগস্ত্য এই স্থানে আসিয়া কালাতিপাত করেন। তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম অগস্ত্যতীর্থ হইল। এই তীর্থের কিয়দ্দূরে শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রামতীর্থ। ইহার অপর এক নাম রঘুসর। ইহার তীরে মুষ্টিমেয় দান করিলে তাহা সহস্রগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নরগণ এই তীর্থে স্নান করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিলে অশেষপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষলাভ করে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" এই মিথ্যা কথা বলায় পাপে লিপ্ত হন। পাপ হইতে মুক্তিলাভ-মানসে মহর্ষি বেদব্যাসের পরামর্শে ভ্রাতৃগণ ও কুলপুরোহিত ধৌম্যের সহিত এস্থানে আসিয়া যথাবিধি সংকল্প করিয়া স্নান দান করেন। ইহা এক বিশিষ্ট তীর্থে পরিণত হইয়াছে। যদিও দেখিতে ইহা এক প্রস্তরমণ্ডিত পুষ্করিণী, তথাপি ইহা বিবিধ গুণে গুণান্বিত।

তৎপরে লক্ষ্মণ-তীর্থে যাইলাম। এখানে লক্ষ্মণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত আছে। এখানে স্নান করিয়া মহাদেবের পূজা করিলে মানবের দারিদ্র্যদোষ, রোগ, শোক

ইত্যাদি বিদূরিত হয়। বলরাম নৈমিষারণ্যে সূতকে বধপূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভূমি, গো. বিত্ত প্রভৃতি দান করিয়া বিগতপাপ হন। এই তীর্থে পাণ্ডাগণ যাত্রিবর্গকে গোদান করাইতেছে দেখিলাম। ইহা রামেশ্বরদেবের মন্দিরের অতি নিকটে এবং বড় রাস্তার উপরি অবস্থিত। এই পুষ্করিণীর জল সিদ্ধিগোলা জলের ন্যায় ঘোর সবুজবর্ণ। ইহার কিয়দ্দূরে জটাতীর্থ। কথিত আছে যে, এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জটাশোধন করেন। ইহার তীরে শ্রাদ্ধাদি করিলে গয়াশ্রাদ্ধতুল্য ফললাভ হয়। এ তীর্থে অবগাহন স্নান করিলে অন্তঃশুদ্ধি সাধিত হয়। শুকদেব, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণ এ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভৃগু এস্থানে কিয়ৎকাল তপস্যারত ছিলেন। জটাতীর্থসন্নিধানে লক্ষ্মীতীর্থ বিদ্যমান ছিল। উহাতে স্নান করিলে মানবের সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইত। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে এখানে আসিয়া স্নান দান করেন ও তৎপুণ্যফলে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। এহেন তীর্থ এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। এই তীর্থের পার্শ্বেই অগ্নিতীর্থ, ইহাও সমুদ্রে নিহিত হইয়াছে। এখানে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা করেন। তৎকালে অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান্ হইয়া জানকীর নিষ্পাপ স্বভাব জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর রঘুপতি সীতাদেবীকে গ্রহণ করেন। এই তীর্থের অনতিদূরে কোটিতীর্থ অবস্থিত। রাবণবধজনিত পাপ হইতে নির্মুক্ত হইবার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র

রামেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেকের বিশুদ্ধ জল না পাওয়ায় তিনি স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবী বিদ্ধ করিয়া পাতাল হইতে কোটী সংখ্যক বিভিন্ন ধারায় ভোগবতীকে আনয়ন করেন। সেই পবিত্রবারি দ্বারা তিনি মহাদেবের অভিষেক ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করেন। যখন তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি এই তীর্থে স্নান করিয়া যান। ইহাতে স্নান করিলে সম্পদ্‌বৃদ্ধি হয় ও মহাবিঘ্ন বিনষ্ট হয়। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করিয়া মাতুলবধজনিত পাপে পতিত হন। পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে এ স্থানে আগমন করিযা প্রায়শ্চিত্তবিধানপূর্ব্বক শুদ্ধ হন। এখানে সর্ব্বতীর্থ নামক এক কুণ্ড রহিয়াছে। পুবাকালে ভৃগুবংশীয় সুচরিত নামক ঋষি বার্দ্ধক্যবশতঃ তীর্থপর্য্যটনে অসমর্থ হইয়া এই কুণ্ডতীবে বসিয়া মহেশ্বরের তপস্যা করেন। দেবাদিদেব তাঁহাব স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় আগমন কবেন এবং মুনিববকে এই বর প্রদান করেন যে, "যে কেহ এই তীর্থসলিলে স্নান কবিবে, সে সর্ব্ব তীর্থের ফল পাইবে।" মহেশ্বর আরও বলেন, "আমি এস্থলে সর্ব্বক্ষণই বিরাজ কবিব।" তদবধি যাত্রিগণেব নিকট ইহা এক মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

রামেশ্বরে বহু তীর্থ ও উপতীর্থ বিদ্যমান আছে। প্রায় সেই সমস্ত একই রকম। অধিকাংশ তীর্থ কূপ, কোনটী বা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। উপতীর্থগুলি দেখিলাম শ্রীরামচন্দ্রের সেনাগণের নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত সে

সকলের বিস্তারিত বিবরণ তেমন মনোরঞ্জন নাও হইতে পারে।

রামেশ্বরমে তিনদিন তিনরাত্র বাস করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রামেশ্বর-দেবকে আর একবার দর্শন করিলাম। পাণ্ডা আমাদিগকে সুফল দান করিল। যাহার যেমন অবস্থা তিনি তেমন দক্ষিণা দিলেন। এই সুফল বা দক্ষিণার জন্য বেশী উৎপীড়ন দেখিলাম না। এখানে অনেক পাণ্ডা বাস করে; কারণ এখানকার অধিবাসিগণের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডাবৃত্তিই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়। এখানে দেখিলাম কৃষি-প্রনালী নাই, তজ্জন্য পাণ্ডাগণের চাষের উপায় নাই। আহার্য্য দ্রব্য স্থানান্তর হইতে অত্র আনীত হয়। ব্রাহ্মণেতর সকল জাতীয় লোক ব্যবসা বাণিজ্য করে। রামেশ্বরমে চাষ আবাদ না থাকিলেও তাল নারিকেল ও তেঁতুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আফিং, গাঁজা ইত্যাদি এখানে যথেষ্ট জন্মায়। এই সকল দ্রব্যে সরকার বাহাদুরের অনেক আয় হয়। এই রামেশ্বরের পথে সর্ব্বত্র দেখিলাম যে, রন্ধন কার্য্য নারিকেল তৈলে হইয়া থাকে। সরিষার তৈল এখানে পাওয়া যায় না। আমার সঙ্গে সরিষার তৈল থাকায় বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আর এই দাক্ষিণাত্য জনপদে এক বিশেষত্ব দেখিলাম যে, অত্রত্য অধিবাসিগণ ভাতে, ডালে ও অন্যান্য সকল ব্যঞ্জনে ঘোল ও তেঁতুল ব্যবহার করে। এখানে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা নাই।

রামেশ্বরম্ পরিত্যাগ করিয়া আমরা মেড়ুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই মেড়ুরাকে স্থানীয় জনসাধারণ মথুরাপুরী বলে। ইহা অতি সুন্দর সহর। সহরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। এখানকার পথগুলি পরিষ্কার ও প্রশস্ত। এখানে অসংখ্য ছত্র ও হোটেল রহিয়াছে। সুতরাং যাত্রিদিগকে আবাস ও আহারাদির ক্লেশ আদৌ ভোগ করিতে হয় না। এখানকার সর্ব্ব প্রধান দেবমন্দির ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই দেবালয় দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে মীনাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি এবং অপরদিকে সুন্দরেশ্বর দেবের মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এরূপ সুন্দর ও সুবৃহৎ মন্দির ভারতে আর নাই। এই মন্দির এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া প্রসারিত। এই মন্দিরে সর্ব্বসমেত ৯টী গোপুরম্ আছে। গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ পাইলাম। প্রাঙ্গণটী প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখভাগে গণপতির এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিলাম। মূল মন্দিরের নিকট এক মণ্ডপ আছে, তাহার নাম অষ্টলক্ষ্মী-মণ্ডপম্। ইহাতে লক্ষ্মীর অষ্ট বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মণ্ডপের পর এক বারান্দা পাইলাম। সেখানে মহাদেবের শবর-মূর্ত্তি ও ভগবতীর শবরীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। তৎপরে সহস্রস্তম্ভমণ্ডপে আসিলাম। কারুকার্য্যখচিত সিংহব্যাঘ্রাদি মূর্ত্তিবিশিষ্ট কি সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী! উহা অবশ্য দর্শনীয়। তারপর বসন্ত-মণ্ডপ। এখানে সুন্দরেশ্বরদেবের বসন্তোৎসব হয়। এই মণ্ডপদ্বয় দেখিয়া কিয়দ্দূর যাইবার পর এক

পট্টমোবাই বা স্বর্ণপদ্ম-পুষ্কবিণী দেখিলাম। ইহাকে শিবগঙ্গা তীর্থ কহে। এখানে একটী মণ্ডপ আছে, যাহাব একটী স্তম্ভে আঘাত কবিলে প্রত্যেক স্তম্ভে সুববদ্ধ শব্দ হয। এই পুষ্করিণীব পবেই সুন্দবেশ্ববদেবেব মন্দির। মন্দিবাভ্যন্তবে অতি সুন্দব লিঙ্গমূর্ত্তি বিবাজমান। বিগ্রহেব সম্মুখেব প্রাঙ্গণে এক সুবর্ণময তালবৃক্ষ আছে।

তাবপব আমবা মীনাক্ষী দেবীব মন্দিবে গমন কবিলাম। ইনি সুন্দবেশ্ববদেবেব দেবীমূর্ত্তি। দেখিতে অনেকাংশে প্রায বামেশ্ববী দেবীব ন্যায। দেবী নানালঙ্কাববিভূষিতা। দেবীব সন্নিকটেও এক সুবর্ণময তালবৃক্ষ বর্ত্তমান। এই মন্দিরেব চূড়া সুবর্ণপাত দ্বাবা বিমণ্ডিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মন্দিবে দশ সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত হয। কোন পর্ব্বোপলক্ষে লক্ষ দীপ দেওযা হয। এই মন্দিব, মণ্ডপ ইত্যাদি পবম বমণীয়; ভাষাব এমন শক্তি নাই, যদ্বাবা উহাদিগেব যথাযথ বর্ণন করা যায। মন্দিবেব বহির্ভাগে এক প্রকাণ্ড বৌপ্যময় হস্তী দেখিলাম। উহার দন্ত ও চক্ষু সুবর্ণময়। সুন্দবেশ্ববদেবেব দুইখানি স্বর্ণনির্ম্মিত পাল্কী বহিয়াছে। দেবদেবীব বহুমূল্যেব মণিমুক্তার অলঙ্কাব ও অসংখ্য স্বর্ণ বৌপ্যেব তৈজসাদি রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্যদৃষ্টে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয। স্থানীয় জনপ্রবাদ যে, দক্ষিণাত্যের এই সকল মন্দির দেখিযা কোন এক শাসনকর্ত্তা বলিয়াছিলেন, "জাহাজ জাহাজ ধনরত্ন বহন করিয়া লইয়া যাইলেও ভারতবর্ষ কখনও ধনহীন হইবে না।"

এই সুন্দরেশ্বর সম্বন্ধে এক পৌরাণিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। একদা দেবরাজ ইন্দ্র দেবনর্ত্তকীগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের নৃত্য দেখিতেছিলেন। ইত্যবসরে দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় আগমন করেন। ইন্দ্র নৃত্যগীতে এতই অভিনিবিষ্ট ছিলেন যে, গুরুদেবের আগমনবার্ত্তা আদৌ জানিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি ইহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করেন এবং গুরুত্ব পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করেন। দেবরাজ এই ব্যাপার পরে অবগত হইয়া অনুতপ্তহৃদয়ে ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সবিশেষ জানাইলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র ত্রিশিরাসুরকে দেবগুরুর পদে অভিষিক্ত করেন। দেবগুরুত্ব-পদ পাইয়া ত্রিশিরা যজ্ঞে আহুতি দিবার সময় প্রকাশ্যে দেবগণের ও গোপনে নিজ অসুরকুলের হিতকামনা করিতেন। কালক্রমে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ত্রিশিরার শিরশ্ছেদন করেন। ত্রিশিরা দ্বিজ ছিলেন; সুতরাং ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হন। অতঃপর দেবগণের সাহায্যে ঐ পাপকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উদ্ভিদ্, স্ত্রী, জল ও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হন। তদবধি উদ্ভিদ্ হইতে নির্য্যাস, স্ত্রীতে রজঃ, সলিলে ফেন এবং পৃথিবী হইতে ক্ষার (সাজি মাটী) উৎপন্ন হইল। এদিকে ত্রিশিরার পিতা ত্বষ্টা পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া পুত্রলাভার্থ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে লাগি-লেন। যজ্ঞফলে বৃত্রনামক এক প্রবলপরাক্রমশালী পুত্র জন্মিল। ক্রমে বৃত্র ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার-

পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে তথা হইতে বিতাড়িত করেন। পরে দেবগণ ব্রহ্মার উপদেশে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন।

তাঁহাদের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্রনির্ম্মাণকরতঃ বৃত্রাসুরকে বধ করিতে আদেশ করেন। বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া ইন্দ্র পুনর্ব্বার ব্রহ্মহত্যাপাপে পতিত হন। এই পাপহেতু দেবরাজ অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন ও মুক্তিলাভের উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে পৃথিবীতে পর্য্যটনপূর্ব্বক বিগতপাপ হইতে অনুজ্ঞা করেন। তখন ইন্দ্র সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে এই মেড়বাতে আসিয়া কদম্ব-কাননে উপস্থিত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইন্দ্র মুক্তিলাভের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে এক অনাদি-লিঙ্গ দেখিতে পান। দেবরাজ তন্মুহূর্ত্তেই বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার দ্বারা উক্ত অনাদিলিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। বৃহস্পতি বিগ্রহের অভিষেকক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া তাহার নাম সুন্দরেশ্বর রাখিলেন। মহাদেব ইন্দ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। দেবরাজ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতে পারেন এই বর প্রার্থনা করিলেন। সুন্দরেশ্বর ইন্দ্রকে স্বর্গে গমন করিতে বলিলেন, কারণ স্বর্গ অরাজক হওয়ায় তথায় বহুবিধ বিঘ্ন উৎপন্ন হইতেছিল। ইন্দ্র

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে এখানে আসিয়া সুন্দরেশ্বর দেবের পূজা করিয়া থাকেন। তখন মহাসমারোহে উৎসব হয়।

এই সুন্দরেশ্বর-বিগ্রহ যে অতি পুরাকালের তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কথিত আছে, যখন অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র সীতা-উদ্ধারার্থ লঙ্কায় যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে অগস্ত্য-ঋষির আদেশানুসারে এই সুন্দরদেবের পূজা করেন। সুতরাং ইনি ত্রেতাযুগেরও পূর্ব্বতন হইবেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ মেড়ুরা নগরী আক্রমণপূর্ব্বক এই মন্দিরের বহির্ভাগ ধ্বংস করে। তাহারা মন্দিরের চতুর্দ্দশ চূড়া, কয়েকটী গোপুরম্ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

দেবদর্শন করিয়া আমরা তিরুমলনায়কের রাজভবন দেখিতে যাইলাম। মন্দির হইতে ইহা প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদ দেখিতে অতি সুন্দর। এক্ষণে উহা সরকার বাহাদুরের আদালতে পরিণত হইয়াছে। এই ভবনের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে। এই প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলদেশের পরিধি প্রায় ৪৫ হস্ত হইবে। রাজপ্রাসাদ বা আদালত হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে এক সমচতুষ্কোণ পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে এক দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের মধ্যস্থলে এক দ্বিতল দেবালয় ও সেই দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে আরও চারিটী ক্ষুদ্র দেবালয় রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীতে মীনাক্ষীদেবীর ও সুন্দরেশ্বরদেবের উৎসব হইয়া থাকে।

তৎকালে পুষ্করিণী চতুঃপার্শ্বে প্রায় লক্ষ প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। সুন্দরেশ্বরদেবের মন্দির পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড বাজার বিদ্যমান। উহার প্রবেশপথে এক বৃহৎ গোপুরম্। উক্ত বাজারে নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

মেড়ুরায় ইস্ক্রুপ-পেঁচযুক্ত এক প্রকার ছোট গেলাস পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে অতি উত্তম। শিল্পকলার জন্য মেড়ুরা ভারত-বিখ্যাত। এখানে মস্লিনের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য তারের কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন হয়। রেলপথ হইয়া মেড়ুরার বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা এক্ষণে জেলার প্রধান নগরী। এখানে স্থানীয় বিচারক, পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রভৃতি থাকেন। এই নগরীতে বহু ব্যক্তির বসবাস। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর নহে, কারণ এখানে গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রাবল্য বেশী। সেইজন্য এই দেশ অসুখ ও সংক্রামক ব্যাধির আবাস-ভূমি। এই দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সকল স্থানেই শীতকালে বারি-বর্ষণ হইয়া থাকে। এখানে শীতকাল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মেড়ুরার জলবায়ু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। মেড়ুরাতে আমরা একদিন ও ও এক রাত্রি বাস করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম।

তারপর আমরা তাঞ্জোরে রেলযোগে উপনীত হইলাম। ইহা দক্ষিণভারতে এক সুপ্রসিদ্ধ নগর। এই নগর কাবেরী নদীর উপকূলে অবস্থিত। এই নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, তাঞ্জন নামক এক ভীষণ দৈত্য এ স্থানে

বাস করিত। তাহার উৎপাতে জনসমূহ ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিলে বিষ্ণু এই দৈত্যকে দমন করিয়া প্রাণিগণকে পরিত্রাণ দেন। ঐ দৈত্য মৃত্যুকালে বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন যে, তাহার নামানুসারে এই নগরের যেন নামকরণ হয়। তজ্জন্য এই সহরের নাম তাঞ্জোর হইল। এখানে দ্রষ্টব্য বহু স্থান বিদ্যমান।

এখানে বৃদ্ধেশ্বরের মন্দির অবশ্য দর্শনীয়। এই মন্দিব এক ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে অবস্থিত। দুর্গের চতুর্দ্দিকে গড বহিয়াছে দেখিলাম। গড়গুলি অতি গভীর ও প্রশস্ত। মন্দিবে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ইহার উপব এক সেতু আছে। সেতুর উপব দিয়া গমনপূর্ব্বক আমরা দুর্গস্থ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দুইটী বৃহৎ গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমিতে আসিলাম। প্রাঙ্গণের পশ্চিমভাগে এক প্রকাণ্ড নন্দী বা শিববাহন বৃষভদেব উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। এই মূর্ত্তি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট্ প্রস্তরে প্রস্তুত। ইহার সম্মুখে বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরস্থ লিঙ্গমূর্ত্তিও গ্রেনাইট্ প্রস্তরনির্ম্মিত। বৃদ্ধেশ্বরের ষাঁড় সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই মূর্ত্তি প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে; ক্রমে ইহা এতাদৃক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, যে মণ্ডপম্ ভেদ করিয়া যাইবে। বৃদ্ধেশ্বরের মন্দিরে এক বিশেষত্ব দেখিলাম যে, যদিও এই মন্দিরে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তথাপি ইহার গোপুরমে ও অন্যান্য স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই মন্দির ১৬ তলা। স্থানীয়

লোকপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হয়। চোলারাজ কাঞ্চীপুরস্থ এক ভাস্কর কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদিত করেন।

বৃদ্ধেশ্বরের নন্দীর দক্ষিণভাগে পার্ব্বতীদেবীর মন্দির। মন্দির-মধ্যে পার্ব্বতীদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শিবগঙ্গা নামক এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বৃদ্ধেশ্বরের মন্দিরের পশ্চিমকোণে সুব্রহ্মণ্যদেবের মন্দির দেখিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে সুবহ্মণ্যদেব অথবা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। মন্দিরটী ছোট হইলেও ইহার গঠন প্রণালী অতি চমৎকার। এই মন্দিরের বামভাগে গণেশদেবের মন্দির রহিয়াছে। ইহার অল্পদূরে এক সুন্দর উদ্যান দেখিলাম, তন্মধ্যে নির্ম্মলজলপূর্ণ এক সরোবর বর্ত্তমান আছে। তত্রত্য জনসাধারণ এই সরোবরে জলপান করিয়া থাকেন।

মন্দির ও বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া আমরা রাজপ্রাসাদ দেখিতে যাইলাম। ইহা বৃহৎ দুর্গমধ্যে অবস্থিত। ইহার মণ্ডপ অতি উচ্চ। রাজপ্রাসাদের দরবারকক্ষ ও সরস্বতীমহল (লাইব্রেরী) দেখিবার উপযুক্ত। দরবারকক্ষে রাজা শিবাজীর এক মার্ব্বেল প্রস্তরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক রাজগণের মূর্ত্তি সকল অবস্থাপিত। দরবারহলসংলগ্ন সরস্বতীমহলে এক পুস্তকাগার আছে, যথায় প্রায় বিংশ সহস্র হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে। ভারতের অন্য কোনও পুস্তকালয়ে এত অধিক হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহ। রাজভবনের অস্ত্রাগারে

নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দেখিলাম। প্রত্যেক দ্রব্য সযত্নে সজ্জিত আছে। রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করিয়া আমরা দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

তাঞ্জোরে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী নালা ইত্যাদি আছে; সেজন্য এখানকার জমী বঙ্গদেশের ন্যায় উর্ব্বরা। এখানে ধান্য, নারিকেল, আম্র ও নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। হিন্দুরাজগণের শাসনকালে এখানে সকল প্রকার শিল্প-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। এক্ষণেও কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র, কার্পেট, শিল্পের দ্রব্যাদি সাদরে সর্ব্বত্র সংগৃহীত হয়। এখানে সুন্দর চিত্র সকল চিত্রিত হয়। এখানকার সকল রকম দ্রব্য স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। এখানে বহু লোকের বসবাস আছে। দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ দেখিয়া আমরা এস্থান পরিত্যাগ করিলাম।

পরে আমরা তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত কুম্ভকোণম্ সহরে আসিলাম। পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী এই সহরের মধ্য দিয়া বহিতেছে। ষ্টেশন হইতে সহর এক মাইলমাত্র দূরে অবস্থিত। এই সহর বেশ সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী। প্রাচীনকালে কুম্ভকোণম্ সংস্কৃতবিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখনও এই স্থানে বেদ, বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা বিশেষ-রূপেই হইয়া থাকে। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন কাশী, দাক্ষিণাত্যে তেমন এই কুম্ভকোণম্। সংস্কৃতশিক্ষার্থ এস্থানে যে শিক্ষালয় স্থাপিত আছে, তাহা দক্ষিণভারতে সুপ্রসিদ্ধ। এই শিক্ষালয়ে

শিক্ষিত হইয়া ছাত্রগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাইয়া শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইতেছে। এই বিদ্যামন্দির কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত।

কুম্ভকোণমে ১৬টী মন্দির আছে; তন্মধ্যে দ্বাদশটী শিবমন্দির ও চারিটী বিষ্ণুমন্দির। এই সকল মন্দিরের মধ্যে ৪।৫টী মন্দির বিখ্যাত। প্রথমে আমরা শার্ঙ্গপাণি স্বামীর মন্দির দেখিতে যাইলাম। ইহা নগরের মধ্যস্থলে অবস্থাপিত। মন্দিরপ্রবেশ-পথে এক বৃহৎ গোপুরম্ আছে। গোপুরম্-গাত্রে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকা রহিয়াছে। সে পুত্তলিকাগুলির এরূপ সুন্দর গঠন যে, তাহাদিগকে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মন্দিরমধ্যে রৌপ্যময় অনেক দেববাহন-মূর্ত্তি ও দুইখানি প্রকাণ্ড কাষ্ঠময় রথ দেখিলাম। এখানে বিগ্রহ বিষ্ণুমূর্ত্তি শেষ পর্য্যঙ্কে শায়িত। নিকটে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠাপিত। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ শরাসনহস্তে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এস্থানের বিগ্রহের নাম মধ্যরঙ্গম্। ত্রিচিনাপল্লীর আদিরঙ্গম্, মায়াভরমের অন্তরঙ্গম্ ও এখানকার মধ্যরঙ্গম্—এই তিন স্থানের বিগ্রহ দেখিতে প্রায় এক রকম। এই মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া এক বারান্দায় পড়িলাম। তাহা অতিক্রম করিয়া কুম্ভেশ্বর-স্বামীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে গোপুরম্, তারপর এক বাজার, সেখানে নানাবিধ দ্রব্য সজ্জিত আছে দেখিলাম। মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। দেবতার অনেক

রৌপ্যনির্ম্মিত পাল্কী, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি রহিয়াছে। কুম্ভেশ্বর-স্বামীর মন্দিরের অতি নিকটে রামস্বামীর মন্দির। অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, শিল্পনৈপুণ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের প্রত্যেক প্রস্তরস্তম্ভেই শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ও বিষ্ণুর দশাবতারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। রামস্বামীকে দর্শনপূর্ব্বক আমরা চক্রপাণিস্বামীর মন্দির দেখিতে যাইলাম। এই মন্দির কাবেরীনদীতীরে দণ্ডায়মান। স্থানটী বড়ই নির্জ্জন ও শান্তিপ্রদ। মন্দিরের নিম্ন দিয়া কাবেরী নদী কুলুকুলুরবে প্রবাহিতা হইতেছে। এখানে নগরের কোলাহল আদৌ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। নদীর জলস্পর্শ করিয়া ক্ষণকাল তটোপরি বিশ্রাম করিলাম। পরে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবদর্শন করিলাম। ভগবান্ বিষ্ণু চক্রহস্তে দণ্ডায়মান আছেন। এই মন্দিরসন্নিকটে মহামোক্ষম্ নামক এক সরোবর আছে। দক্ষিণভারতে ইহা এক সুপবিত্র ও সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থল। জলাশয়ের চতুঃপার্শ্বে প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত সোপান-শ্রেণী রহিয়াছে। সরোবরতীরে অনেক দেবমন্দির দেখিলাম। ফাল্গুন মাসে এস্থানে এক মেলা হয়; তখন এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এস্থানে মহামোক্ষম্ নামে এক যোগ হয়। সেই সময় ভারতের প্রায় সমুদয় স্থান হইতে যাত্রিবৃন্দ এখানে স্নানার্থ আগমন করে।

এই কুম্ভকোণমে এক ব্রহ্মমন্দির আছে। উক্ত মন্দিরে সূর্য্যদেবের এক মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম। কুম্ভকোণম্ সম্বন্ধে

এক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। একদা প্রলয়ের সময় এক কলস অমৃত সুমেরু পর্ব্বতের গাত্রে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে প্রলয়কালীন জল বৃদ্ধি পাইতে পাইতে কলসকে ভাসাইয়া লইল। তখন উক্ত কলস জলে ভাসিতে ভাসিতে স্রোতবেগে দক্ষিণদেশে আসিল, পরে প্রলয়ান্তে ভূভাগ শুষ্ক হইলে এই কুম্ভকোণম্ দেশে উক্ত কলস পতিত হয় এবং পতনকালে উহার এক কোণ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তথা হইতে অমৃত গড়াইতে থাকে। ইহা দেখিয়া মহাদেব তথায় আগমন করেন এবং অমৃত-পানান্তে কুম্ভেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান করেন। ইহাই পৌরাণিকী আখ্যায়িকা।

কুম্ভকোণম্ পরিত্যাগ করিয়া আমরা তিরুবন্নমলয়ে উপনীত হইলাম। ইহার সংস্কৃত নাম অরুণাচলম্। এস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির তেজমূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে প্রাচীর আছে। বহির্ভাগে চারিপাশে চারিটী গোপুরম্। মূলমন্দিরটী গ্রেনাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বহুপুরাতন বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে সাতটী প্রকোষ্ঠ আছে। প্রথম প্রকোষ্ঠে উৎসবমণ্ডপ; এখানে ভোগমূর্ত্তি আনীত হয় ও মহাসমারোহে উৎসবাদি হইয়া থাকে। ইহার পর আরও ছয়টী প্রকোষ্ঠ। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই দেখিলাম প্রকোষ্ঠগুলি ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে। এই প্রকোষ্ঠ সকল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সপ্তম প্রকোষ্ঠে মহাদেবের তেজমূর্ত্তি রহিয়াছে। মান্দ্রাজ

প্রদেশে পাঁচস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবকাঞ্চীতে ক্ষিতিমূর্ত্তি, জম্বুকেশ্বরে অপ্‌মূর্ত্তি, এখানে তেজ-মূর্ত্তি, কালহস্তীতে বায়ুমূর্ত্তি এবং চিদম্বরমে ব্যোমমূর্ত্তি বিরাজমান। এই স্থানে (সপ্তম প্রকোষ্ঠে) বায়ু বা আলোক প্রবেশ না করায় উহা এত অন্ধকারময় যে, আলোক সাহায্য ব্যতিরেকে দেবদর্শন হয় না। যে স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত, তথায় পুরোহিত ভিন্ন অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। যাত্রিগণ সম্মুখস্থ চত্বরে দণ্ডায়মান হইয়া দেবদর্শন করিয়া থাকে। শ্রীবিগ্রহ তিরুবন্নমলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর নামে অভিহিত। তাহার পার্শ্বেই দেবী বিরাজমানা। দেবীর নাম অপীতকুচাম্বল। এই মন্দিরমধ্যে এক বিচিত্র গণেশ-মন্দির আছে। এখানে সহস্র-স্তম্ভযুক্ত এক হল আছে, তাহা দেখিতে অতি চমৎকার। প্রবাদ আছে যে, গৌতম মুনি এখানে তপস্যা করেন। সেজন্য অত্রত্য অধিবাসিগণ ইহাকে তীর্থসদৃশ জ্ঞান করে। সেখান হইতে আমরা ষ্টেশনাভিমুখে আসিলাম। ষ্টেশনের অতি নিকটে সুব্রহ্মণ্যদেবের এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে সুব্রহ্মণ্য-দেব বা মহাদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যমান। এই সকল দর্শন করিয়া আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

এবার আমাদের গন্তব্যস্থান চিঙ্গলপুত। পথে কাঞ্চীপুর পাইলাম; কিন্তু এস্থানে অবতরণ করিলাম না। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমরা চিঙ্গলপুতে আসিলাম। সে রাত্র এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। পরদিন সহর দেখিতে বহির্গত

হইলাম। ইহা একটী সুন্দর সহর। চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতশ্রেণী রহিয়াছে। প্রথমে আমরা ষ্টেশন হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে এক পর্ব্বতশিখরে বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর-মহাদেবের দর্শনাভিলাষে গমন করিলাম। ইহার অপর এক নাম শ্রীপক্ষী-তীর্থ। ইহা অতি পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিদিত। মধ্যাহ্নকালে দুইটী শ্বেতবর্ণ পক্ষী এই মন্দির সন্নিকটে আগমন করে এবং প্রধান পুরোহিতের হস্ত হইতে ভোগান্ন ভক্ষণ করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থান করে। পুরোহিত প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, উহারা পক্ষী-রূপধারী পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর। যাহা হউক, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে, কেননা প্রত্যহ একই সময়ে উক্ত বিহঙ্গমদ্বয় তথায় আগমন করে এবং পুরোহিতহস্ত হইতে দেবপ্রসাদ-গ্রহণ ও মন্দির প্রদক্ষিণকরতঃ অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া যায়। এই পর্ব্বতের নিকটে এক দুর্গ আছে, তদুপরি এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। ষ্টেশনের নিকট দুই মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত এক হ্রদ রহিয়াছে। এস্থান হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে মহাকালীপুরম্। সেখানে শ্রীহরির শয়ান মূর্ত্তি আছে। কথিত আছে যে, এই স্থানে বালিরাজার বাড়ী ছিল।

চিঙ্গলপুত্ পরিত্যাগ করিয়া আমরা আবার মান্দ্রাজে আসিলাম। সেখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া আমরা বেজওয়াদায় (Bezwada) উপস্থিত হইলাম। ইহা কৃষ্ণা-জিলায় প্রধান নগর। এই নগর কৃষ্ণানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। নগরটীকে তিনদিক হইতে তিনটী পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াছে। আমরা এক

নন্দীমূর্ত্তির সন্নিকটস্থ বাসায় দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া নদী তীরে গমন করিলাম। এই নদীকে স্থানীয় জনসাধারণ সুপবিত্র জ্ঞান করে। শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, এই কৃষ্ণানদী বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে ;—

"আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয়া চ পুনঃপুনা।
তৃতীয়া কথিতা রেবা চতুর্থী জাহ্নবী স্মৃতা ॥
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণা ব্রাহ্মণী বৈতরিণী তথা।
বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভূতা নবধা ভুবি সংস্থিতা ॥"

গোদাবরী-গঙ্গা, পুনঃপুনা (পম্পা নামক নদী বিশেষ), রেবা (নর্ম্মদা), জাহ্নবী, কাবেরী, গৌতমী, কৃষ্ণা, ব্রাহ্মণী ও বৈতরিণী——এই নয় নদী বিষ্ণুর চরণকমল হইতে বিগলিত হইয়াছে।

নদীতে স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী কণকদুর্গার মন্দিরে গমন করিলাম ; এই পর্ব্বত ইন্দ্রকীল পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে কণকদুর্গা প্রতিষ্ঠিতা। দেবীর মন্দিরে বিশেষ কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই। দেবীর গাত্রে যৎসামান্য অলঙ্কার দেখিলাম।

এখান হইতে আমরা পিঠাপুরম্ বা পাদগয়ায় আসিলাম। এস্থানে গয়াসুরের চরণ আস্থিত আছে। ঐ অসুরের দেহ এতদূর বিস্তৃত যে, উহার মস্তক গয়াতে, বিরাজাক্ষেত্রে নাভি এবং এখানে চরণ পতিত হইয়াছে। সেজন্য গয়া শীর্ষ-গয়া, বিরজাক্ষেত্র নাভি-গয়া এবং পীঠাপুরম্ পাদ-গয়া নামে অভিহিত

হইয়া থাকে। যাত্রিগণ এখানে শ্রাদ্ধাদি করে। এস্থানে এক বিষ্ণুমন্দির আছে ও তৎসন্নিধানে এক জলাশয় দেখিলাম। উক্ত জলাশয়ই পাদগয়া এবং যাত্রিবর্গ তাহাতেই পিণ্ডপ্রদান করিয়া থাকে।

এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমরা ওয়ালটেযার (Waltair) অভিমুখে রওনা হইলাম। এক্ষণে রেলগাড়ী পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত-মালার উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া চলিতে থাকায় উভয়পার্শ্বেই পর্ব্বত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আবার স্থানে স্থানে শস্য-শ্যামল ভূভাগ দেখিতে পাইলাম। ক্রমে আমরা ওয়ালটেয়ারে আসিলাম। ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় ৩ মাইল দূরে এক উচ্চ-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সহর মান্দ্রাজ বিভাগের মধ্যে অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। আমি পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলাম, এবারও এখানে নামিলাম। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইতে ঝট্‌কা ও বাণ্ডি পাওয়া যায়। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এস্থানে আসিলাম। সে রাত্র আমরা এক বন্ধুর বাসায় যাইয়া উঠিলাম। উক্ত বাসা সহরের প্রান্তভাগে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই সহরে বহু নরনারী বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসে। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যে কতকগুলি পর্ব্বত, উদ্যান, উপত্যকা ইত্যাদি আছে। প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান সীমাচলম্। ইহা সহর হইতে প্রায় ৬।৭ মাইল দূরে এক পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। ওয়ালটেয়ারের পূর্ব্বকার ষ্টেশন সীমাচলম্। তথা হইতে মন্দির প্রায় ৩ মাইল হইবে। তবে এস্থানে কোনরূপ যান পাওয়া

যায় না; সুতরাং প্রায় সকলেই ওয়ালটেয়ার হইতে সীমাচলমে গমন করিয়া থাকে।

পরদিন সকালে আমরা সীমাচলম্ অভিমুখে গমন করিলাম। প্রায় সহস্র-সোপান আরোহণপূর্ব্বক মন্দিরসম্মুখে উপনীত হইলাম। সোপানশ্রেণী প্রস্তরনির্ম্মিত ও সুপ্রশস্ত। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাই বহু অর্থব্যয়ে এই সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্য পাল্কী ও ডুলি পাওয়া যায়। সোপানপথে কিয়দ্দূর উঠিয়াই এক ঝরণা পাইলাম। আরও উচ্চে উঠিয়া আমরা প্রথম তোরণের নিকট উপনীত হইলাম। এই তোরণ অতিক্রম করিয়া বেত্রবতী ও বেগবতী নামক দুই জলধারা বহিতেছে দেখিলাম। যতই পর্ব্বতের উচ্চদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক নির্ঝরিণী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। যেখানে সোপানশ্রেণী শেষ হইয়াছে, সেখানে এক সমতল ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকেই পথ ও সেই পথোপরি কতকগুলি গৃহ বিদ্যমান। সম্মুখেই নৃসিংহদেবের মন্দির। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে নৃসিংহদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি সুবর্ণময় ও সিংহবদনাকৃতি। সুবর্ণময় বদন ব্যতীত দেবতার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন দ্বারা আবৃত। কথিত আছে যে, প্রত্যহ একমণ চন্দন শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গে প্রলেপিত হয়। কেবল অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন যখন শ্রীঅঙ্গ হইতে চন্দন-লেপ খুলিয়া তাঁহাকে স্নান করান হয়, তখন

সকলে তাঁহার স্বরূপমূর্ত্তি দেখিতে পায়। পাণ্ডা কাহাকেও বিগ্রহস্পর্শ করিতে দেয় না। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক কোণে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এক স্থানে রামানুজা-চার্য্যের মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। এক্ষণে মন্দিরের অনেক স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডামুখে অবগত হইলাম যে, টিপু ও কালাপাহাড় এই নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া মন্দিরের কিয়দংশ ধ্বংস করিয়া যায়। মন্দিরদ্বার দিয়া এক সোপানশ্রেণী উর্দ্ধাভিমুখে গিয়াছে। যে স্থানে উহা শেষ হইয়াছে, তথায় বিজয়নগরের মহারাজের এক পুষ্পোদ্যান ও বাসভবন আছে। ইহা পর্ব্বতের প্রায় শিখরদেশে অবস্থিত। এখান হইতে নিম্নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মানুষ, পশু প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দেবদর্শন করিয়া আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম। পরে তথা হইতে আমরা ভ্যালি-গার্ডেন দেখিতে যাইলাম। ঐ উদ্যানে অনেকগুলি ঝরণা আছে। নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ উদ্যানটীকে পরিশোভিত করিয়াছে। তথায় ব্যাঘ্র ধরিবার এক ফাঁদ রহিয়াছে দেখিলাম।

এই উদ্যানের সন্নিকটে ডলফিন্‌সনোজ্ নামক এক পর্ব্বত আছে। তদুপরি এক দুর্গ সংস্থাপিত ছিল; এক্ষণে উক্ত দুর্গ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। অনেক সাধুপুরুষ এই পর্ব্বত-গুহায় বাস করেন। এই সকল দেখিয়া আমরা আর ওয়াল-টেয়ারে কালবিলম্ব না করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

অতঃপর আর কোথাও অবতরণ না করিয়া কলিকাতায়

চলিয়া আসিলাম। আমাদের গাড়ী গঞ্জাম জেলায় প্রবেশ করিলে দেখিলাম যে, এই জেলার অধিকাংশ স্থানই বনজঙ্গল—পর্ব্বতাদিসমাকীর্ণ। এই জেলায় প্রধান নগর বরহামপুর। তারপর উড়িষ্যারাজ্যে প্রবেশ করিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমরা চিল্কাহ্রদ দেখিতে পাইলাম। ভুসন্দপুর ষ্টেশনের তিন মাইল পূর্ব্ব হইতে রেলগাড়ী হ্রদের পার্শ্ব দিয়া গমন করে। আমরা ট্রেণে বসিয়াই হ্রদের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তৎকালে ভ্রমণ কি সুখজনক! ট্রেণে যাইতে যাইতে হ্রদের দৃশ্য চিত্রিতবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। এই হ্রদ বঙ্গোপসাগর হইতে প্রায় ৪০০ হস্ত পরিমিত বালুকাময় বাঁধদ্বারা বিভক্ত। হ্রদটী এত বড় যে, উহার কূলকিনারা কিছুই দেখা যায় না। বোধ হইতে লাগিল যেন উহা অনন্ত অন্তরীক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে। এক অপ্রশস্ত মোহানা দ্বারা উহা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত আছে। হ্রদের মধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, সেগুলি দ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হ্রদের তটদেশে বৃক্ষশ্রেণীর উপর বসিয়া নানা জাতীয় জলবিহঙ্গ কলরব করিতেছে। শুনা যায় এক সময় এই হ্রদের ধারে সাত হাজার শিবমন্দির ছিল, এক্ষণে কোন কোন স্থানে দু'চারটী শিবমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। এই হ্রদের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের কোন কোন স্থানে পর্ব্বত থাকায় মনে হয়, যেন হ্রদের পার্শ্বে প্রাচীর নির্ম্মিত রহিয়াছে। হ্রদমধ্যে হাঙ্গর, নক্র প্রভৃতি হিংস্র জলজন্তু থাকে। হ্রদের জল সমুদ্রের ন্যায় ঘোর নীলবর্ণ নহে, পরন্তু গঙ্গাজলের ন্যায়

পীতাভ। এই জল সমুদ্রজল অপেক্ষাও লবণাক্ত। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতি রমণীয়। এই সকল সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ ও স্বাস্থ্যকর-বায়ু সেবন করিতে বহু ব্যক্তি এস্থানে আগমন করে। জনপ্রবাদ এই যে, এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চিল্কার এই সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া জলমধ্যে পতিত হন।

এই দাক্ষিণাত্য পথে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে, এস্থানে অধিকাংশ বিগ্রহই শিব মূর্ত্তি; বিষ্ণুমূর্ত্তি অতি অল্প দৃষ্ট হয়। এখানকার ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট নহেন। তাহারা সকলেই বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি নিয়ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। এখানে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরগণের মধ্যে জাতিবিচার সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্রাহ্মণবর্গ শূদ্রগণের ছায়া স্পর্শও করেন না। আর এক বিশেষত্ব এখানে দেখিলাম যে, অধিবাসিগণ সকলেই, এমন কি ভারবাহীও, ইংরাজি ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে। এই রামেশ্বরপথে অনেক দর্শনযোগ্য স্থান আছে। সেই সকল দেখিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বারকা-ভ্রমণ।

তিনধাম পরিভ্রমণপূর্ব্বক আমার মনোমধ্যে দ্বারকাধামে দ্বারকাধিপতি শ্রীহরির দর্শনাভিলাষ বদ্ধমূল হয়। তদুদ্দেশে সন ১৩২৭ সালের ২রা বৈশাখ কালশুদ্ধ থাকায় আমি হাবড়া হইতে বেঙ্গলনাগপুর রেল কোম্পানীর বোম্বাই-গামী মেলগাড়ীতে দ্বারকাধামে গমনোদ্দেশে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উহা যে কেবল চতুর্ধামের অন্যতম তাহা নহে, সপ্ত মোক্ষদায়ক তীর্থের মধ্যে এক তীর্থ এবং অধিকন্তু এই স্থানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ আছেন। সুতরাং এই ত্রিতয়ের সমন্বয়ে এই তীর্থস্থান যে পবিত্রতম তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব হইতেই আমার জন্য এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বার্থ্ রিসার্ভ বা নিযুক্ত ছিল। যথা সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বেলা ১০ ঘটিকায় গাড়ী হাবড়া পরিত্যাগ করিল। খড়গপুর, টাটানগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। এই পথে গমন করিলে দর্শনযোগ্য কিছুই নয়নগোচর হয় না। কেবল দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রান্তরশ্রেণী ধূ ধূ করিতেছে। ষ্টেশনে খাদ্য দ্রব্যের বড় অভাব ; কিছুই পাওয়া

যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া যখন গাড়ী ছুটিতেছিল, তখন রৌদ্রতাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল। একে তো গ্রীষ্মকাল, তখন রৌদ্রের কি প্রখর তেজ তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন; তাহার উপর মধ্যপ্রদেশের বালুকারাশি উত্তপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে আগুন-ঝলকার ন্যায় বাতাস বহিতেছিল। গাড়ীর দরজা জানালার শার্শি বন্ধ করিয়া ও বৈদ্যুতিক পাখা খুলিয়া কোনপ্রকারে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিতে হইল। পরদিন বেলা ১২টার সময় গাড়ী নাগপুর ষ্টেশনে আসিল। এখান হইতে জি, আই, পি রেল আরম্ভ হইয়াছে।

এই নাগপুর পুরাকালে নাগরাজগণের রাজধানী ছিল। সেজন্য এই সুবৃহৎ ষ্টেশনের নাম নাগপুর হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এইস্থান নাগনামক ক্ষুদ্র এক নদীতীরে অবস্থিত বলিয়া নাগপুর নামে অভিহিত হয়। ইহা একটী প্রাচীন নগর। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নামক মহাকাব্যে নাগপুর ও নাগরাজার কথা উল্লিখিত আছে। এক সময়ে এই নাগরাজগণের এতাদৃক্ আধিপত্য ছিল যে, লঙ্কাধিপতি দশানন যখন সুরলোক জয় করিতে যান, তখন তাহার অনুপস্থিতকালে যদি নাগরাজ তথায় গমনপূর্ব্বক অশান্তি উৎপাদন করে এই আশঙ্কায় নাগরাজের সহিত সন্ধিস্থাপনা করে। এখানে অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। এক্ষণে ইহা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। এখান হইতে অল্পদূরে রামগিরি পর্ব্বত অবস্থিত। মহাকবি

কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের যক্ষ এই পর্ব্বতেই নির্ব্বাসিত হয়। নাগপুরে কমলালেবু বড় সস্তা দেখিলাম। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে সান্তারা বলে।

নাগপুর হইতে অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমে আমাদের গাড়ী অমরাওটী ষ্টেশনে আসিল। ইহার সংস্কৃত নাম অমরাবতী। পুরাকালে ইহা বিদর্ভের রাজধানী ছিল।

তারপর রাত ১০টার সময় গাড়ী ভুসাবালে আসিল। ইহা এক জংসন ষ্টেশন। এখানে বি, এন্, রেল কোম্পানীর ও ই, আই, রেল কোম্পানীর বোম্বাইগামী গাড়ী আসিয়া থাকে এবং এখান হইতে একই লাইন ধরিয়া বোম্বাই অভিমুখে গমন করে। ভুসাবাল ছাড়াইয়া রাত প্রায় ৪টার সময় গাড়ী নাসিকরোড্ (Nasik Road) নামক স্টেশনে আসিল। এখানে পঞ্চবটী বন, ত্র্যম্বকেশ্বর প্রভৃতি দর্শনার্থ অবতরণ করিলাম। এখানে নামিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রাজকুমার ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে সেই রাত্রে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পুনা হইতে এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা উভয়ে ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইবামাত্র নাসিকের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম।

৪ঠা বৈশাখ——ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানি অতি উত্তম টঙ্গা ভাড়া করিলাম। ষ্টেশন হইতে একজন পাণ্ডা আমাদের সঙ্গ লইল। ষ্টেসন হইতে নাসিক সহর

প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রথমে আমরা সহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী পাণ্ডুলেনা দর্শন করিতে যাইলাম। পাণ্ডুলেনায় যাইবার পথ বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। দুইপার্শ্বে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী পথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বেলা প্রায় ১০টার সময় আমরা পাণ্ডুলেনা পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলাম। তথায় আসিয়া আমি এক যান ভাড়া করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলাম। উক্ত যান আর কিছুই নহে, চেয়ারের ন্যায় একখণ্ড কাষ্ঠ এবং উহাকে ৪ জন বাহক বহন করিতেছে। পর্ব্বতোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক দেখিলাম যে, এই গুহাবলী পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা রহিয়াছে। তন্মধ্যে নানাপ্রকার মূর্ত্তি দেখিলাম। কতকগুলি বৌদ্ধ প্রতি-মূর্ত্তিও আছে। ইহাতে অনেক বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান; কতকগুলি গুহাতে ছোট কৈলাস, ইন্দ্রসভা, জগন্নাথ-সভা রহিয়াছে। এখানে অনেকগুলি খোদিত অনুলিপি আছে। প্রত্নতত্ত্ববেত্তৃ-গণের নিকট উহা বড়ই প্রয়োজনীয়। এক কন্দরের বহির্দ্দেশে পালিভাষায় সুবিস্তৃত এক লিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম। এই পর্ব্বতোপরি ২।৩টী কুণ্ড আছে, তাহাদের জল সুমিষ্ট ও হিমশীতল। গুহামধ্যে পাণ্ডবগণেরও কীর্ত্তিকলাপ অঙ্কিত আছে। এই সকল দেখিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম।

সেখান হইতে আমরা সহরস্থ গোদাবরীতটে আসিলাম। গোদাবরীর জলস্পর্শ করিয়া দর্শনযোগ্য স্থান ও তীর্থ সমূদয় দেখিতে যাইলাম। গোদাবরীতীর হইতে প্রথমে আমরা

পঞ্চবটী বন দেখিতে বহির্গত হইলাম। উৎপত্তিস্থল অতি সন্নিকট বলিয়া এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরতা কম। পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইলে পাণ্ডা আমাদিগকে সেই স্থান দেখাইল, যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র পর্ণকুটীর নির্ম্মাণকরতঃ লক্ষ্মণ ও সীতা সহ বাস করিয়াছিলেন। এখানে নানা স্থানের রাজগণ মন্দিরসংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন ; সুতরাং সেই সকল মন্দিরের গঠন বহুবিধ দেখিলাম। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই অনেক মঠ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইযা দেন। তাঁহার নির্ম্মিত রাম-মন্দির দর্শনযোগ্য। মন্দিরটী প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত ও তন্মধ্যে রামসীতার সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিদ্বয সংস্থাপিত আছে। তারপর পাণ্ডা আমাদিগকে সীতাগহ্বর দেখাইতে লইয়া গেল। আমাদিগকে এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। উক্ত ক্ষুদ্র দ্বার ব্যতীত বায়ুনির্গমনের অন্য কোনও পথ নাই। অতি কষ্টে সেই পথ দিয়া নীচে নামিতে হইল। অধিক হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করা সুকঠিন দেখিলাম। সেখানে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। গহ্বরমধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। সামান্য এক ক্ষীণ আলোকে গহ্বরটী ঈষৎ আলোকিত হইতেছে। সেখানে সীতামূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিলাম। শুনিলাম এই গুহা হইতেই রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল। সীতাগুহা দেখিয়া আমরা রামকুণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র এই কুণ্ড-সলিলে স্নান করিতেন। ইহার নিকটে কপালেশ্বরদেবের মন্দির

অবস্থিত। রামকুণ্ড হইতে কিয়দ্দূর যাইলে সূর্পনখার কর্ণ-নাসাচ্ছেদনের স্থান দেখিলাম। এই স্থানে অনেক তপোবন পরিলক্ষিত হয়। এখানে অগস্ত্যমুনির আশ্রম, অত্রি, সুতীক্ষ্ণ প্রভৃতি ঋষিগণের তপোবন সকল রহিয়াছে। এই পঞ্চবটী বন দণ্ডকারণ্যের একাংশ। রামায়ণপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র এই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ মহর্ষি-গণের দর্শনলাভ করেন; পরে অগস্ত্যমুনির উপদেশানুসারে তিনি গোদাবরীতীরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণকরতঃ সীতা ও লক্ষ্মণ সহ কিয়ৎকাল বাস করেন। তপোবন ইত্যাদি দেখিয়া মধ্যাহ্ন-কালে পাণ্ডার বাসায় আসিয়া আহারাদি করিলাম। আহারান্তে পাণ্ডাকে কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম—ত্র্যম্বকেশ্বর—দর্শনাভিলাষে গমন করি-লাম। এই স্থান নাসিক সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে নৈঋ্ত কোণে অবস্থিত। আমরা সহর হইতে এক মোটর-গাড়ী ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে উক্ত মোটর-গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অল্পকাল বিলম্ব হইল। ত্র্যম্বকে উপনীত হইয়া আমরা ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবকে দেখিতে মন্দিরা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। পঞ্চবটীতে যে সকল মন্দির রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা ইহা বহুকালের পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। ইহা হিন্দুগণের এক বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। স্থানটী বড়ই পবিত্র ও শান্তিপ্রদ। এস্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনো-রম। ইহার অনতিদূরে এক উচ্চ পর্ব্বত হইতে গোদাবরী নদী

উৎপন্না হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতোপরি অবস্থিত এক খোদিত গোমুখ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বিনির্গত হইতেছে। সেই সলিলের সমষ্টিতেই গোদাবরী নদীর উৎপত্তি। এই গোদাবরী সপ্ত শাখায় বিভক্তা——তুল্যা, আত্রেয়ী, অরুণা, বরুণা, শ্রদ্ধা, মেধা ও কৌশিকী। যেখানে ইহারা মিলিতা হইয়াছে তৎস্থানের নাম "সপ্ত-গোদাবরী-সাগর-সঙ্গম।" এই নদীর প্রতি দক্ষিণ:দশীয় ব্যক্তিবর্গের অতিশয়িতা ভক্তি দেখিলাম। তাহারা গোদাবরীকে জাহ্নবী অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যপ্রদ জ্ঞান করে। শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে, উত্তরবাহিণী গঙ্গা, পশ্চিমবাহিণী যমুনা ও দক্ষিণবাহিণী গোদাবরী মোক্ষলাভের হেতুভূতা। এই নাসিকে গোদাবরী দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা বলিয়া ইহা হিন্দুগণের নিকট বিশেষ পবিত্র বিবেচিত হয়। বারাণসীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী বলিয়া ঐ স্থানের এত অধিক মাহাত্ম্য ও সমাদর। ত্র্যম্বক স্থানের দর্শনীয় দ্রব্য দর্শন করিয়া পুনরায় নাসিক নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং তথা হইতে একখানি টঙ্গা ভাড়া করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম।

এই নাসিক নগরের নামোৎপত্তির ইতিবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের ইতিবৃত্তের সহিত সমন্বিত। শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃ-সত্যপালনার্থ লক্ষ্মণ ও সীতা সহ এই পঞ্চবটীবনে বাস করেন, তখন রাবণের ভগিনী সূর্পনখা শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করে। শ্রীরাম ইহাতে অসম্মত হওয়ায় সূর্পনখা ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সীতাদেবীকে

গ্রাস করিতে যাইলে লক্ষ্মণ রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করেন। তাহা হইতে এই স্থানের নাম নাসিক হইল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নাসিক শব্দ সংস্কৃত নবশিখা শব্দের অপ-ভ্রংশ। ৯টী পর্ব্বত এইস্থান বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া এইস্থানের নাম নাসিক হইল। দক্ষিণবাসিগণ ইহাকে কাশী সদৃশী জ্ঞান করে।

নাসিক যে এক বহুপুরাতন নগর, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও নাসিকের নাম দৃষ্ট হয়। তবে বিভিন্ন যুগে ইহা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পদ্মনগর, ত্রেতাযুগে ত্রিকণ্টক, দ্বাপরে জনস্থান এবং এক্ষণে ইহার নাম নাসিক হইয়াছে। এক সময় এই স্থানে বৌদ্ধ ও জৈনগণের বহু বিহার ও মন্দির ছিল। পুরাকালে এস্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষরূপেই হইত; এখনও এখানে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বড় কম নহে। এই নগরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। নাসিক বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার পরবর্ত্তী ষ্টেশন দেবলালী। তথায় সৈনিক পুরুষেরা বাস করে। উহাদের কাহারও পীড়া হইলে নাসিকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকে। এখানে অফিস, আদালত, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি রহিয়াছে। ষ্টেশন হইতে সহর পর্য্যন্ত ট্রামগাড়ী আছে। উহা অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হয়। এখানকার পিত্তল ও তাম্রের দ্রব্যাদি অতি সুন্দর। অনেক প্রকার উত্তম কাংস্য দ্রব্যও এখানে পাওয়া যায়। বাজার গোদাবরীতীরে

অবস্থাপিত। তথায় সর্ববিধ দ্রব্যের আমদানী হইয়া থাকে: প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভমেলা হয়। তখন ভারতের নানা স্থান হইতে বহুলোক এখানে আগমন করে। নাসিকের মধ্যে গৌতমীতটে যে স্থানে ত্র্যম্বকেশ্বর রহিয়াছে, সেই স্থানের সৌন্দর্য্য কি চমৎকার! অদূরে গিরিশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে তরুরাজি বিরাজিত। পর্ব্বতশিখর হইতে গোমুখী গোদাবরী নামিয়া আসিতেছে। প্রকৃতির এই সকল শোভা অবশ্য দর্শনীয়। নাসিকস্থ পর্ব্বতোপরি পূর্ব্বে অনেকগুলি দুর্গ ছিল, এক্ষণে সে সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাত্র প্রায় ১০টার সময় আমরা ষ্টেশন হইতে বাষ্পীয়যানে আরোহণপূর্ব্বক বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইলাম। দেবলালী, ইগাৎপুরী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পরদিন সকাল ৭টার সময় গাড়ী কল্যাণ নামক জংশন ষ্টেশনে আসিল। এই পথের মধ্যে ৭।৮টী টনেল বা সুড়ঙ্গ পাইলাম। পর্ব্বত সকলের মধ্যে যে স্থানে অনেক প্রস্তর কর্ত্তন করিতে হইবে তথায় সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এই কল্যাণ জংশন হইতে এক লাইন পুণা নগরাভিমুখে গিয়াছে। এই কল্যাণ সহরে চাণক্য পণ্ডিতের আবাস ভূমি ছিল। পুণা যাইবার পথে ২৭টী ক্ষুদ্র বৃহৎ সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে থাকে। রিসার্ভিং ষ্টেশনে যখন গাড়ী যায়, তখন সম্মুখভাগে আর পথ না থাকায় যে পথে গাড়ী আসে সেই পথেরই উপরিস্থ স্তর দিয়া উক্ত গাড়ী চলিতে থাকে।

ভোরঘাট পর্ব্বতোপরি আরোহণার্থ করজট্ নামক ষ্টেশন হইতে গাড়ীকে অগ্রপশ্চাৎ দুইখানি ইঞ্জিন টানিতে লাগিল। প্রায় ২০০০ ফিট চড়াই আরোহণপূর্ব্বক পুণা ষ্টেশনে আসিতে হয়। পুণায় পার্ব্বতীদেবীর মন্দির, চতুঃশিঙ্গি-দেবীর মন্দির প্রভৃতি দর্শনযোগ্য। এখানকার জলবায়ু বোম্বাই নগরী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহা এক সৈনিকাবাস। এখানে বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা অবস্থান করেন। পুণা হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে সিংহগড়। তথায় শিবাজীর ২।৩টী ভগ্নপ্রায় দুর্গ আছে। রায়গড় এক বিজন নেপথ্যে অবস্থিত।

কল্যাণ ষ্টেশন হইতে গাড়ী করলা নামক ষ্টেশনে আসিল। এই ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীর ইঞ্জিন খারাপ হইয়া গেল। ইঞ্জিন মেরামত করিতে প্রায় ২ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল। পরে বেলা প্রায় ১০টার সময় আমরা বোম্বাই মহানগরীর ভিক্টোরিয়া টারমিনস্ (Victoria Terminus) নামক ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এইরূপ সুন্দর রেলওয়ে ষ্টেশন ভারতবর্ষে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষ্টেশন হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা The Great Punjab Hindu Hotel নামক এক হিন্দুহোটেলে যাইয়া উঠিলাম। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে এস্থানে আসিয়া যেথায় যাহা দেখিবার জিনিষ আছে তৎসমুদয়ই দেখিয়াছিলাম। এবারও এই সহরের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দ্বারকায় গমনাগমন কালে দেখিলাম। এখানে মুম্বাদেবীর এক প্রাচীন মন্দির অবস্থিত থাকায় দেবীর নামানুসারে এই সহর মুম্বই এবং

পরে উহা বোম্বাই নামে পরিণত হইয়াছে। এই সহরের বাড়ীগুলি অট্টালিকাবিশেষ; সকলগুলিই পাঁচ ছয় তোলা উচ্চ। কলিকাতা অপেক্ষা আয়তনে ছোট হইলেও কলিকাতা অপেক্ষা এস্থানের জন সংখ্যা অধিক। ভারতে কার্পাস শিল্প ব্যবসার জন্য বোম্বাই সহরকে এসিয়া মহাদেশের ম্যানচেষ্টার বলা হয়। ইহা এক বিশ্বজনীন নগর। এস্থানে যে কেবল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী আছে তাহা নহে, পরন্তু ফরাসী, ইতালী, জাপানী, পেনিনস্থলার প্রভৃতি কোম্পানীর জাহাজের লোক নিয়তই যাতায়াত করিতেছে। এনগরে পার্শী ও ভাটিয়া বণিক্ অধিকাংশ বাস করে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই উক্তির সার্থকতা ইহারা সম্পাদন করিতেছে। বোম্বাই সহরের ন্যায় বাণিজ্যপ্রধান সহর ভারতে বোধ হয় আর নাই। আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজা স্বর্গীয় সপ্তম এডওয়ার্ডস্ যখন যুবরাজ হইয়া ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যুবরাজকে ভারতের অধিবাসিগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, মাদ্রাজে কর্ম্মচারিগণ এবং বোম্বাই নগরে বণিক্ সম্প্রদায় দেখিলাম।

এই সহরে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে। পূর্ব্বকালে ইহা এক হিন্দু তীর্থস্থান ছিল; এখনও এখানে হিন্দুগণের বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। এখানে বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী, ভুলেশ্বর মহাদেব ও দ্বারকানাথের মন্দির, নাগাদেবীর মন্দির প্রভৃতি কয়েকটী হিন্দুধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। বালুকেশ্বর

মহাদেবের মন্দির মালাবার পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। যখন তিনি বনবাসে ছিলেন তখন কিযদ্দিবস এস্থানে বাস করেন। তিনি প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন; সে কারণে লক্ষ্মণ প্রত্যহ এক একটী শিবলিঙ্গ কাশী হইতে আনিতেন। একদিন লক্ষ্মণের শিবলিঙ্গ আনিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র বালুকাদ্বারা শিবমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করেন। পরে লক্ষ্মণের আনীত শিবলিঙ্গ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার নিকট এক পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম বাণতীর্থ। এখানে একটী ধর্ম্মশালা আছে। এই মালাবার শৈল নগরের জনকোলাহল হইতে বিমুক্ত। এই পর্ব্বতের শেষ সীমানায় মালাবার পয়েণ্ট্ নামক স্থানে লাট-ভবন রহিয়াছে। পর্ব্বতের প্রান্তপ্রদেশে তোপ সকল সজ্জিত আছে। এই শৈল হইতে সমুদ্রের দৃশ্য চমৎকার দেখায়। পশ্চিম তীর ধনুকের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। এক দিকে কোলাবা ও অন্যদিকে মালাবার পয়েণ্ট্। এই পর্ব্বতের একাংশে পার্শীদিগের শবস্তম্ভ বা টাওয়ার অব্ সাইলেন্স্ বিদ্যমান। শবস্তম্ভের প্রাচীরগাত্রে এক ক্ষুদ্রদ্বার আছে, তদ্দ্বারা শব-বাহকেরা শব লইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। স্তম্ভের উপর ছাদ নাই। ভিতরে গোলাকার তিনটী স্তরে শব প্রক্ষিপ্ত হয়। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য উক্ত তিনটী স্তর। মধ্যস্থলে এক গর্ত্ত রহিয়াছে। শব সকল স্তরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে শকুনি-প্রভৃতি আসিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া অস্থিগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক

চলিয়া যায়। কয়েকদিন পরে শববাহকগণ তথার আসিয়া ঐ অস্থি গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করে। এই শ্মশান ভূমি নির্জ্জন নেপথ্যে অবস্থিত। পার্শীরা অগ্নি ও জলকে বড় পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে।

মুম্বাদেবীর মন্দির এক পুষ্করিণী তীরে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন মন্দির। সকল সময়েই এস্থানে ব্যক্তিবর্গ দেবী-দর্শনার্থ আগমন করে। এই মন্দিরের অনতিদূরে ভুলেশ্বর মহা-দেবের মন্দির আছে।

এই বোম্বাই নগরীর প্রধান উৎসব দেওয়ালি। তখন কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি পার্শী—সকলেই দেখিলাম স্ব স্ব গৃহে দীপমালা প্রদান করে। তৎকালে বোম্বাই নগরী আলোক-মালায় সুসজ্জিতা হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই উৎসবকালে সকল হিন্দু লক্ষ্মী দেবীর পূজা করে। বোম্বাই প্রদেশে গণেশের সম্মান বড় বেশী। প্রায় প্রতি হিন্দুগৃহে গণপতির পূজা হইয়া থাকে। নগরের স্থানে স্থানে গণপতির মন্দির আছে।

এই সহরের বাড়ী সকল খাপরার চালময়। পাকাবাড়ী অতি বিরল। গভর্ণমেণ্টের বাড়ী সকল প্রস্তরময়। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী হাইকোর্টের প্রাসাদটী সুবিশাল ও সুন্দর। 'এই অট্টালিকা ত্রিতল। তাহার উপর এক উচ্চ টাওয়ার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীটি ফরাসী প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত। এই হল নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়।

এখানকার পুস্তকাগার ও রাজাবাই ক্লক্ টাওয়ার্ বোম্বাই-নিবাসী প্রসিদ্ধ দাতা প্রেমর্চাদ রায়র্চাদ প্রায় চারিলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; তিনি তাঁহার মাতার স্মরণার্থ ইহা স্থাপিত করেন। এই স্তম্ভটী চারিতালা। চতুর্থতলে বৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র বিদ্যমান। ইহা উচ্চতায় প্রায় ২৬০ ফিট হইবে। দিল্লীর কুতব্ মিনার অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উচ্চ। সমুদ্রের নিকট অবস্থিতিহেতু ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

সেক্রেটারিয়েট্ আফিসটীও দর্শনযোগ্য। এখানকার পুস্তকাগার বড়ই সুন্দর। এই আফিসের কিয়দ্দূরে নাবিকগৃহ। বরোদার ভূতপূর্ব্ব নৃপতি ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করেন। ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে প্রায় চারি লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ব্যয়িত হয়। ডিউক্ অব্ এডিন্বারা যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি ইহার ভিত্তি স্থাপনা করেন।

এই নগরের ক্রফোর্ড্ মার্কেট্ বা মতিবাজার দেখিবার স্থান। চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত রাজপথ এবং তদুপরি ধনাঢ্য ব্যক্তি-বর্গের ত্রিতল, পঞ্চতল, সপ্ততল প্রভৃতি অট্টালিকাগুলি দণ্ডায়মান। এই বাজারে নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে অনেক রকম ফলের আমদানা হইয়া থাকে। এখানকার আম্র ফল সুপ্রসিদ্ধ; আল্ফনসো নামক আম্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখান-কার কদলী বঙ্গদেশের কদলী অপেক্ষা উত্তম। বাঙ্গলাদেশের ন্যায় আনারস ও অন্যান্য ফলও জন্মে। ইহার কারণ এই যে বোম্বাই ও কলিকাতার নিরক্ষান্তর বড়ই কম।

বোম্বাই নগরীর তুলার বাজারের ন্যায় বৃহৎ বাজার বোধ হয় ভারতবর্ষে আর নাই। কোলাবার নিকট প্রায় দেড় মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই বাজার অবস্থিত। প্রতি বৎসরই এখান হইতে দশ লক্ষের অধিক তুলার বস্তা বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয়। এই বাজারসন্নিধানে সমৃদ্ধশালী মহাজনদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সমূহ সংস্থাপিত। ইহার অনতিদূরে টাউন হল। ইহা দেখিতে চমৎকার। ইহা প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার থামগুলি ইংলণ্ড হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে। এই হল দ্বিতল, উপরি তলে সমিতি-হল।

এই সহরের ভিক্টোরিয়া উদ্যান দর্শনীয়। এই উদ্যানমধ্যে এক পার্শ্বে যাদুঘর ও অপর পার্শ্বে পশুশালা অবস্থিত। যাদুঘরের বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরের ন্যায় এস্থানেও নানাপ্রকার জীবজন্তুর দেহ ও সামুদ্রিক প্রাণিগণের কঙ্কালাবশেষ সংরক্ষিত রহিয়াছে। পশুশালাটী কলিকাতা পশুশালা অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

এই সহরের প্রধান দর্শনীয় স্থান হারবার। ইহা ভারত সমুদ্রের খাঁড়ি। কোন এক বন্দরে দণ্ডায়মান থাকিলে অন্য বন্দর পরিলক্ষিত হয় না। ব্যাকবের উপর এক উদ্যান আছে; তথায় অপরাহ্নকালে ভ্রমণ কি সুখদায়ক! এখানে বি, বি, সি, আই কোম্পানীর রেলগাড়ী অনবরত যাতায়াত করিতেছে। এখান হইতে সূর্য্যাস্ত-দৃশ্য বড়ই মনোমোহন। সূর্য্যদেবের বর্ত্তুলাকার

রক্তবর্ণ দেহের অর্দ্ধাংশ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ সমুদ্রজলে ভাসমান রহিয়াছে—এই দৃশ্য অতুলনীয়। এপোলো বন্দর দেখিতে বড় রমণীয়। সমুদ্রতীরস্থ ঘাট সকল প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। তটোপরি উপবেশনার্থ স্থান রহিয়াছে। এইস্থানে বসিয়া সমুদ্রশোভাসন্দর্শন করিলে চিত্ত প্রফুল্লিত হয়।

বোম্বাই নগরীর সমুদয় দৃশ্যই উজ্জ্বল ও প্রমোদদায়ক। এখানে দেখিবার যে কত জিনিষ আছে তাহা বর্ণন করা যায় না। বন্দর, বাজার ও সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ—যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সে দিকেই মন আকর্ষিত হয়। নগরের তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড় রহিয়াছে, এবং তথা হইতে বোম্বাই নগরীর ও বন্দরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সমুদ্রের উপর এক আলোকগৃহ বিদ্যমান, তাহার উচ্চতা প্রায় ১৫০ ফিট হইবে।

এই নগরীর জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের আতিশয্য বা শীতকালে শীতের প্রাবল্য নাই। এই স্থানের ন্যায় এত অধিক জনসংখ্যা ভারতের আর কোথায়ও নাই। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীদ্বয় মধ্যে দ্রাঘিমা অন্তর ১৫ অংশ, সুতরাং কলিকাতার এক ঘণ্টা পরে এখানে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগার্থ কোন বস্তুরই অভাব নাই; সাগর, দ্বীপ, পর্ব্বতাদি সমুদয়ই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। বোম্বাই নগরীতে আসিয়া প্রায় সকলেই হস্তীদ্বীপ

(Elephanta Cave) দর্শন করিতে যায়। ইহা বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এপোলো বন্দর হইতে ষ্টীমারে যাওয়াই সুবিধাজনক। অনেকে নৌকা করিয়াও তথায় যাইয়া থাকে। তাহাতে সময় অধিক পড়ে ও ব্যয় অধিক হয়। ষ্টীমারে যাইলে কম অর্থব্যয় হয় এবং অল্প সময়েই দ্বীপে পঁহুছিতে পারা যায। গুহার যে স্থলে ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিতে হয়, সে স্থলে পূর্ব্বে এক পাষাণময় সুবৃহৎ হস্তী ছিল। ইহা হইতেই দ্বীপের নাম হস্তীদ্বীপ হইল। অবতরণস্থান হইতে গুহামুখ পর্য্যন্ত প্রস্তরময় প্রায় ১২০ সোপান আছে। দ্বীপে দণ্ডায়মান হইলে বোম্বাই নগরীর বন্দর গুলি বেশ সুন্দব দেখায়। গুহাভ্যন্তবে প্রবেশ করিবার পথ বেশ প্রশস্ত। চারি শ্রেণী স্তম্ভ পার হইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। স্তম্ভ শ্রেণীর উপর প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদ রহিয়াছে। এক কক্ষমধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত; সে কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ঐ শিবমূর্ত্তির কোনরূপ নিত্যপূজার ব্যবস্থা দেখিলাম না। তবে শিবরাত্রির সময়, শুনিলাম, তথায় এক মেলা বসে এবং সেই সময়ই কেবল দেবাদিদেবের পূজা হইয়া থাকে। এক্ষণে এখানে সর্ব্বসমেত ছয়টী গুহা আছে, তন্মধ্যে চারিটী গুহা সম্পূর্ণাবস্থায় আছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ গুহাটী সমুদ্রতট হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত গুহার পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি বিদ্যমান। ব্রহ্মা কমণ্ডলুহস্তে দণ্ডায়মান। ব্রহ্মার বামপার্শ্বে পালনকর্ত্তা

পদ্মহস্তে ও বামেতরভাগে জটাজুটধারী মহাদেব শিরোদেশে নরকপাল, ও বিল্বপত্রে পরিশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই ত্রিমূর্ত্তির ঈষৎ দক্ষিণদিকে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি রহিয়াছেন। বামার্দ্ধ গৌরীদেবীর ও দক্ষিণার্দ্ধ হরের। ইহার সম্মুখভাগে বৃষভমূর্ত্তি অবস্থাপিত। এই মূর্ত্তির পার্শ্বেই পদ্মাসনে ব্রহ্মা বসিয়াছেন ও তাঁহার আসনতলে পঞ্চহংস দেখিলাম। তাঁহার পশ্চাতে ইন্দ্র ঐরাবত আরোহণে রহিয়াছেন ও তথায় অনেক দেবদেবীর ও মহর্ষি প্রভৃতির মূর্ত্তি বিদ্যমান। এই সকল মূর্ত্তিতে সুন্দর শিল্পকার্য্য অঙ্কিত দেখিলাম।

ত্রিমূর্ত্তির বামপার্শ্বের প্রকোষ্ঠে সুবৃহৎ হরপার্ব্বতীর বিগ্রহ বিদ্যমান। হরের শিরোপরি গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মূর্ত্তিত্রয় অঙ্কিত আছে। তাঁহার দক্ষিণদিকে ভূত, প্রেত, পিশাচাদি অনুচরগণ নৃত্য করিতেছে। হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তির উপরিভাগে বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি গরুড়োপরি সমাসীন। সর্ব্বোপরি ৬টী মূর্ত্তি রহিয়াছে। ত্রিমূর্ত্তির ঈষদ্ বামভাগে হরপার্ব্বতীর বিবাহ-সভা বিদ্যমান। এই সভার পরে অপর এক গুহায় গণেশের মূর্ত্তি খোদিত। গণেশগুহার পরে এক কক্ষে রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের চেষ্টা হইতেছে এই দৃশ্য অঙ্কিত আছে। তাহার পরের কক্ষে দক্ষ-যজ্ঞের চিত্র সকল খোদিত আছে। মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দক্ষরাজের যজ্ঞ নষ্ট করিতেছেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে দেবগণ বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান।

তারপর এক স্থানে মহাদেবের যোগমূর্ত্তি স্থাপিত। এই মূর্ত্তির সহিত বুদ্ধমূর্ত্তির অনেকাংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহার অনতিদূরে মহাদেব ভৈরববেশে আসীন আছেন। এখানে এক ভগ্নপ্রায় অশ্বের মূর্ত্তি বিদ্যমান। উহার গঠনপ্রণালী অতি চমৎকার। প্রকৃত অশ্বের ন্যায় উহা পরিলক্ষিত হয়।

এই এলিফেণ্টা গুহা যে অনেক কালের পুরাতন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরাস্কিন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন বলেন। এই সকল মূর্ত্তিতে কারুকার্য্য অঙ্কিত দেখিয়া হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয় ও তৎকালে সুদূর অতীতের ভারতভূমি কতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা অনুভূত হয়। যাহারা এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহারা কিরূপ সুদক্ষ ভাস্কর ছিলেন, তাহা বর্ত্তমান যুগে অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে এবং এক্ষণে সেই শিল্প বিদ্যা লুপ্তপ্রায় অবস্থায় পতিতা।

৬ই বৈশাখ—বোম্বাই নগরীর প্রিন্সেস্ ডক হইতে করাচি-গামী এক জাহাজে করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় ৯॥০ ঘটিকায় আমি শ্রীমান্ রাজকুমার ঘোষাল ও বোম্বাইবাসী এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সহ বন্দরে আসিয়া জাহাজে আরোহণ করিলাম। বেলা ১১টায় বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িল। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে শ্রীমান্ রাজকুমার ও উক্ত ভদ্রলোকটী আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। আমি জাহাজে নিজস্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট কালে

জাহাজখানি হারবার পরিত্যাগ করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বোম্বাই সহরের পর্ব্বতগুলি মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমুদ্রপ্রান্তর অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। তারপর ঘণ্টা দুই পরে আর কোন বস্তুই পরিলক্ষিত হইল না। চতুর্দ্দিকেই জলরাশি। নিম্নে তরঙ্গসঙ্কুল ঘন নীল সমুদ্র আর মস্তকোপরি ঈষৎ নীলাভ আকাশ চারিদিকেই যেন সমুদ্র সহ মিশ্রিত হইয়াছে। সেই অনন্ত সাগরবক্ষে জাহাজখানি একটী ডিম্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আকাশ ও সাগরের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব শোভা সমুদিত হইল। এই নীল গগনতলে সাগরসলিলে অবস্থানপূর্ব্বক আমার মনে হইতে লাগিল যে, এই দুই পদার্থে বিশ্ববিধাতার এক পানপাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। বিস্তীর্ণ নীল জলধির উপর যেন নীলিমাময় গগনরূপ এক আচ্ছাদনপাত্র স্থাপিত রহিয়াছে। নয়নবিমোহনকারি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে মনপ্রাণ বিশ্ববিধাতার চরণে স্বতঃই অবনমিত হইয়া যায়। অনন্ত সমুদ্রবক্ষে সূর্য্যাস্ত এক দর্শনযোগ্য পদার্থ। সমুদ্রকূলে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনেকবার অস্তমিত সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু অগাধ জলরাশির মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যাস্ত-দৃশ্য-সন্দর্শনে মনে হয় যেন যথার্থই দেবলীলা দর্শন করিতেছি। পরে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে নভোমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বদিকই তিমিরাবৃত হইয়া যাইল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-রাজি সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তনে নিরত।

৭ই বৈশাখ—অতি প্রত্যুষেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। হস্তমুখপ্রক্ষালনান্তে জাহাজের ডেকের উপর বিচরণ করিতে লাগিলাম: কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বাকাশ রক্তিমাভা ধারণ করিল। তারপর সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য! সে দৃশ্য না দেখিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অগাধ জলরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ, কোথাও কিছুই নাই, তাহার মধ্য হইতে তপনদেবের আবির্ভাব অতি চমৎকার দেখায়। ক্রমে বেলা প্রায় ৯টায় জাহাজ পোরবন্দরে আসিয়া থামিল। দূর হইতে পোরবন্দরের বেলাভূমির শোভা অতি মনোরম দেখাইতে লাগিল। বেলাভূমির বালুকোপরি সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়ায় উহা গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছিল ও তৎপশ্চাতে শ্যামায়মান বনরাজি বিদ্যমান থাকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। সেই সকল নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকনে মনোমধ্যে মহাকবি কালিদাসের সেই শ্লোক উদিত হইতে লাগিল—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে—
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

পোরবন্দরে জাহাজ ধরিলে অনেক যাত্রী প্রভাসতীর্থ দর্শনার্থ অবতরণ করিল ও কয়েকজন যাত্রী আরোহণ করিল। বোম্বাই বন্দর হইতে এই পোরবন্দর ২৯৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রভাসে পুরাকালের কিছুই নাই শুনিলাম। কয়েকটী অট্টালিকার

ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহা হিন্দুগণের এক পুণ্য-তীর্থ। প্রভাসের অনতিদূরেই গির্ণার পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে প্রায় ৩০০০ সোপান আছে। পর্ব্বতোপরি এক দেবমন্দির আছে। এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন।

বেলা প্রায় ১১টার সময় জাহাজ দ্বারকাধামের সম্মুখীন হইল। এখানে কোনও বন্দর নাই। সমুদ্রতট হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে অনন্ত জলরাশিমধ্যে অল্প স্থান নির্ম্মিত আছে। তথায় জাহাজ হইতে ও জাহাজে যাত্রিগণকে অবরোহণ ও আরোহণ করিতে হয়। এস্থান হইতে সমুদ্রতটে যাতায়াত করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। একখানি ক্ষুদ্র তরণী পালভরে অনন্ত জলরাশির উপর গমনাগমন করে; পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গ-রাশির উপর দিয়া যখন তরী সকল গতায়াত করে, তখন মনে হয় যেন অচিরেই উহা জলমগ্ন হইবে। কত যাত্রী সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া বমন করিতে থাকে। সমুদ্রতীর হইতে জাহাজে আসিতে আরও অধিক ক্লেশভোগ করিতে হয়। তৎকালে সমুদ্রের দুর্দ্দান্ত তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া আসিতে হয়। এক্ষণে সমুদ্রভ্রমণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে ইচ্ছুক। সমুদ্র ভ্রমণ ৩।৪ দিন সুখকর হইতে পারে, কিন্তু তারপর জাহাজে অবস্থিতি বড়ই কষ্টকর ব্যাপারে পরিণত হয়। প্রত্যহ একই প্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে অতৃপ্তি আগমন করে। তাহার উপর জাহাজের অনবরত দোলন—উহা আমার নিকট আদৌ তৃপ্তিদায়ক নহে। আবার যদি তুফানে জাহাজের রোলিং পিচিং

আরম্ভ হয়, তখন সেস্থানে অবস্থান করা কি ক্লেশদায়ক তাহা কহতব্য নহে। সৌভাগ্যক্রমে আমার গমনকালে সমুদ্রে ঝড় বাতাস ছিল না। তথাপি সে কি প্রবল বায়ু, যাহা স্থলপথে স্বাভাবিক মৃদু বায়ু নামে অভিহিত হয়। জাহাজের অবিরাম কম্পন ও তথায় যে কয়েকটী যাত্রী থাকে তদ্ব্যতীত আর অন্য কেহ নাই বা অন্য কোন নূতন দৃশ্য দেখিবার নাই, কেবল চতুর্দ্দিকে জলরাশি—ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সমুদ্রবক্ষে ভ্রমণ আমার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক বোধ হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা এরোপ্লেন বা উড়ো জাহাজে করিয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে আমার বড় আরাম হয়। কলিকাতায় এরোপ্লেনে চড়িয়া যে আরাম উপভোগ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। বেলুনেও উঠিয়াছি, কিন্তু তদপেক্ষা এরোপ্লেনে গমন করা অত্যন্ত আরাম-প্রদ।

সমুদ্রতটে অবতরণান্তে দ্বারকানাথের সুন্দর মন্দিরচূড়া দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। প্রায় ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে এই মোহন চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরচূড়া সন্দর্শনে হৃদয়ে পরমানন্দ উদিত হইল। ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই কারুকার্য্যময় দেবমন্দির স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সমুদ্রতট হইতে এই শ্রীমন্দির প্রায় ক্রোশার্দ্ধ পথে অবস্থিত। যাত্রিগণ "দ্বারকানাথের জয়," "রণছোড়জী মহারাজকি জয়" ইত্যাদি রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতে লাগিল। অতঃপর আমরা মন্দিরসম্মুখে উপনীত হইলাম। মন্দিরসংলগ্ন মহাত্মা

শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত সারদা মঠ, যাহা এক্ষণে সংস্কারাভাবে জীর্ণাবস্থায় পতিত হইয়াছে, সেই মঠস্থ এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এস্থানে আমার জনৈক বন্ধু সস্ত্রীক ছয়মাস কাল বাস করিতেছিলেন। এই সুদূর দ্বারকাধামে একজন বন্ধুর সঙ্গলাভ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। বাসায় দ্রব্যাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক দেবদর্শন করিতে যাইলাম। মূলমন্দির পঞ্চতল। ইহার চূড়া প্রায় ১৫০ ফিট উচ্চ হইবে। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এক রাত্রিতে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরসম্মুখে এক নাটমন্দির বিদ্যমান; উহা প্রায় ৬০টী স্তম্ভের উপর অবস্থাপিত। ইহার উপর এক ত্রিকোণবিশিষ্ট চূড়া আছে, তাহার উচ্চতা প্রায় ১৭০ ফিট হইবে। নাটমন্দিরের সম্মুখে মূলমন্দির। তন্মধ্যে রৌপ্যসিংহাসনোপরি নবজলধরতুল্য শ্যাম-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। মুরলীধারী বনমালীর মূর্ত্তি দ্বিহস্ত পরিমিত উচ্চ হইবে। শ্রীবিগ্রহের আপাদমস্তক মণিমুক্তার দ্বারা বিমণ্ডিত। মস্তকে শিখিপুচ্ছসমন্বিত কিরীট, কর্ণদ্বয়ে রত্নময় কুণ্ডল এবং গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছে। সেই শ্রীমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলাম। পরে সন্ধ্যাকালে আরত্রিক ক্রিয়া দর্শনযোগ্য। দীপালোকে মনিমুক্তার এক অপরূপ রূপ উৎপন্ন হয়। শ্যামসুন্দরের আরতি দর্শনকালে মনে হইতে লাগিল যেন এই পার্থিব জগতে থাকিয়াই বৈকুণ্ঠ-ধামের মাধুরী উপভোগ করিতেছি। তখন মনোমধ্যে অপার আনন্দধারা বহিতে থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে,

"দ্বারকানগরীং দৃষ্ট্বা নরো নারায়ণো ভবেৎ।" অপিচ এস্থানের এতাদৃক্ মাহাত্ম্য যে, "দ্বারকায়াং মৃতো যশ্চ গর্দ্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ"। আরত্রিকক্রিয়া দর্শনান্তর বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলাম।

৮ই বৈশাখ—অদ্য শুক্লপর্ব্বায়া অক্ষয়া তৃতীয়া। এরূপ শুভদিনে দ্বারকানাথদেবের দর্শনলাভ করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। এই দিবস হইতে সত্যযুগ আরম্ভ হয়; সুতরাং এহেন দিনে নারায়ণের মূর্ত্তি দর্শনে পরমা গতি লাভ করিতে পারা যায়। ব্রহ্মপুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে;—

"যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনচর্চ্চিতম্।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্॥"

দেবদর্শন করিবার পূর্ব্বে যাত্রিবর্গকে গোমতী নদীতে স্নান করিতে হয়। এই পুণ্যসলিলা গোমতী নদী দ্বারকার দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত। সেই জন্য এই স্থান গোমতী-দ্বারকা নামে অভিহিত। এই গোমতী নদীতে স্নান করিতে হইলে যাত্রি-গণকে কিঞ্চিৎ শুল্ক দিতে হয়। যাত্রিগণ এখানে এক কুণ্ড-সন্নিধানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। শাস্ত্রেও এই স্থানের শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে;—

"মাতা চ পুত্রিণী তেন পিতা চৈব পিতামহঃ।
পিণ্ডদানং কৃতং যেন গোমত্যাঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ।"

যেস্থানে এই স্রোতস্বতী সাগরে মিশিয়াছে, সেই সঙ্গমে অবগাহন করিলে মানব ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে।

গোমতীর তীরে কতকগুলি প্রস্তরময় ঘাট আছে; তাহাদের নাম সঙ্গমঘাট, নারায়ণঘাট, বাসুদেবঘাট ইত্যাদি। সঙ্গমঘাটের উপরি সঙ্গমনারায়ণের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। গোমতীর জল স্পর্শ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তথায় পূজা-পদ্ধতির সুব্যবস্থা দেখিলাম। দ্বারকানাথের চরণস্পর্শ ও পূজা করিতে কিঞ্চিৎ কর দিতে হয়। একবার কর প্রদান করিলে পুনশ্চ আর দিতে হয় না। যাহারা কর দিতে অক্ষম, তাহারা মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে দেবদর্শন করিয়া থাকে। স্বহস্তে দ্বারকানাথকে স্নান করাইতে স্বতন্ত্র কর দিতে হয়। ঠাকুরের ভোগের জন্য যাহার যাহা ইচ্ছা দেন। আমি এই পুণ্যাহে শ্রীবিগ্রহকে স্বহস্তে সুগন্ধি দ্বারা স্নান করাইয়া অপার শান্তিলাভ করিলাম। অদ্য শ্রীহরির চন্দন যাত্রা; সেজন্য অদ্য শ্রীমূর্ত্তির গাত্র হইতে মণিমুক্তাদি অলঙ্কার উন্মুক্ত করিযা চন্দনে চর্চ্চিত করা হয়। স্নানের সময় বিগ্রহের নগ্নবক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ভগবানের গাত্রস্পর্শে আমার শরীর পুলকিত হইল। অপর তিনধামে পুরোহিতগণ যাত্রিবর্গকে বিগ্রহস্পর্শ করিতে দেয় না, কিন্তু এস্থানে বিগ্রহ-স্পর্শ সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি দেখিলাম না। দ্বারকানাথ-দেবের বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজ করিতেছে। তাঁহার কটীতটে কালীয়নাগ বেষ্টিত আছে। শ্রীহরির চরণ-সমীপে সনক ও সনন্দের মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে। শ্রীভগ-বানের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি সন্দর্শনে জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম।

দ্বারকানাথের মন্দিরের এক পার্শ্বে ত্রিবিক্রমদেবের মূর্ত্তি এবং অপর এক পার্শ্বে বিদর্ভনন্দিনীর পুত্র প্রদ্যুম্ন আসীন। ত্রিবিক্রমদেবের পূজার ব্যবস্থা সারদামঠের অধীন। মন্দির-প্রাঙ্গনে কুশেশ্বর দেব আছেন। এখানে দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা প্রভৃতির কয়েকটী ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপিত আছে। দ্বারকায় জাতি হিসাবে পাণ্ডা নির্দ্ধারিত আছে। মন্দিরে দেখিলাম যে, পাণ্ডাদের কোন আধিপত্য নাই।

দ্বারকানাথের মন্দির ব্যতীত এস্থানে আরও কয়েকটী দেবমন্দির বিদ্যমান। চক্রতীর্থ নামে এক তীর্থ এখানে আছে। সেখানে পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে গো প্রদান করাইয়া থাকে।

মূলদ্বারকা দর্শনান্তর বেট্-দ্বারকা দেখিতে যাইলাম। অতি প্রত্যূষে এক উত্তম টঙ্গায় আরোহণ করিয়া বটদ্বীপস্থ দ্বারকা-ভিমুখে রওনা হইলাম। প্রায় ১২ মাইল আসিয়া সমুদ্রতটে উপনীত হইলাম। তথা হইতে নৌকাযোগে ৫।৬ মাইল পথ আসিয়া বেট্দ্বারকায় পঁহুছিলাম। এখানে আসিয়া প্রত্যেক যাত্রীকে দেবকর দিতে হইল। এখানকার বিগ্রহের বৈভব ও বাহ্যাড়ম্বর গোমতী দ্বারকার বিগ্রহ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার পূজাপদ্ধতি বরোদা মহারাজের ব্যবস্থামত সম্পাদিত হয়। এই দ্বীপটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এখানে সুরম্য বাসভবন বিদ্যমান। গোমতী দ্বারকায় পথ ঘাট তেমন ভাল নহে। ইহা একটী ক্ষুদ্র সহর। এখানে কচ্ছোপসাগরের সৌন্দর্য্য উপভোগ্য।

বেট্দ্বারকাদর্শনান্তর সেই দিবসই তথা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগমন* করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনপথে পোপীতলাও নামক স্থানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম নাগেশ রহিয়াছেন। সেই শিবলিঙ্গের পূজার্চ্চনা সারিয়া তথা হইতে নিস্ক্রান্ত হইলাম। এখানে এক পুষ্করিণী রহিয়াছে; *যাত্রিগণ ইহার মৃত্তিকায় তিলক কাটিয়া থাকে।

স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারকানাথকে রণছোড়জী বলে। জনপ্রবাদ এই যে, প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে মূল বিগ্রহ অপহৃত হয়। পরে বরোদার রাজা উহা উদ্ধার করিয়া বটদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোমতী দ্বারকার বিগ্রহ আধুনিক কালের নির্ম্মিত।

বর্ত্তমান দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের সে দ্বারকা নহে। সে দ্বারিকাপুরী সমুদ্রগর্ভে নিহিত হইয়াছে। এক্ষণে এই দ্বারকাই প্রাচীনকালের দ্বারকার প্রতিনিধিস্বরূপ বিদ্যমান। শ্রীমদ্ভাগবৎ ও মহাভারতপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দ্বারাপুরীর অট্টালিকার চূড়া সকল স্বুবর্ণপাত দ্বারা বিমণ্ডিত এবং গৃহরাজি শত শত মণিমুক্তায় পরিশোভিত ছিল। সেই সকল রত্নের উজ্জ্বল জ্যোতিতে দশদিক আলোকিত থাকিত। নগরীর সর্ব্বত্র প্রশস্ত রাজপথ ও অসংখ্য দেবালয় ছিল। প্রজাগণ পরম সুখ ও শান্তিতে বাস করিত। তখন মনে হইত যে, দ্বারাপুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ কৌশলের চরম স্থল। এক্ষণে কিন্তু পুরাকালের শোভা সম্পদ্ কিছুই নাই। যদুপতির সঙ্গে সঙ্গে

সকল বৈভব অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন কোথায সেই বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিতা দ্বারাপুরী, আব কোথায় বা সেই শ্রীকৃষ্ণ? সত্যই কালেব কি চমৎকার গতি! লোকসকলের ক্ষয়কর্ত্তা কালেব কবলে সকলকেই পতিত হইতে হইবে। সেই রত্নগর্ভা দ্বাবাপুরী অধুনা সাগবেব অতল তলে নিমজ্জিত। তবে পৌরাণিক মত যে, সেই প্রাচান দ্বারকা সমুদ্র কর্তৃক গ্রস্ত হইলেও ভগবদালয় বিদ্যমান ছিল।

দ্বারকার তীর্থমাহাত্ম্য যদুপতিব বসবাসেব বহুপূর্ব্ব হইতেই বিদিত ছিল। মহাভারতপাঠে জানিতে পারা যায় যে, পাণ্ডবগণের কুলপুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিবের নিকট তীর্থস্থানেব বর্ণনকালে দ্বারকাবও নামোল্লেখ করেন। পুরাকালে দ্বারকা সমুদ্র তটে আনর্ত্তদেশ মধ্যে কুশস্থলী নামে পবিকীর্ত্তিত ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কুশস্থলীর বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। তথায় ইহা লিখিত আছে—

"অহোবত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ॥

কি আশ্চর্য্য ভুবনের পুণ্য ও যশপ্রদায়িণী কুশস্থলী দ্বারকা স্বর্গেরও যশরাশিকে পরাভূত করিল, কেননা অত্রত্য প্রজাবৃন্দ অনুগ্রহকারী প্রফুল্লবদন কৃষ্ণাবতারকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইত।

এই পুরী সম্বন্ধে আরও বিবরণ জানা যায়,—

"পশ্চিমস্য সমুদ্রস্য তীরমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
কুশস্থলীতি যা পূর্ব্বং কুশেন স্থাপিতা পুরা॥
বহতি গোমতী যত্র সাগরেণ সমন্ততঃ।
দ্বারাবতীতি সা বিপ্রা আনর্ত্তেষু প্রকীর্ত্তিতা॥"

দ্বারকামাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে এই নগরীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এক ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে শর্য্যাতি নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিবসু নামক পুত্রত্রয় ছিল। মধ্যম পুত্র আনর্ত্ত অতিশয় ধার্ম্মিক ও শ্রীহরির প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আনর্ত্ত পিতাকে বলেন যে, এসমুদয় ঐশ্বর্য্য আপনার নহে, ভগবদনুগ্রহে আপনি উপভোগ করিতেছেন মাত্র। ইহাতে শর্য্যাতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া আনর্ত্তকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। আনর্ত্ত পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রতটে গমন করিয়া বিষ্ণুর তপস্যা ও আরাধনায় নিযুক্ত হন। তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু আনর্ত্তকে দর্শন দেন এবং বৈকুণ্ঠধাম হইতে শতযোজন ভূমি উৎপাটিত করিয়া সাগরে সুদর্শন চক্রের দ্বারা স্থাপিত করেন ও আনর্ত্তকে তথায় বসবাস করিতে বলেন। আনর্ত্ত সে স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কালক্রমে আনর্ত্ত গত হইলে তদীয় পুত্র রৈবত কুশস্থলী বা দ্বারাপুরী নির্ম্মিত করেন। ইহার দ্বারাই রৈবতক পর্ব্বতের উৎপত্তি হয়। এই আনর্ত্তবংশীয় ককুদ্মি ব্রহ্মলোকে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ কুশস্থলীতে রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা চারিবর্ণের

উন্নতির দ্বারস্বরূপ, সেজন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে দ্বারাবতী কহেন,

"চতুর্ণামপি বর্ণানাং যত্র দ্বারাণি সর্ব্বতঃ।
অতো দ্বারাবতীত্যুক্তা বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দ্বারকা শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া কথিত আছে,—

"পৈতৃকী তীর্থতুল্যা সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরম্।
সর্ব্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা।"

দ্বারকা সকল তীর্থের গুরুস্থানীয়া, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি তীর্থ আছে? এস্থানে আগমন করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়। স্কন্দপুরাণমতে দ্বারকা সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমা। তথায় ইহা লিখিত আছে যে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া প্রভৃতি ছয়তীর্থে গমন সুসাধ্য, কিন্তু দ্বারকায় গমনাগমন বড়ই কষ্টকর; সুতরাং এই তীর্থের স্মরণ ও কীর্ত্তনেই মানবের মোক্ষলাভ হয়। যথা স্কন্দপুরাণে,—

"ষট্‌পুর্য্যশ্চৈব সুলভা দুর্ল্লভা দ্বারকা কলৌ।
স্মরণাৎ কীর্ত্তনাদ্‌যস্মাৎ ভুক্তিঃ মুক্তিঃ সদা নৃণাম্॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ দুর্জ্জয় কংসকে নিহত করিয়া মথুরার শূন্য সিংহাসনে উগ্রসেনকে অভিষেকক্রিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিলে কংসমহিষী অস্তি অতি বিষণ্ণবদনে পিতা জরাসন্ধকে এই অশুভ বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। মগধাধিপতি জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলশালী রাজগণ

সমভিব্যাহারে যাদবগণকে আক্রমণ করে। পুনঃপুন পরাজিত হইয়াও জরাসন্ধ সুযোগ পাইলেই যাদবদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ যদুকুল ক্রমশঃ ক্ষয়িত হইতেছে দেখিয়া যমুনার বটবৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক লবণসমুদ্রতীরে এক পুরী স্থাপিত করিয়া অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। অনেক চিন্তার পর পুরী নির্ম্মাণ করিতে বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ করেন। বিশ্বকর্ম্মাও নিমেষমধ্যে বৈকুণ্ঠসদৃশী দ্বারাপুরী নির্ম্মিত করেন। তখন মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ মুনিঋষিগণ সহ পুষ্পকরথারূঢ় হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা এই পুরীর গঠনপ্রণালী সন্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। পরে শ্রীহরি তাহার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে তথায় আনায়ন করেন। দ্বারকার রত্নখচিত হর্ম্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সেই দ্বারকা যথায় শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ছিলেন, যথায় রুক্মিণীরূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা নিমিত্ত অবতীর্ণা হন এবং যথায় অন্তঃপুরে উপবিষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই দ্বারকায় ভারতের চতুর্ধামস্থ চতুঃসরোবরের অন্যতম নারায়ণ সরোবর বিদ্যমান আছে। এই তীর্থে আগমন করিলে মানবগণ বিগতপাপ হয়। এই স্থানে শ্রীহরির পদরেণু পতিত হওয়ায়, ইহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এই পুণ্যময় ভূমি মুক্তির দ্বার স্বরূপ।

দ্বারকানাথের মন্দিরসন্নিকটে হরিকুণ্ড অবস্থিত। গোমতী নদীর ঘাটগুলির উপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে চক্রতীর্থ নামক এক পুষ্করিণী পাইলাম। চক্র-তীর্থের অনতিদূরে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও শ্রীরামলক্ষ্মণের মন্দির অবস্থাপিত। ইহাদের সন্নিকটে এক কুণ্ড আছে, তাহার নাম জ্ঞানকুণ্ড। তথায় স্নান করিলে তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়। পরে ভদ্রকালীর মন্দির দেখিলাম। এই মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে রুক্মিণীদেবীর মন্দির রহিয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন মন্দির। পুরাণে কথিত আছে যে, এস্থানে শ্রীহরি নিত্য অবস্থিত আছেন। রত্নসম্পূর্ণা দ্বারকা সমুদ্রসলিলে সন্নিবিষ্ট হইলে একমাত্র রুক্মিণীদেবীর মন্দির অবশিষ্ট ছিল। বিষ্ণু-পুরাণে কথিত আছে, -

"নাতিক্রান্তমলং ব্রহ্মণ্ তদদ্যাপি মহোদধেঃ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ॥
তদতীব মহৎ পুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্।
বিষ্ণুক্রীড়ান্বিতস্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥"

রুক্মিণীদেবীর মন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপথে সূর্য্যনারায়ণের মন্দির আছে ও তৎপার্শ্বে কৃকলাসকুণ্ড। এই কৃকলাস কুণ্ড সম্বন্ধে মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে এক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। এই দ্বারাবতী নগরীতে একদিন যদুকুলের বালকগণ উপবনে

ভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া এক কূপসমীপে উপস্থিত হইল। উক্ত কূপ তৃণলতাদি দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদিগকে মহাপ্রযত্নে কূপমুখ হইতে তৃণাদি পরিষ্কৃত করিতে হইল। তৃণাদি অপসারিত হইলে বালকগণ ঐ কূপমধ্যে এক অদ্ভুত মহাকায় কৃকলাস দেখিতে পাইল। উহা কূপটী এরূপভাবে আবৃত করিয়াছে, যে উহাকে উত্তোলিত না করিলে জলপান করা অসম্ভব। বালকগণ উক্ত কৃকলাসকে উদ্ধার করিতে বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনপ্রকারেই তাহাকে তথা হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদিত করিল। বাসুদেব এই ব্যাপার বিদিত হইয়া কূপসমীপে আগমনপূর্ব্বক উক্ত বৃহদাকার কৃকলাসকে উদ্ধার করেন। ভগবানের করস্পর্শে কৃকলাস নিজাকৃতি পরিত্যাগকরতঃ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেবদেহ ধারণ করিল। শ্রীভগবান্ স্বয়ং কারণ অবগত হইয়াও সর্ব্বসাধারণসমীপে এই ব্যাপার প্রচারার্থ দেবরূপধারী কৃকলাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আমি পূর্ব্ব জন্মে ইক্ষাকুবংশীয় নৃগ নামক নৃপতি ছিলাম। সেই সময় আমি প্রতিদিনই সদাচারসম্পন্ন বেদজ্ঞ বিপ্রবর্গকে বহু সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনু দান করিতাম। একদা জনৈক বিপ্রের গাভী আমার গোধনের সহিত মিলিতা হয় এবং আমার গোরক্ষকগণ উহা জানিতে না পারায় আমার ধেনুগণের মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়া লয়। আমিও এই ঘটনা অনবগত থাকায় সেই

ধেনু অন্য এক বিপ্রকে প্রদান করি। কিয়ৎকাল পরে উক্ত ধেনুর অধিকারী বিপ্র প্রতিগ্রহিতা বিপ্রের নিকট স্বীয় গাভী দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই গাভী আমার, আমি ইহা লইয়া স্বগৃহে গমন করিব।" দানগ্রহিতা বিপ্র বলিলেন "মহাশয়। এই গাভী আমার, যেহেতু মহারাজ নৃগ ইহা আমায় প্রদান করিয়াছেন ; আমি আপনাকে ইহা কদাচ প্রত্যর্পণ করিব না।" তখন উভয়ে বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট আসিল। তখন আমি সেই দান গ্রহিতা বিপ্রকে ঐ গাভীর বিনিময়ে বহুসহস্র গাভী প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে আমাকে বলিলেন, "মহারাজ! উক্ত গাভীর দুগ্ধপানে আমার কৃশপুত্র পুষ্টিলাভ করিতেছে, সুতরাং আমি কখনও উহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" তারপর আমি যাঁহার গাভী সেই বিপ্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলাম, "দ্বিজোত্তম! আমি প্রমাদপ্রযুক্ত হইয়া আপনার গাভী অন্য বিপ্রকে প্রদান করিয়াছি, আপনি সেই গাভীর পরিবর্ত্তে লক্ষ গাভী গ্রহণ করুন।" তখন তিনি আমাকে কহিলেন, "আপনার দান কেন আমি গ্রহণ করিব? আমি অনায়াসে আপনার ভরণ পোষণের ভার লইতে সক্ষম। আমার ধেনু আমাকে প্রদান করুন।" তখন আমি নিরুপায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে সেই বিপ্র বিষণ্ণ-বদনে স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর কালক্রমে আমার মৃত্যু হইলে ধর্ম্মরাজ যমের সমীপে উপস্থিত হইলাম। কৃতান্তদেব

আমাকে বলিলেন,"মহারাজ! আপনি বহু পুণ্য কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু আপনি অজ্ঞানবশতঃ এক বিপ্রের গোধন হরণ করায় ব্রহ্মস্ব-হরণপাপে পতিত। এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে প্রথমে পাপের অথবা পুণ্যের ফলভোগ করুন"। যমের মুখে এই বচন শুনিয়া আমি প্রথমে পাপের ফলভোগ করিতে প্রার্থনা করিলাম। তদবধি সহস্র বৎসরকাল আমি কৃকলাস রূপে এই কূপ মধ্যে অবস্থান করিতেছি। কৃকলাসরূপে অবস্থান করিয়াও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল আমার স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। অদ্য আপনার শ্রীচরণদর্শনে আমার ভবযন্ত্রণা দূরীভূত হইল।" এই বলিয়া তিনি বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। বাসুদেবও সেই স্মৃতিসংরক্ষণার্থ এই কূপের নাম কৃকলাস কুণ্ড রাখিলেন।

এই দ্বারাপুরী সম্বন্ধে ভক্তমালগ্রন্থে এক উপাখ্যান বিবৃত আছে। গাঙ্গরোলের রাজা পিপাজী সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনকরতঃ দেশদেশান্তর পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় পঁহুছিয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরির নিত্যলীলা সন্দর্শন করিবার বাসনা বলবতী হইল, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া বড়ই কাতর হইলেন। স্থানীয় লোকমুখে অবগত হইলেন যে দ্বারাবতী পুরী সাগরে নিমজ্জিতা হইয়াছে এবং তথায় শ্রীহরি বাস করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া পিপাজী শ্রীহরিকে দেখিবার আশায় উদ্বিগ্নচিত্তে সমুদ্রবক্ষে লম্ফপ্রদান করেন।

সমুদ্রসলিলে তিনি শ্রীহরির সাক্ষাৎলাভ করেন। তখন শ্রীহরি পিপাজীকে তীরে উঠিয়া দ্বারকানগরী প্রকাশপূর্ব্বক তথায় তাহার চিন্ময়মূর্ত্তি স্থাপিত করিতে বলেন। তারপর পিপাজী তীরে উঠিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীহরিও প্রতিমারূপে এখানে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

দ্বারকার পাণ্ডাগণপ্রমুখাৎ এক আশ্চর্য্যজনক গল্প শুনিলাম। তাহারা বলিল যে, প্রতি বৎসর মনস্থন বায়ু বহিবার পূর্ব্বে এক সুলক্ষণযুক্ত পক্ষী সমুদ্রতটের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণদিক হইতে দেবমন্দিরসন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক দ্বারকানাথের প্রসাদ ভক্ষণ করে। প্রসাদগ্রহণান্তর কিয়ৎক্ষণ গান গাহিয়া তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডাদিগের এই উপাখ্যানে কতদূর সত্যাসত্য নিহিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। যাহারা এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহারা এতদ্সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ প্রদান করিতে সমর্থ।

মহাভারতের বনপর্ব্বে কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম ঋষিসত্তম পুলস্ত্যকে তীর্থ সমুদয়ের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষিবর ভীষ্মকে দ্বারাবতী সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করেন যে, এই তীর্থে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের দশ গুণ ফল হয়।

দ্বারকা নগরীতে সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মধুসূদন বাস করেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিগণ বলিয়া থাকেন যে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই সনাতন ধর্ম্ম। এই প্রপঞ্চীভূত জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে,

তৎসমুদয়ই তাহার যোগমায়ার গুণময় আবরণে আবৃত। শ্রীহরির বিষ্ণু অবতার শ্রীকৃষ্ণই পরম পবিত্র স্থল পুণ্যের পুণ্য ও সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল। এহেন শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বারাপুরীতে চির বসবাস করেন। শাস্ত্রে উল্লিখিত যথা,

"পুণ্যা দ্বারাবতী তত্র যত্রাসৌ মধুসূদন।
সাক্ষাদ্দেবঃ পুরাণোহসৌ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময় ঈশ্বর। ইহা পার্থিব বৈকুণ্ঠ, এস্থানে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান। বৃন্দাবনবিহারী শ্রীহরির লীলায় মাধুর্য্যভাব প্রকটিত। দ্বারকার লীলা ভগবানের অবতার তত্ত্ব স্বরূপ। এই লীলায় তিনি বিশ্বের কর্ত্তা। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থ তিনি জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞানযোগ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যখনই ধর্ম্মবিপ্লব ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান জগতে ঘটিতে থাকে, তখনই শ্রীহরি অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের সংরক্ষণে ও দুষ্টদিগের দমনে প্রবৃত্ত হন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

দ্বারকায় শ্রীভগবানের জ্ঞানযোগ, মথুরায় কর্ম্মযোগ ও বৃন্দাবনে ভক্তিযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে ভক্তিযোগ ও ক্রমান্বয়ে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভাব প্রদর্শিত করেন। জনসাধারণের কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্ম ও ক্রমান্বয়ে

জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয়। লোকহিতার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মান্তে মানবের জ্ঞানোদয় হয় এবং তাহা হইতে ঈশ্বরের প্রতি অনন্যা ভক্তি সমুদিত হয়।

দ্বারকায় পুণ্যতোয়া এক নদী আছে; উহাকে পাপনাশিনী কহে। যেস্থানে এই নদী গোমতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলে অবগাহন করিতে পারিলে জন্মজন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হয়।

দ্বারকা বরোদারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই নগরীর লোকসংখ্যা প্রায় দশ বার হাজার হইবে। সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলিয়া স্থানীয় লোকসমূহ উহা পান করে না। নগরীর অধিবাসীগণের পানীয়জলসংগ্রহ করিবার পদ্ধতি বেশ সুন্দর। তাহারা স্ব স্ব গৃহের নিম্নতলস্থ এক কক্ষে বৃষ্টির জল পূর্ণ করিয়া রাখে। গৃহের ছাদ হইতে এক নলের দ্বারা বৃষ্টিবারি ঐ কক্ষে সঞ্চিত হয়। প্রথমতঃ বৃষ্টির জল সিমেণ্ট দ্বারা নির্ম্মিত ছাদে পতিত হয় ও তৎপরে এক ধাতুময় নলের দ্বারা উক্ত বারি কক্ষমধ্যে আনীত হয়। অতঃপর উহা পানের উপযুক্ত হইলে সারাবৎসর পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নগরীতে কূপও আছে, কিন্তু অধিকাংশ কূপের জল ক্ষারস্বাদযুক্ত। এই প্রদেশের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ।

কেহ কেহ গোশকটে দ্বারকায় আগমন করেন। তাহাদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। জনমানবহীন পার্ব্বত্যপথে প্রতিপদবিক্ষেপেই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এপথে খাদ্যদ্রব্য

ও পানীয় জলের বড় অভাব। তাহার উপর এপথে ডাকাতের হাতে পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এক্ষণে এই ভয়সঙ্কুলপথে আর গমনাগমনের অসুবিধা নাই, কারণ কিছুদিন হইল এস্থানে রেলগাড়ী চলিতেছে।

দ্বারকায় দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিয়া ও তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক বোম্বাই নগরীতে আসিলাম। তথা হইতে কলিকাতা-মেলে খাণ্ডোয়া ষ্টেশনে আসিলাম। সেখানে গাড়ী বদল করিয়া ও এক শাখা লাইন দিয়া মোড্‌টক্কা ষ্টেশনে আসিলাম। এখান হইতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ওঁঙ্কারনাথ দর্শন করিতে যাইলাম। নর্ম্মদা নদীতীরে এই মহাদেবের মন্দির অবস্থাপিত। দেবদর্শন করিয়া তথা হইতে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

—০—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

জগন্নাথ-ধাম।

—০—

শ্রীক্ষেত্রে বা পুরীধামে অনেকবার আসিয়া দ্রষ্টব্য বিষয় ও স্থানসমূহ দেখিয়াছি; তবে রথযাত্রাকালে যখন দুইবার এস্থানে আগমন করি, সেই সময়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। একবার সপরিবারে এখানে জগন্নাথদেবদর্শন করিতে আসি; তখন পথে প্রসিদ্ধ তীর্থসমুদয় দেখিয়াছিলাম। সন ১৩১২ সালের ৺শারদীয়া মহাপূজার পর আমরা পুরুষোত্তমদেবের দর্শনাভিলাষে শ্রী৺হরি স্মরণান্তর বাটী হইতে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলাম। সন্ধ্যার পরেই গাড়ী হাবড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল। কতকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী খড়্গপুরে আসিল। এখান হইতে ৩।৪টী ষ্টেশন পরে দাঁতনে আসিলাম। ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে গোপীনাথের মন্দির আছে। তারপর গাড়ী বালেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর ভদ্রক ছাড়াইয়া এক ষ্টেশনের পর বৈতরণী রোড্ ষ্টেশন ও তৎপরের ষ্টেশন যাজপুর রোড্। অতি পুরাকাল হইতেই যাজপুর হিন্দুতীর্থ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। বৈতরণী নদীর দক্ষিণকূলে এই নগর অবস্থিত। এই নগরে বিরজাক্ষেত্র, বৈতরণী নদী ও নাভি-গয়া

বিদ্যমান থাকায় হিন্দুগণের ইহা এক পরম পবিত্র স্থল। এতদ্ব্যতীত ইহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম। যখন মহাদেব সতী-দেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন শ্রীভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীদেহ খণ্ডিত হইবার সময় সতীদেবীর নাভিদেশ এস্থানে পতিত হয়। পুরাণে লিখিত আছে, "উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজা ক্ষেত্র-মুচ্যতে।" এখানে অনেক যাত্রী বৈতরণী নদীতে স্নান করিতে আসে। এই নদীতে স্নান করিলে যমপুরস্থ সেই বৈতরণী নদী পার হইবার ভয় থাকে না। শাস্ত্রে আছে যে, এই নদী বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে এখানে গাভী দান করাইয়া থাকে। পরে গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া নদীপার করায় ও যমদ্বারে এই প্রার্থনা করিতে বলে,

"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্॥"

বৈতরণী নদীর এক তীরে বরাহদেবের মন্দির অবস্থিত। বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা এস্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে তুষ্ট করেন। যজ্ঞসমাপনান্তে শ্রীভগবান বরাহ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বেদোদ্ধার করেন। বরাহদেবের মন্দিরের পাদদেশে বৈতরণীতীরে দশাশ্বমেধ ঘাট বিদ্যমান। জনপ্রবাদ এই যে, রাজা যযাতী কেশরী কনোজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া এইস্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইল। বৈতরণীর অপর তীরে

অষ্টমাতৃকার মন্দির রহিয়াছে। এস্থলে আটটী নীল প্রস্তর নির্ম্মিত দেবী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই মূর্ত্তি সকল মনুষ্যের মত লম্বা ও চতুর্হস্তবিশিষ্ট। ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ব্রাহ্মণী, বারাহী, ছায়া ও চামুণ্ডা—এই অষ্ট মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

বৈতরণীতীর হইতে প্রায় ২॥০ মাইল দক্ষিণে বিরজা দেবীর মন্দির আছে। ইহা এক পীঠস্থান। মন্দির মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিতা অষ্টভুজা দেবী বিরাজমানা। মন্দিরের বহির্ভাগে প্রস্তরময় প্রাঙ্গনে বলিদানের যূপকাষ্ঠ রহিয়াছে। তথায় প্রত্যহ পশুবলি হইয়া থাকে; কারণ এস্থানের ব্রাহ্মণগণ শক্তির উপাসক। মন্দিরেব উত্তরভাগে এক গৃহমধ্যে একটী কূপ আছে। উহাকে "নাভি-গয়া" কহে। এস্থানে পিতৃমাতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া উক্ত কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। পৌরাণিক কিংবদন্তী এই যে, গয়াসুর যখন বিষ্ণুর চরণতলে দেহ বিস্তার করে, তখন গয়াক্ষেত্রে তাহার মস্তক, এই বিরজাক্ষেত্রে তাহার নাভি এবং পিঠাপুরমে পদদ্বয় পতিত হয়। সেজন্য এস্থানকে নাভি-গয়া বলে। ব্রহ্মপুরাণে এস্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—

"বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং করোতি বৈ।
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ॥"

যে কেহ এই বিরজাক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে, সে তাহার পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদন করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিরজাদেবীর মন্দিরের অনতিদূরে ত্রিলোচন শিব আছেন। শিবমন্দিরের পার্শ্বেই এক মন্দিরে অষ্টাদশহস্তপরিমিতা কালী দণ্ডায়মানা। এই বিরজাক্ষেত্রে পূর্ব্বকালে অনেক দেবদেবীর মন্দির ছিল। দুর্ব্বৃত্ত কালাপাহাড় তৎসমুদয় ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহার অত্যাচারে প্রাচীন সৌন্দর্য্যশালী যাজপুর নগরী শ্রীভ্রষ্টা হইয়াছে।

যাজপুর ষ্টেশন ছাড়াইয়া অতি প্রত্যুষে গাড়ী ভুবনেশ্বরে আসিল। ষ্টেশন গো-শকট ও পাণ্ডাগণে পরিপূর্ণ। আমাদের এক পূর্ব্ব পরিচিত পাণ্ডা ছিল। তিনি আমাদের জন্য এক বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। বাসাটী ভুবনেশ্বরের মন্দিরসন্নিকটে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রায় ২ মাইল হইবে। পথ বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। বাসায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আমরা মন্দিরাদি দেখিতে বহির্গত হইলাম। প্রথমে আমরা বিন্দুসরোবরে স্নান করিতে যাইলাম। ইহা ভুবনেশ্বরের ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্যমান। কথিত আছে যে, সমুদয় মহাতীর্থের বিন্দু বিন্দু বারি দ্বারা এই সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই তীর্থসলিলে স্নান করিলে সকল তীর্থের ফললাভ হয়। শাস্ত্রেও কথিত আছে—

"তত্র বিন্দুসরস্তীর্থং তীর্থবিন্দুভিঃ পূরিতম্।
তস্য মজ্জনমাত্রেন সর্ব্বতীর্থাম্বুগাহনম্॥"

বিন্দু বিন্দু করিয়া সকল তীর্থ বারি দ্বারা বিন্দুসরোবর পরিপূর্ণ; সুতরাং ইহাতে স্নান করিলে সমস্ত তীর্থের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এই সরোবরসলিলে স্নান করিলে জীবের পুণ্য-সঞ্চয় হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতে যেমন চারিদিকে চারিধাম আছে, তেমনি চতুর্দ্দিকে চারিটী সরোবরও আছে। উত্তরে মানস-সরোবর, দক্ষিণে পম্পা-সরোবর, পূর্ব্বে এই বিন্দু-সরোবর ও পশ্চিমে নারায়ণ-সরোবর। এই সরোবরের অপর এক নাম গো-সাগর। পূর্ব্বদিকের ঘাটের উপর অনন্তবাসুদেবের মন্দির স্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে বাসুদেব ও বলদেবের সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। উভয় ভ্রাতার মধ্য-স্থলে সুভদ্রাদেবী বিরাজমানা। মূলমন্দিরের বহির্ভাগে লক্ষ্মী-দেবীর মন্দির। নাটমন্দিরের সম্মুখভাগে গরুড়ের মূর্ত্তি অবস্থাপিত। অনন্তবাসুদেবের মন্দির ভুবনেশ্বরদেবের মন্দির অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কারুকার্য্যে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই মন্দির ভুবনেশ্বরদেবের মন্দির অপেক্ষা পুরাতন। অনন্ত-দেবের পূজান্তে ভুবনেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে হয়। বিন্দু-সরোবরের মধ্যস্থলে এক দ্বীপ আছে; তথায় কয়েকটী দেবমন্দির রহিয়াছে। সরোবরের নীচে অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে, উহা হইতেই সরোবরের জল সঞ্চিত হয়। জলের রং সবুজবর্ণ। এখানে স্নান করিয়া আমরা ভুবনেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে যাইলাম। সরোবর হইতে দক্ষিণদিকে অল্প আসিয়াই ভুবনেশ্বরের সিংহদ্বারে উপনীত হইলাম। ভুবনেশ্বরক্ষেত্রের নাম পূর্ব্বকালে একাম্রকানন ও বিগ্রহের নাম একাম্রনাথ ছিল। মন্দিরটীর চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মূলমন্দির চারিভাগে বিভক্ত,—

(১) প্রাঙ্গণ, (২) নাটমন্দির, (৩) ভোগমণ্ডপ ও (৪) মোহন ও মূলস্থান। প্রাঙ্গণের সম্মুখে গণেশদেবের এক ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। তারপর ভোগমণ্ডপ; এখানে ভুবনেশ্বরের প্রতিদিন তিনবার করিয়া ভোগ দেওয়া হয়। ইহার পর নাটমন্দির, এস্থানে নৃত্যগীত ও অন্যান্য উৎসব হইয়া থাকে। যেথায় ভুবনেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, তথায় প্রবেশ করিবার যে পথ আছে তাহাকে মোহন বলে। নাটমন্দির ও মোহন নানা কারু-কার্য্যে খচিত। মূলমন্দিরে ভুবনেশ্বরের প্রস্তরময় লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরাভ্যন্তর গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ভুবনে-শ্বরের পাষাণময় দেহের অধিকাংশই ভূগর্ভে রহিয়াছে। বিগ্রহের চতুর্দ্দিকে স্বুবর্ণময় পত্র আছে। তাহার গাত্রে কোনরূপ আভরণ নাই। গঙ্গাজল, দুগ্ধ ও সিদ্ধি তাঁহার অর্চ্চনার প্রধান উপকরণ। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু যাত্রী সমবেত হয়। মন্দিরের বহির্ভাগে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৃষভ শয়নাবস্থায় আছে। এই বৃষভের পার্শ্বে নীলপ্রস্তরখোদিত লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি বিদ্যমান। মূলমন্দিরের বায়ুকোণে ভগবতীর মন্দির। মন্দিরটী ছোট হইলেও শিল্পনৈপুণ্যে চমৎকার। দেবী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিতা। মন্দিরের পশ্চাতে এক বৃহৎ কূপ আছে। ইহার জলে দেব দেবীর ভোগান্ন রন্ধন হয়। ভুবনেশ্বরের রন্ধনশালা দর্শনযোগ্য। নিত্যভোগ ও যাত্রিগণের ভোগের জন্য ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। মন্দিরমধ্যে একস্থানে রন্ধন কার্য্য হইতেছে। পাচক ব্রাহ্মণ বদন বস্ত্রাবৃত করিয়া ভোগপাত্র সকল যথাস্থানে রাখিয়া আসি-

তেছে। পুরীর ন্যায় এখানেও ভোগান্ন বিক্রীত হইতেছে। সকলেই ইহা মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিতেছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা দেবীপাদহরা পুষ্করিণী দেখিতে যাইলাম। ইহার চতুর্দ্দিকে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবমন্দির রহিয়াছে। কতকগুলি মন্দিরে শিবমূর্ত্তি আছে এবং কতকগুলিতে নাই। এই সরোবরের উৎপত্তি বিষয়ে শিব-পুরাণে এক তত্ত্ব পাওয়া যায়। কীর্ত্তি ও বাস নামক দমনকাসুরের পুত্রদ্বয় গোয়ালিনী বেশধারিণী পার্ব্বতীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া দেবীকে বিবাহ করিতে চাহিলে, দেবী তাহাদিগকে বলেন, "তোমাদের মস্তকোপরি পদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে তোমরা যদি আমার ভর সহিতে পার, তবেই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করিব।" কামমোহিত ভ্রাতৃদ্বয় নতশির হইলে দেবী তাহাদিগকে পদদ্বয় দ্বারা চাপিয়া তথায় প্রোথিত করেন। পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইয়া এই সরোবরে পরিণত হইল। ইহার নাম দেবীপাদহরা পুষ্করিণী হয়।

এই সরোবরের প্রায় এক মাইল দূরে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। মন্দিরমধ্যে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত ও তৎপার্শ্বে কালীমাতা আছেন। উৎকটব্যাধিগ্রস্ত রোগিগণ এখানে হত্যা দিয়া থাকে; পুরাকালে এই গ্রাম অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, এক্ষণেও এস্থানে অনেক লোকের বসবাস। ভুবনেশ্বরের সমুদয় দেবমন্দিরের সংখ্যা গণনাতীত। কথিত আছে যে, এস্থানে এক লক্ষ মন্দির ও এক কোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধুনা

এস্থানে অনেক তীর্থ বিদ্যমান। এখানে প্রায় চারিশত পাণ্ডা বাস করে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে আমরা খণ্ডগিরি দেখিতে গমন করিলাম। ভুবনেশ্বর হইতে ইহা উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের গোযান পাকা রাস্তা ও মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। পথটী জনমানবহীন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে উদয়গিরিশিখরস্থ জৈনমন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইল। অতঃপর আমরা পর্ব্বতপাদদেশে উপনীত হইলাম। ক্ষুদ্র বলিয়াই হউক অথবা খণ্ডজাতির আবাস বলিয়াই হউক, এই গিরির নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। একটীর নাম উদয়গিরি ও অপরটীর নাম অস্তগিরি। এই দুই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এক প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে। পথের পার্শ্বে এক সরকারী ডাকবাঙ্গলা আছে। প্রথমে আমরা উদয়গিরিতে আরোহণ করিলাম। ইহার পাদমূলে এক পর্ণকুটীর আছে, তাহাকে বৈরাগীর-মঠ বলে। গৃহমধ্যে চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। পর্ব্বতের কতিপয় সোপান আরোহণপূর্ব্বক দেহলীতে আসিলাম। তৎপার্শ্বে গৃহ; গৃহ, অলিন্দ ইত্যাদি সমস্তই পর্ব্বতবক্ষে খোদিত। উদয়গিরির গুহাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর গুহাগুলিতে একজন মানুষ অতি কষ্টে বসিতে পারে। ইহাদের ভিতর কোন শিল্পকার্য্য নাই। এই ক্ষুদ্র কারুকার্য্যবিহীন গুহাগুলির পর কতকগুলি বৃহৎ শিল্পকার্য্যসমন্বিত গুহা আছে।

এই সকলের মধ্যে দশবার জন ব্যক্তি অনায়াসে একত্র বাস করিতে পারে। এখানে রাণী-গুহা, হস্তী গুহা, ব্যাঘ্র-গুহা প্রভৃতি দর্শনীয়। রাণী-গুহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গুহাটী দ্বিতল। নিম্নতলে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ ও উপরিতলে দ্বাদশটী কক্ষ আছে। প্রত্যেক কক্ষে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। রাণী-গুহা দেখিয়া হস্তি-গুহা দেখিতে যাইলাম। এই স্থানে নানা লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই সকল লিপিপাঠে অনেকে অনুমান করেন যে, এই সকল গুহার ন্যায় প্রাচীন গুহা ভারতের আর কোথাও নাই। ইহা খৃস্ট জন্মিবার প্রায় ৩০০বৎসর পূর্ব্বেকার হইবে। এই সকল গুহা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিকলাপ। মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ এস্থানে বাস করিত। এই হস্তী-গুহায় কতকগুলি প্রস্তরময় হস্তী রহিয়াছে। হস্তী-গুহার পার্শ্বে ব্যাঘ্র-গুহা। ইহা দেখিতে যেন একটা ব্যাঘ্র মুখ-ব্যাদানপূর্ব্বক অবস্থিত আছে। তৎপরে সর্পগুহা; উহার মস্তকোপরি এক সর্পমূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গুহা দেখিলাম। পর্ব্বতশিখরে এক জৈনমন্দির অবস্থিত। সেই মন্দিরমধ্যে মহাবীরের মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। অপর এক গুহার ভিতরে বৌদ্ধদেবের নানাপ্রকার মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এস্থানে তিনটী কুণ্ড দেখিলাম; উহাদের নাম শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও আকাশ-গঙ্গা। এই জলাশয়গুলিতে অবতরণার্থ প্রস্তরময় সোপান শ্রেণী বিদ্যমান। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের জল বেশ পরিষ্কার। আকাশ-গঙ্গার জল অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ-

ময়। এই সকল দেখিয়া আমরা উদয়গিরি হইতে অবতরণ করিলাম। এই গিরির অপর এক নাম ললিতগিরি। তারপর আমরা অস্তগিরিতে আরোহণ করিলাম। জনপ্রবাদ যে এই অস্তগিরি পূর্ব্বকালে হিমাদ্রির এক অংশবিশেষ ছিল। পরে সেতুবন্ধনের সময় হনুমান্ হিমালয় পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতখণ্ড সকল উৎপাটিত করিয়া লইয়া যাইবার সময় এই পর্ব্বতাংশ এস্থানে নিক্ষেপ করে। ইহার উচ্চতা প্রায় ১২৪ ফিট্ হইবে। ইহার আর এক নাম স্বর্ণকূটাদ্রি। উদয়গিরির ন্যায় ইহা তেমন সুন্দর নহে। এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা আছে। অনেক ধ্যানাবস্থিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানে ২।৩টী শিলালিপি আছে। মাঘী সপ্তমীতে এখানে এক উৎসব হয়। এই গিরিস্থিত গুহাগুলি আমাদের ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক পুনঃসংস্কৃত হয়। খণ্ডগিরি দর্শনান্তর আমরা বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

ভুবনেশ্বরে আর একটী দেখিবার স্থান আছে; তাহা ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে ধৌলিপর্ব্বত। সেখানে অশোকের এক বৌদ্ধবিহার আছে। তথায় ধর্ম্মাশোকের ধর্ম্মোপদেশ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। উপদেশগুলি পালি ভাষায় লিখিত। ভুবনেশ্বরের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখিয়া আমরা তথা হইতে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

অতঃপর আমরা পুরীধামে উপনীত হইলাম। ষ্টেশনে অসংখ্য পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহার্থ দণ্ডায়মান দেখিলাম। আমাদের

পূর্ব্বপরিচিত পাণ্ডাকে পাইলাম। তিনি আমাদিগের সঙ্গে চলিলেন। জনস্রোত ভেদ করিয়া আমরা প্রধান রাজপথে আসিলাম। এই পথ সুপ্রশস্ত এবং বরাবর শ্রীমন্দিরাভিমুখে গিয়াছে। এই পথেই রথযাত্রোপলক্ষে রথ টানিত হইয়া থাকে। ষ্টেশন হইতেই জগন্নাথদেবের মন্দিরচূড়া দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডা মন্দিরসন্নিকটে আমাদের জন্য এক বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। তথায় দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া আমরা ধূলাপায়েই দেবদর্শন করিতে যাইলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগে এক প্রস্তর-স্তম্ভ বিদ্যমান। ইহার নাম অরুণস্তম্ভ। ইহা উচ্চে প্রায় ৩৫ ফিট্ এবং একখানি প্রস্তরফলকে নির্ম্মিত। তৎপরে মন্দিরের সিংহদ্বার। যে ভূমির উপর মন্দির অবস্থিত আছে, তাহাকে নীলাচল কহে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার, উত্তরদিকে হস্তীদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার এবং দক্ষিণে অশ্বদ্বার। যাত্রিগণ পূর্ব্বদ্বার দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করে, কারণ ইহা বড় রাস্তার উপর অবস্থিত। দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তিদ্বয় বিদ্যমান। তারপরে ভিতরে বামভাগে শ্রীকাশীবিশ্বনাথ ও শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি এবং দক্ষিণে স্নানমঞ্চ রহিয়াছে। ইহার পর ২২টী সোপান অতিক্রমপূর্ব্বক মন্দিরের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ পাইলাম। সোপানের দক্ষিণভাগে পতিতপাবন মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ আছে যে, জনৈক মুসলমান জগন্নাথদেব দর্শন করিতে যায়; কিন্তু পাণ্ডাগণ তাহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় না। তখন সে দুঃখিতচিত্তে

মন্দিরের পাদদেশে পথোপরি পতিত থাকে। তখন শ্রীভগবান্ তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সোপানের পাদদেশে আসিয়া জগন্নাথের মূর্ত্তিতে দেখা দেন। এই মূর্ত্তি পথ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে আনন্দ বাজার রহিয়াছে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর হইতে এই মন্দিরের দূরত্ব প্রায় এক মাইল হইবে। এই শ্রীমন্দির চারি অংশে বিভক্ত। পূর্ব্বদিকে ভোগমণ্ডপ, তাহার পশ্চিমে মোহন, মোহনের সম্মুখভাগে নাটমন্দির ও সর্ব্বপশ্চিমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূল মন্দির। মন্দিরের চূড়ার উপর বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজা রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৯২ ফিট্; কলিকাতা মনুমেণ্ট অপেক্ষা ইহা অনেক উচ্চ। ভোগমণ্ডপের দ্বারের উপর সুন্দর নবগ্রহের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই স্থানে জগন্নাথদেবের ভোগ উৎসর্গ করা হয়। এখানে দেবতার ভোগ থাকে বলিয়া যাত্রিগণকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহার বহির্ভাগে প্রাচীর গাত্রে উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য আছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি এরূপ অশ্লীল প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে যে, তৎসমুদয় সন্দর্শনে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। ইহার পশ্চিমে মোহন। ইহার প্রাচীরে বহু দেব মূর্ত্তি ও শ্রীহরির শেষনাগোপরি মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। মোহনের সম্মুখে নাটমন্দির। এই স্থানে গরুড়স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরি গরুড় বদ্ধহস্তে উপবিষ্ট। এখান হইতে জগন্নাথদেবকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নাটমন্দিরের পশ্চিমভাগে মূল

মন্দিব। মন্দির মধ্যে দিবসেও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগের হস্ত ধরিয়া তবে রত্নবেদী সমীপে লইয়া যায়। রত্নবেদীর দুইপার্শ্বে দুই প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। কথিত আছে যে, লক্ষ শালগ্রাম শিলোপরি এই রত্নবেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। রত্নবেদীর উপর শালগ্রাম শিলায় জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম একসারে পূর্ব্বমুখে বসান আছে। জগন্নাথ দেবের পার্শ্বে লম্বাকৃতি সুদর্শন-চক্র বিদ্যমান। সকলেরই ললাটদেশ উজ্জ্বল মাণিক্যে সুশোভিত। এই মূর্ত্তিত্রয়ের সম্মুখে সুবর্ণময় লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি, রৌপ্যময় বিশ্বধাত্রীর মূর্ত্তি ও পিত্তলের মাধবমূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে। তদ্ভিন্ন অপরাপর অনেক মূর্ত্তি দেখিলাম। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা ব্যতীত অন্য কোনও উৎসবে বাহিরে আনীত হয় না। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় গোলাকৃতি। হস্তে অঙ্গুলি নাই এবং চরণ আদৌ নাই। উদর বস্ত্রাধিক্যহেতু প্রকাণ্ড দেখায়। বলরামের আকৃতি জগন্নাথদেবের ন্যায়, তবে উহার রং শ্বেতবর্ণ। সুভদ্রা দেবীর হস্তপদ কিছুই নাই, কেবল মাত্র মুখখানি দেখা যাইতেছে। প্রবাদ প্রচলিত যে, সমুদ্রের ভয়ে সুভদ্রার উদরমধ্যে হস্তপদ প্রবেশ করিয়াছে।

দিবসের বিভিন্ন সময়ে দেবমূর্ত্তির বিভিন্ন প্রকার বেশ ও নিত্যপূজা, দৈনিক ভোগ ইত্যাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়। সর্ব্বপ্রথমে জাগরণ, তখন দুন্দুভিধ্বনি ও মঙ্গল আরতি হইয়া শৃঙ্গার বেশ হয়। তৎপরে দন্তকাষ্ঠপ্রদান ও বস্ত্রপরিধান, তখন

মূর্ত্তি তিনটীকে নব বস্ত্র পরিধান করান হয়। তারপর বালভোগ প্রদত্ত হয়। বালভোগে খই, নারিকেল, নবনী ও দধি দেওয়া হয়। বেলা ১০টার সময় সকালভোগ, ইহাতে খেচরান্ন ও পিষ্টক থাকে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় অন্নব্যঞ্জন সহ ভোগ প্রদত্ত হয়। ইহাই প্রধান ভোগ, ইহার পর আরতি হইয়া বেলা চারি ঘটিকা যাবৎ দ্বার রুদ্ধ থাকে। তারপর বেলা ৪টার সময় দুন্দুভিধ্বনিতে জগন্নাথদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জিলাপি ভোগ দেওয়া হয়। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে চন্দন-শৃঙ্গার বেশ হয়। সন্ধ্যাকালে মতিচুর, গজা ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সান্ধ্যভোগ প্রদত্ত হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরে বড়-শৃঙ্গার বেশ হইলে বহুবিধ দ্রব্য সহকারে বড়-শৃঙ্গার ভোগ হইয়া থাকে। এই সময়ে রাজপ্রাসাদ হইতে এক প্রকার মিষ্টান্ন আসে, তাহা দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। তাহার নাম গোপালবল্লভভোগ ও উহা আনন্দ বাজারে বেশী মূল্যে বিক্রীত হয়। জগন্নাথদেবের উদ্দেশে যে কোনও ভোগ দেওয়া হয়, তাহাকে মহাপ্রসাদ বলে। রাজপ্রাসাদ হইতে আনীত গোপালবল্লভভোগ ভিন্ন অন্য সমস্ত ভোগই মন্দিরে প্রস্তুত হয়। প্রায় সমুদয় যাত্রিগণ এই ভোগান্ন ভক্ষণ করে। সেই ভোগ আনন্দবাজারে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। এস্থানে জাতিভেদ নাই। সকলেই মহাপ্রসাদ মুখে দিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না। মহাপ্রসাদ দুইপ্রকার—কাঁচা ও শুষ্ক। প্রত্যহ আহারের জন্য কাঁচা প্রসাদ ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক মহাপ্রসাদ ঠিক চাউলের ন্যায়;

যাত্রিগণ উহা তাহাদের স্বদেশে লইয়া যায়। তীর্থোদক ও বহ্নি যেমন কখনও অপবিত্র হয় না, তদ্রূপ মহাপ্রসাদ কোনরূপেই অশুদ্ধ হয় না। ইহা ভক্ষণ করিলে সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় হয়। জগন্নাথদেবের ও সুভদ্রা দেবীর ভোগ সাধারণ তণ্ডুলে প্রস্তুত হয়, কিন্তু বলরামের ভোগ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে হইয়া থাকে।

জগন্নাথদেবের বার মাসে প্রায় ২৪টী উৎসব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা ও দোলযাত্রাতেই বহুলোকের সমাগম হয়। এই প্রধান উৎসবত্রয়ের মধ্যে রথযাত্রাকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাত্রি আগমন করে। তখন এখানে প্রায় ২০০০০০ যাত্রী উপস্থিত হয়। ইহার কারণ এই, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নর নারীর বিশ্বাস যে রথে জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করিলে পুনরায় আর ইহ জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" আমাদের মনই ভগবান্ লাভের প্রধান উপায়। জগতে লোকের মোক্ষলাভ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে এইরূপ বিবৃত আছে—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্;
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

আমাদের দেহরূপ রথে বুদ্ধিরূপ সারথি দ্বারা মনরূপ লাগাম সাহায্যে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে বিষয়ব্যাপাররূপ বিপথ হইতে

বিনিবৃত্ত করিয়া আত্মারূপ ভগবান্‌কে দেখিতে হইবে। তবেই জীবের পুনর্জন্ম হইবে না।

এক্ষণে রথযাত্রার বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিব। আষাঢ় মাসে শুক্লাদ্বিতীয়াতে রথযাত্রা হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর রথযাত্রোপলক্ষে তিনখানি রথ প্রস্তুত হয়। উহা কলিকাতা বা মহেশবল্লভপুরের রথের ন্যায় নহে, উহা একচূড় রথ। জগন্নাথ-দেবের রথ বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর রথ অপেক্ষা উচ্চ। জগন্নাথ দেবের রথের চূড়ায় চক্র ও গরুড়পক্ষীর মূর্ত্তি থাকে, সেজন্য ইহাকে চক্রধ্বজ বা গরুড়ধ্বজ কহে। সিংহদ্বারের সম্মুখে সুসজ্জিত রথত্রয় স্থাপিত হয়। জগন্নাথদেবের ও বলরামদেবের কোমরে রেশমের রজ্জু বাঁধিয়া তাহাদিগকে রথে উত্তোলিত করা হয়। সুভদ্রাদেবীকে ও সুদর্শনচক্রকে পাণ্ডা মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক আনয়ন করে। সুদর্শন চক্র জগন্নাথদেবের রথেই স্থাপিত হয়। বামনদেবকে যখন রথে উত্তোলিত করা হয়, তখন পাণ্ডার সাহায্যে সৌভাগ্যক্রমে আমি রেশমের দড়ি ধরিয়া জগন্নাথদেবকে রথে তুলিয়া দিয়াছিলাম। এই সময় বিগ্রহত্রয়ের ফটো বা প্রতিকৃতি লইবার বিশেষ সুবিধা হয়। আমার সঙ্গে হ্যাণ্ড ক্যামেরা থাকায় আমি দেবগণের প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া লই। এই দুই লক্ষ লোকের জনতামধ্যে কোনরূপ কষ্টভোগ না করিয়া জগন্নাথদেবকে যে রথোপরি উত্তোলিত করিবার কালে সহায়তা করিতে পারিলাম, তাহা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল বলিতে হইবে। তখন মনোমধ্যে এমন এক ভাবের উদয় হইল

যে, উহা প্রকাশ করিতে লেখনীর শক্তি নাই ও ভাষা সেখানে নীরব। সত্যই উহা অনুভব করিবার, প্রকাশ করিবার নহে।

মূর্ত্তিত্রয় রথোপরি স্থাপিত হইলে তাঁহাদিগের রাজশৃঙ্গার বেশ হয়। তৎকালে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে সুবর্ণময় হস্তপদাদি দ্বারা সুশোভিত করা হয়। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে পুরীর রাজা অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজবেশে তথায় আগমনপূর্ব্বক নগ্নপদে মুক্তাখচিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথের সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া দেবপূজান্তে রথরজ্জু ধারণকরতঃ সর্ব্বাগ্রে রথের টান আরম্ভ করেন। তৎপরে পাণ্ডাগণ ও যাত্রী সকল রথ টানিতে থাকে। এই সময় এত অধিক যাত্রীর সমাগম হয় যে, তাহাদিগের মধ্যে বিসূচিকাদি উৎকট সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়। অধিক যাত্রী আসিবার কারণ যে, শ্রীমন্দিরাভ্যন্তর এত অন্ধকার যে ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিগণ জগন্নাথদেবের সুস্পষ্ট মূরতি তথায় দেখিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং রথে বামনদেবের দর্শনলাভ বিশেষ সুবিধাজনক হয়। রথযাত্রাকালে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয় না। তখন যাত্রীবর্গ ফলাদি আহার করিয়াথাকে। রথ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে গমন করিয়া তথায় নবমী পর্য্যন্ত থাকিয়া দশমীর দিন পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

গুণ্ডিচা-বাঁড়ী যেন এক বাগান বাড়ী ; উহার চতুঃপার্শ্বেই আম্র ও নানাবিধ বৃক্ষ দণ্ডায়মান। পুরাণাদিতেও গুণ্ডিচা-বাড়ীর

কথা উল্লিখিত আছে। এই বাড়ী জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় গঠিত। এখানেও রত্নবেদী, রন্ধনশালা, গরুড়স্তম্ভ প্রভৃতি সমুদয়ই আছে। ইহাও চারিভাগে বিভক্ত—(১) মূলমন্দির, (২) মোহন, (৩) নাটমন্দির, ও (৪) ভোগমণ্ডপ। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। প্রাচীরের পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার ও উত্তরভাগে বিজয়-দ্বার। এস্থানে জগন্নাথদেবকে আনিবার কালে সিংহদ্বার দিয়া আনা হয় ও এস্থান হইতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাগমনকালে বিজয়দ্বার দিয়া বাহির করা হয়। জগন্নাথদেব গুণ্ডিচাতে গমন করিলে লক্ষ্মী-দেবী পঞ্চমীর দিন তথায় গমন করেন এবং সেই দিবসেই প্রত্যাগমন করেন। এই উৎসবকে হরপঞ্চমা কহে। রথের সময় শ্রীক্ষেত্রের রাজপথ ধ্বজপতাকা দ্বারা পরিশোভিত করা হয়। এই সময় বাসাভাড়া বড় বেশী লাগে।

স্নানযাত্রাকালে মন্দিরস্থ ঈশানকোণে স্নানবেদীর উপরি মূর্ত্তিত্রয়কে স্থাপিত করিয়া রোহিণীকুণ্ডের জল দ্বারা স্নান করান হয়। স্নানের পর শৃঙ্গার বেশ হয়। তৎপরে মোহনের পার্শ্বে এক প্রকোষ্ঠে পঞ্চদশ দিবস অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহাদের জ্বর হইয়া থাকে। তখন পাকশালা ও মন্দিরদ্বার রুদ্ধ থাকে। এই সময় কোন যাত্রী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে পায় না। এই স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উৎসব ব্যতীত অন্য কোনও উৎসবে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি বাহিরে আনীত হয় না। অন্যান্য উৎসবে তাঁহার মদনমোহন নামক মূর্ত্তি দ্বারা উৎসব ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত নবকলেবর নামক আর এক

উৎসব হইয়া থাকে। তখন জগন্নাথদেবের জীর্ণদেহের পরিবর্ত্তে নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। পাণ্ডাপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, এই নবকলেবর উৎসব সাত বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে; কিন্তু শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

"বর্ষাণাং শততো বাপি তদর্দ্ধং বা নৃপোত্তম।
আবির্ভাবতিরোভাবৌ ভবিষ্যতো হরেঃ কলৌ॥
বর্ষবিংশতিতো বাপি পঞ্চবিংশাতিতশ্চ বা।
জীর্য্যতাং দারুদেহানাং দেবানাং ঘটনা ভবেৎ॥"

একশত বৎসরেই হউক বা পঞ্চাশ বৎসরেই হউক কলিযুগে শ্রীহরির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে। আর বিশ বৎসরেই হউক অথবা পঁচিশ বৎসরেই হউক জীর্ণ দারুমূর্ত্তির পুনর্নির্ম্মাণ হয়।

পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে এস্থানে আট্‌কে বাঁধিতে বলে। আট্‌কে বন্ধন করিতে হইলে পাণ্ডাহস্তে অর্থ সমর্পণ না করিয়া যথারীতি লেখাপড়া করা আবশ্যক। যিনি যত টাকা দান করিবে সেই টাকার সুদ হইতে তাহার নামে ভগবদুদ্দেশে ভোগ দেওয়া হইবে। সাত রকম আট্‌কে বন্ধন আছে। এক শত টাকার কম আটকে বন্ধন হয় না। টাকার কম বেশে ভোগের তারতম্য হইয়া থাকে। ৪০৲।৫০৲ টাকায় আটকে বন্ধন হয় না। এক শত টাকার কমে যাহারা আটকে বাঁধিয়া আসেন, তাহারা পাণ্ডা কর্ত্তৃক প্রতারিত হয় জানিবেন।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের পশ্চিমকোণে বিমলাদেবীর ও

লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে। বিমলাদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ ও মোহন আছে। মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরময় দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। যে স্থানে দেবী রহিয়াছেন, সে স্থান বড় অন্ধকার! কেহ কেহ বলেন যে, ইনিই পুরীধামের আদ্যাশক্তি ও জগন্নাথদেব তাঁহার ভৈরব। এখানে মহাষ্টমীর দিন গভীর নিশীথে এক ছাগবলি হয়। এই স্থান ভিন্ন শ্রীক্ষেত্রের আর কোথাও বলি হয় না। তৎপরে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী বিশেষ প্রশংসনীয়। জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় ইহা চারি ভাগে বিভক্ত। লক্ষ্মীদেবীর পৃথক্ পাকশালা আছে; তাহাতে সাধারণ সকল বিগ্রহের ভোগ প্রস্তুত হয়। লক্ষ্মী-দেবীর মন্দিরের পশ্চিমভাগে সর্ব্বমঙ্গলা কালীমূর্ত্তি আছেন। মূল মন্দিরের পার্শ্বেই রোহিণীকুণ্ড অবস্থিত।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের অগ্নিকোণে বদরিনারায়ণের মূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণের মন্দির, সূর্য্যনারায়ণের মন্দির ও পাতালেশ্বর রহিয়াছেন। ঈশানকোণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্ত্তি ও তাহার পশ্চিমে অক্ষয়বট বা কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে। বটের মূলদেশে মঙ্গলাদেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। মঙ্গলাদেবীর দর্শনলাভ করিলে মানবের মোহ দূরীভূত হয়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকেই অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরগাত্রে বামন-অবতার, কল্কি-অবতার, নৃসিংহদেব ও অন্যান্য অনেক প্রস্তরময় বিগ্রহ আছে। হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড় অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া

দিয়াছে। সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে ভেটমণ্ডপ পাওয়া যায়। জগন্নাথদেব রথযাত্রাকালে যখন গুণ্ডিচাবাড়ীতে গমন করেন, তখন লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে এখানে আসিয়া থাকেন।

পুরীর মন্দির ব্যতীত অনেক দেখিবার স্থান আছে। এখানে মার্কণ্ডেয়-হ্রদ বা পুষ্করিণী এক পুণ্যতীর্থ। ইহা অতি প্রাচীন এবং পঞ্চতীর্থের অন্যতম। পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে মার্কণ্ডেয় ঋষির মন্দির আছে। কথিত আছে, মার্কণ্ডেয় ঋষি এস্থানে তপস্যা করেন। সরোবরের পূর্ব্বতীরে বটবৃক্ষতলে কালীয়সর্পের উপর মুরলীহস্তে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। এই সরোবরে স্নান করিয়া বটকৃষ্ণকে দর্শন করিতে হয়। পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে স্নানকালীন এই মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকে,—

"মার্কণ্ডে চ বটে কৃষ্ণঃ রোহিণীঞ্চ মহোদধিম্।
ইন্দ্রদমনে সরঃস্থানং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

সরোবরের দক্ষিণতীরে মার্কণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নগরের এক নিভৃত অংশে অবস্থিত। জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে ইহা প্রায় ২ মাইল দূর হইবে। ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞে বহুশত গাভী বিপ্রবর্গকে বিতরণ করেন; সেই সকল গাভীর খুরাঘাতে এই স্থানে গর্ত্ত হইলে উহা সরোবরে পরিণত হয়। পৌরাণিক

মত যে, কেহ এই স্থানে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিবে। এই সরোবরে অনেক কচ্ছপ দেখিলাম। এই সকল কচ্ছপ সম্বন্ধে এক জনপ্রবাদ আছে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক এই সকল কীর্ত্তিকলাপ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার সকল প্রযত্নই প্রনষ্ট হইবে। এই নিমিত্ত তিনি জগন্নাথদেবের নিকট স্বীয় বংশলোপ প্রার্থনা করেন। জগন্নাথদেব তাহাকে এই বর দেন যে, তোমার সন্ততিগণ এই সরোবর মধ্যে কচ্ছপ হইয়া বিচরণ করিবে ও অমর হইয়া থাকিবে। যাত্রিগণ খই মুড়কি দিলেই উহারা নির্ভয়ে ভক্ষণ করে। এই সরোবরের দক্ষিণদিকের সোপানোপরি নৃসিংহদেবের মন্দির ও পশ্চিমদিকে নীলকণ্ঠদেব রহিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে যে আটটী প্রধান শিবলিঙ্গ আছেন, নীলকণ্ঠদেব তাঁহাদের অন্যতম। উৎকলখণ্ডে অষ্টলিঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,——

"কপালমোচনং নাম ক্ষেত্রপালং যমেশ্বরম্
মার্কণ্ডেয়ং তথেশানং বিশ্বেশং নীলকণ্ঠকম্
বটমূলে বটেশঞ্চ লিঙ্গানষ্টৌ মহেশ তু ॥"

নরেন্দ্র সরোবর—ইহা শ্রীমন্দির হইতে ক্রোশার্দ্ধপথে অবস্থিত। পুরীর মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট সরোবর। এই প্রকাণ্ড সরোবরের চারিধার ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত। যাত্রিগণ এই সরোবরের জল পান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে একমন্দির আছে। বৈশাখ মাসে এস্থানে চন্দনযাত্রা নামক এক মেলা হয়। এই সরোবরে

কুম্ভীর আছে শুনিলাম। যাত্রিগণ অতি সাবধানে স্নান করিয়া থাকে।

শ্বেতগঙ্গা——ইহা শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটে অবাস্থিত। এই সরোবর সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। অনেকগুলি সোপান অবতরণ করিলে তবে জল পাওয়া যায়। জলের রং সবুজবর্ণ ও দুর্গন্ধময়। যাত্রিগণ ইহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া এখানে স্নান করে। শ্বেতগঙ্গার তীরে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধব নামক মূর্ত্তিদ্বয় বিদ্যমান আছে।

যমেশ্বর মহাদেব শ্রীমন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে আছেন। উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, মহাদেব এখানে যমের সংযম নষ্ট করিয়া দেন। এই শিবলিঙ্গের পূজা করিলে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

যমেশ্বর-মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমভাগে অলাবুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। অপুত্রক ব্যক্তি এই মহাদেবের পূজা করিলে গুণবান্ পুত্র লাভ করে। ইহার অতি সন্নিকটে কপাল-মোচন তীর্থ বর্ত্তমান। এই তীর্থদর্শনে জীবের অনন্ত পুণ্য সঞ্চিত হয়।

অষ্টাদশ নালা সেতু—ইহা নরেন্দ্র-সরোবর সন্নিকটে অবস্থিত। এই সেতুনির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মধুপুরী নদীর উপরি সেতুনির্ম্মাণকালে নদীর খরস্রোতে উক্ত সেতু পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তিনি নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রীত্যর্থ

আপনার অষ্টাদশ পুত্রকে বলি দিয়া এই অষ্টাদশখিলানযুক্ত সেতু নির্ম্মাণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, রাজা মৎস্যকেশরী নদীপারের সুবিধার্থ ইহা প্রস্তুত করেন। বৈষ্ণবগণ বলেন যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুরীধামে আগমন করেন, তখন খরস্রোতা নদী পার হইতে না পারিয়া এস্থানে অবস্থান করেন। জগন্নাথদেব তাঁহার প্রতি দয়ালু হইয়া বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত করান। এই সেতুর গঠনপ্রণালী অতি চমৎকার। পূর্ব্বকালে যখন যাত্রিগণ পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিত, তখন তাহাদিগকে এই সেতু পার হইতে হইত।

আঠারনালা হইতে কিয়দ্দূরে লক্ষ্মীর জলা। এখানে নদীর জল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জমী অত্যন্ত উর্ব্বরা এবং প্রায় বার মাসেই ফসল ফলিয়া থাকে। তজ্জন্য স্থানীয় জনসাধারণের এই বিশ্বাস যে, লক্ষ্মী নিয়ত এস্থানে বাস করেন।

জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে লোকনাথের মন্দির। অন্ধকারময় এক কক্ষে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। লিঙ্গ মূর্ত্তিটী সর্ব্বদাই জলে নিমজ্জিত আছে। মন্দিরপ্রবেশপথে এক পুষ্করিণী আছে। উক্ত পুষ্করিণীর সহিত পাঠস্থানের নিম্নস্থ এক কৃত্রিম জলের উৎস যুক্ত আছে। শিবরাত্রির দিন উক্ত উৎস বন্ধ করিলে শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। এই বিগ্রহকে উড়িষ্যাবাসিগণ অত্যন্ত ভয় করে। তাহারা জগন্নাথের নামে দিব্য করিবে, কিন্তু লোকনাথের নামে দিব্য করিতে সাহস করে না।

ইঁনি পুরীধামের জাগ্রৎ দেবতা। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, শ্রীরামচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন।

চক্রতীর্থ—ইহা সমুদ্রতীরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। পাণ্ডাগণ বলে যে, এই স্থানে শ্রীমূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ সর্ব্বপ্রথমে দারু বৃক্ষ ভাসিয়া আসে। এই সরোবরের জল সুমিষ্ট। যাত্রিগণ এখানে শ্রাদ্ধাদি করে ও বালুকার পিণ্ড দিযা থাকে। ইহার নিকটে চক্রনারায়ণের মন্দির ও আর এক স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ হনুমান রহিয়াছে।

চক্রতীর্থে যাইবার পথে সিদ্ধবকুল বৃক্ষ আছে। ইহা অতি প্রাচীন ও আশ্চর্য্যজনক বৃক্ষ। বৃক্ষটী তলদেশ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত অন্তসারশূন্য। কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্য, হরিদাস বৈষ্ণব প্রভৃতি এই বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একবার রথনির্ম্মাণার্থ কাষ্ঠের অভাব হওয়াতে পুরার রাজা এই বৃক্ষ ছেদনপূর্ব্বক রথনির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। এই নিদারুণ আদেশ শ্রবণে ভক্তগণ রোদন করিতে করিতে জগন্নাথ মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন। পরে যখন ছেদকগণ উক্ত বৃক্ষ ছেদন করিতে আসিল, তখন সকলে দেখিল যে, বৃক্ষটী সারশূন্য অবস্থায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থানে শ্রীচৈতন্য দেবের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

এই সিদ্ধবকুলের অনতিদূরেই তেটা-গোপীনাথের মন্দির। বৈষ্ণবগণের নিকট ইহা এক মহাতীর্থ। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দির হইতে অন্তর্হিত হন।

স্বর্গদ্বার—ইহা সমুদ্রের বেলা ভূমিতে অবস্থিত। এই স্থানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় ব্রহ্মা দেবমূর্ত্তি গঠনার্থ সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হন। এখানে অনেক মন্দির ও মঠ আছে। এইস্থানে শ্রীশঙ্কর প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন মঠ বিদ্যমান। এই মঠে শঙ্করাচার্য্যের এক প্রস্তরময় মূর্ত্তি রহিয়াছে। এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এই স্বর্গদ্বারে এক কানপাতা হনুমান্ আছে। সমুদ্রের গর্জ্জনে সুভদ্রা ভীতা হইলে তাহার উদরমধ্যে হস্তপদ প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে জগন্নাথদেব সমুদ্রকে বলেন যে, তোমার গর্জ্জন আমার মন্দিরে যেন না শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি হনুমান্‌কে পাহারা দিবার জন্য এস্থানে অবস্থান করিতে বলেন। হনুমান্ সেজন্য কান পাতিয়া সমুদ্রের রব শুনিতেছে ও যাহাতে ঐ শব্দ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহারি জন্য সতর্ক রহিয়াছে।

স্বর্গদ্বারের অনতিদূরেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত যবনকুলোদ্ভুত হরিদাস বাবাজীর সমাধিমন্দির আছে। ইহা বৈষ্ণবগণের এক তীর্থস্থল। মন্দিরে অনেক বিগ্রহ বিদ্যমান।

পুরীতে শ্রীমন্দির ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান ব্যতীত আর একটী প্রধান দেখিবার জিনিষ আছে—তাহা সমুদ্র। এই সমুদ্রের দৃশ্য অতি চমৎকার। সাগরের প্রশান্ত ও গম্ভীরমূর্ত্তি সন্দর্শনে মনে হয় যেন নারায়ণ অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। অনন্ত আকাশের সহিত অনন্ত জলরাশি মিলিত হইয়াছে। সমুদ্রের নীলবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের

উদ্রেক হয়। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বেলাভূমিতে আঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। সমুদ্রের কি ভীষণ গর্জ্জন! বহুদূর হইতে ঐ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। সমুদ্রের এই অপূর্ব্ব লীলা সন্দর্শনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। তাঁহার মনে উদয় হয় যে, এই সমুদ্রই নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি। এই জ্ঞান তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইলে তিনি সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতে যান। সমুদ্রতীর সূর্য্যোদয় দেখিবার এক উপযুক্ত স্থল। প্রভাতে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইলাম। প্রথমে পূর্ব্বাকাশ ঈষদ্ রক্তিমাভা ধারণ করিল, পরে সূর্য্যদেবের রশ্মি অল্প অল্প দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে গোলাকার দেহখানির অল্পপরিমাণ নয়নগোচর হইল। তারপর যেন সূর্য্যদেব লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আকাশমার্গে স্পষ্টভাবে দেখা দিলেন। এই দৃশ্য দেখিতে কি চমৎকার! তারপর সমুদ্রসলিলে স্নান করিলাম। সমুদ্রজল এত লবণাক্ত যে উহাতে স্নান করিলে গাত্রে আঠা লাগার ন্যায় বোধ হয়। সেজন্য পুনরায় পরিষ্কার জলে স্নান করিতে হয়। সমুদ্রসলিলে স্নান করিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। পক্ষাঘাতপ্রাপ্ত রোগিগণ প্রভৃতি এস্থানে প্রত্যহ স্নান করিলে আরোগ্য লাভ করে।

বৈকালে সূর্য্যাস্ত দেখিতে যাইলাম। সূর্য্যদেবের লালবর্ণদেহ যেন নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইল। প্রান্তরমধ্যে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ইহার সহিত উপমিত হইতে পারে না। সমুদ্রতীরে বালুকাময় ভূমি অতি বিস্তীর্ণ। বালুকারাশি

দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রসারিত। সমুদ্রতটে ঝিনুক প্রভৃতি নানাবিধ সামুদ্রিক দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। এখানে ধীবরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় মৎস্য ধরিতেছে দেখিলাম। যাত্রিগণ সমুদ্রতরঙ্গে দুই একটী পয়সা নিক্ষেপ করিলে কতকগুলি ইতরশ্রেণীর বালক সেই সকল পয়সা তরঙ্গ হইতে কুড়াইয়া লইতেছে। যাত্রিবর্গ পঞ্চরত্ন প্রদানপূর্ব্বক সমুদ্রস্নান করে।

পৌরাণিক গ্রন্থে জগন্নাথদেবের উৎপত্তি বিষয়ক বিবিধ বিবরণ বিবৃত আছে। এই সকল ইতিবৃত্তের মধ্যে নিম্নোক্ত বিবরণ সমধিক প্রচলিত। পুরাকালে উজ্জয়িনী নগরীতে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক এক পরম বৈষ্ণব নরপতি ছিলেন। তিনি কোন্ তীর্থে গমন করিলে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা শ্রীহরির দর্শনলাভ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন বহুতীর্থ ভ্রমণকারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ! আপনি পুরুষোত্তম-তীর্থে গমন করুন।" তখন তিনি পুরুষোত্তমে গমনপূর্ব্বক অশ্বমেধযজ্ঞ করেন এবং এক মন্দির নির্ম্মাণ করান; কিন্তু মন্দিরমধ্যে কোন্ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি দিবানিশি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে এক গভীর রজনীতে স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলেন, "কল্য প্রাতে সমুদ্রতীরে গমন করিয়া এক বৃক্ষ দেখিবে ও তদ্দ্বারা আমার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া মন্দির মধ্যে স্থাপিত করিবে।" পরদিন রাজা তথায় যাইয়া এক অপূর্ব্ব মহাবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। যখন তিনি ঐ বৃক্ষ ছেদন

করিতেছিলেন, তখন এক বৃদ্ধবিপ্রের বেশ ধরিয়া বিশ্বকর্ম্মা তথায় আগমনপূর্ব্বক রাজাকে বৃক্ষচ্ছেদনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণকে বলেন যে, এই বৃক্ষ দ্বারা আমি বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিব। তখন ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্ম্মা রাজাকে বলেন, "রাজন্! আমি আপনার অভিলষিত দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়া দিব।" ইহাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণকে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে কতদিন সময় লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তর করেন, "আমি তিন সপ্তাহ মধ্যে শ্রীমূর্ত্তিগঠন করিব; কিন্তু এই তিন সপ্তাহকাল মন্দিরদ্বার রুদ্ধ থাকিবে। যদি কেহ দ্বারোদ্‌ঘাটন করে; তবে তৎক্ষণাৎ আমি চলিয়া যাইব।" রাজা ইহাতে স্বীকৃত হন। পরে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইলে রাজা তাঁহার প্রধানা মহিষীর অনুরোধে মন্ত্রিগণ সহ মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখেন যে, তথায় জনপ্রাণী নাই, কেবলমাত্র সিংহাসনোপরি দারুমূর্ত্তি রহিয়াছেন। তাহার হস্তপদাদি কিছুই হয় নাই। এতদ্দৃষ্টে নৃপতি অতি দুঃখিতচিত্তে প্রায়োপবেশনে রহিলেন। তখন জগন্নাথদেব রাজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া গভীর নিশীথে রাজাকে দর্শন দেন এবং বলেন যে কলিযুগে আমি হস্তপদবিহীন হইয়া বিরাজ করিব। হস্তপদাদি-সংযুক্ত মনুষ্য কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, কিন্তু শ্রীহরি নিষ্ক্রীয়। তিনি মানবগণকে কার্য্য করিতে বলিতেছেন এবং যে যেমন কার্য্য করিবে, সে তেমন ফলভোগ করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার পূজাপদ্ধতি সমস্তই জানিয়া লইলেন।

জগন্নাথ বুদ্ধ-অবতার এইরূপ এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই ত্রিমূর্ত্তিকে বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ বলে। বৌদ্ধেরা ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপ বলে। তাহারা বলে যে, বুদ্ধদেবের অস্থি জগন্নাথদেবের উদরে রক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ গভীর গবেষণার পর এই প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কার করেন যে, পুরাকালে ইহা বৌদ্ধতীর্থ স্থান ছিল; পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারত হইতে লুপ্তপ্রায় হইতেছিল, তখন জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং বৌদ্ধদিগের ত্রিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে হিন্দুগণ কর্তৃক জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার নামকরণ হইল। তথাপি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব একেবারেই অন্তর্হিত হইল না। তাহাদের উদারনীতি অবলম্বনে এখানে কি ধনী, কি নির্ধন, কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রাহ্মণেতর সকলেই জাতিভেদের সংকীর্ণতাদোষ হইতে বিমুক্ত। এখানকার মূলমন্ত্র প্রীতি ও একতা। যাহা হউক, এই জগন্নাথদেব শ্রীবিষ্ণুই হউন, অথবা বুদ্ধ-অবতারই হউন, সেই ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই নহেন। তাঁহার শ্রীচরণকমলে আমাদের অনন্যা ভক্তি প্রার্থনীয়া।

পুরীধামের জলবায়ু তেমন স্বাস্থ্যকর নহে। কেবল সমুদ্রতট-প্রদেশ বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। সরকার বাহাদুরের আফিস, আদালত ইত্যাদি কার্য্যস্থল সকল সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানে এক কূপ আছে, তাহার নাম কাছারি-কূয়া। ইহার জলই জনসাধারণ ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে যাত্রিগণের ব্যবহারোপযোগী বহুবিধ বাসা আছে; তাহাদের অধিকাংশই বংশনির্ম্মিত।

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুগণের অনেক দেবদেবীর বিগ্রহ বিধ্বস্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবাবের সেনাপতি হিন্দুদ্বেষী কালাপাহাড় নানা স্থানের দেব-দেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করে। তাহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবকে চিল্কাহ্রদে লুক্কায়িত রাখে। কালাপাহাড় পুরীর অনেক বিগ্রহের হস্তপদাদি ছিন্ন করিয়া অনেক অনুসন্ধানে চিল্কাহ্রদে জগন্নাথদেব গুপ্ত আছেন জানিতে পারে। তখন কালাপাহাড় তথা হইতে শ্রীবিগ্রহকে বঙ্গদেশে আনয়নপূর্ব্বক দাহ করিতে লাগিল। যখন জগন্নাথ-দেবকে বঙ্গদেশে আনা হইতেছিল, তখন শ্রীমন্দিরের প্রধান পাণ্ডা কালাপাহাড়ের সহিত ছদ্মবেশে আসে। দারুমূর্ত্তি অর্দ্ধদগ্ধ হইলে কালাপাহাড়ের মৃত্যু হয়। ইত্যবসরে পাণ্ডা সেই অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তি ও তন্মধ্যস্থ ব্রহ্মমণি লইয়া পলায়ন করে। পরে এক নির্জ্জন স্থানে উহা সযত্নে স্থাপিত করে। এইরূপে বিশবৎসর গত হইলে খুরদার রাজা ব্রহ্মমণি আনয়ন করিয়া নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা জগন্নাথদেবের নবকলেবর নির্ম্মিত করেন।

পুরীধামে গমন করিলে প্রায় সকলেই সাক্ষীগোপালদেবকে দেখিয়া আসে। ইহা পুরী হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। পুরী হইতে রেলগাড়ীতে যাইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে এই স্থানে পঁহুছিতে পারা যায়। আমরা পুরী হইতে গোযানে তথায় গমন করি। অতি প্রত্যুষে যাত্রারম্ভ করিয়া বেলা ১১টার সময় তথায় উপস্থিত হইলাম। সত্যবাদী নামক গ্রামে এই

মন্দির অবস্থাপিত। গুপ্তবৃন্দাবন নামক এক সুবৃহৎ উদ্যান-মধ্যে সাক্ষীগোপালের মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরের চতুর্দ্দিক এক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাঙ্গণমধ্যে বহুবিধ বৃক্ষ রহিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ও তৎপার্শ্বে শ্রীরাধামূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধূসরবর্ণ প্রস্তরে প্রস্তুত। শ্রীরাধামূর্ত্তি পিত্তলের দেখিলাম। কি সুন্দর সুললিত মূর্ত্তি! দেখিলে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। তৎকালে মনে হয় যেন গোপাল সত্যসত্যই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। এই যুগলমূর্ত্তি সন্দর্শনে মনে হয় যে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছি। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, জগন্নাথদেবদর্শন করিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন না করিলে সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হয়। সে কারণে পুরীধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত যাত্রিবৃন্দ এখানে আসিয়া থাকে।

জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায় এস্থানে অন্নভোগ হয় না। প্রত্যহ ইহার সাতবার মিষ্টান্ন ভোগ হয়; তখন খইচুর প্রভৃতি মিষ্টান্ন দ্বারা ভোগ প্রদত্ত হয়। প্রতিদিন ইহার সাতবার শৃঙ্গার বেশ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে সাক্ষীগোপাল সম্বন্ধে এক অতি সুন্দর বিবরণ বিবৃত আছে। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি বৃন্দাবনে ছিল। কি প্রকারে ইহা এখানে আসিল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

পুরাকালে কাঞ্চীপুরের বিদ্যানগরীস্থিত দুইটী ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যাটনে বহির্গত হন। তাঁহারা নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া

শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তাহাদের মধ্যে যিনি বৃদ্ধ বিপ্র তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হয় এবং কনিষ্ঠ বিপ্র প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া বৃদ্ধ বিপ্রকে রোগমুক্ত করেন। বৃদ্ধ বিপ্র পীড়াকালে কনিষ্ঠের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন, "তুমি পুত্র অপেক্ষা আমার সেবা করিতেছ, যদি ভগবৎকৃপায় আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারি, তো স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব।" ইহা শুনিয়া কনিষ্ঠ বিপ্র কহিলেন, "মহাশয়! ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আপনি ধনমানে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপিচ আপনি যদিও স্বীকৃত হন, আপনার আত্মীয় স্বজনগণ কেন স্বীকৃত হইবেন? যদি একান্তই ইহা আপনার অভিমত হয়, তবে গোপালের সমক্ষে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন। গোপাল আমাদের সাক্ষী থাকিবে।" তখন বৃদ্ধ বিপ্র গোপালসন্নিধানে কনিষ্ঠ বিপ্রকে নিজ কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর বৃদ্ধবিপ্র আরোগ্যলাভ করিলে উভয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। বৃদ্ধবিপ্র নিজগৃহে আসিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গকে এই ব্যাপার জানাইলে তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল এবং বলিল যে, এরূপ বাক্য বদন হইতে আর যেন বিনির্গত না হয়। পরে একদিন কনিষ্ঠ বিপ্র সেই বৃদ্ধ বিপ্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বিপ্র সেই কথা গ্রাহ্য করিলেন না, পুনশ্চ বলিলেন, "যদি পীড়ার সময় কোন কথা বলিয়া থাকি তো সে কথা ধর্ত্তব্য নহে।"

বৃদ্ধ বিপ্রের পুত্রগণও আপত্তি করিতে লাগিল, এমন কি, একজন কনিষ্ঠ বিপ্রকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কনিষ্ঠ বিপ্র প্রহারের ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক গ্রামের লোকদিগকে এই কথা বলিলেন। তখন গ্রামের লোক এক সভা করিল। সেই সভায় সকলে সমুপস্থিত হইলে সভাপতি, বৃদ্ধ বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কনিষ্ঠ বিপ্রকে কন্যাদান করিবে বলিয়া বাক্‌দান করিয়া এক্ষণে অস্বীকৃত হইতেছ কেন?" বৃদ্ধ বিপ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহাশয়। কবে কি কহিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই।" বৃদ্ধের পুত্রগণও বলিতে লাগিল, "এই যুবা বিপ্র পিতার ধন দর্শনে লোভপরবশ হইয়া এই মিথ্যা বাক্য কহিতেছে।" এই সকল ব্যাপারে কনিষ্ঠ বিপ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, "স্বয়ং গোবিন্দজী আমার সাক্ষী আছেন।" তখন বৃদ্ধ বিপ্র ও তাঁহার পুত্রগণ বলিলেন, "বেশ, যদি গোপাল এইস্থানে আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবে তুমি আমার জামাতা হইবে।" তাঁহাদের মনে এই ধারণা ছিল যে, কনিষ্ঠ বিপ্র কদাচ সাক্ষী আনিতে সমর্থ হইবে না। কনিষ্ঠ বিপ্র তখন ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। তিনি কয়েকদিবস গোবিন্দজীর সম্মুখে প্রয়োপবেশনে অবস্থান করিলে, একদিন দৈববাণী হইল, "তুমি তোমার স্বদেশে গমন কর, আমি তোমার অনুগমন করিব। তুমি কিন্তু পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আমি আর অগ্রসর হইব না, তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে থাকিয়া যাইব।" তখন কনিষ্ঠ বিপ্র গোপালকে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে

স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে এই সত্যবাদী নামক গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া কনিষ্ঠ বিপ্রের মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদিত হইল এবং যেমন পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, অমনি গোপাল তথায় অবস্থিত হন। তিনি কনিষ্ঠ বিপ্রকে বলেন, "তোমার গ্রামবাসিগণকে এই স্থানে লইয়া আইস, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিব।" তখন যুবা বিপ্র বৃদ্ধ বিপ্র ও অপরাপর লোকদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে তাঁহারা সোৎসাহে সেস্থানে সমাগত হয়। তখন গোপাল সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন, "এই বৃদ্ধ বিপ্র কনিষ্ঠ বিপ্রকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে।" অতঃপর বৃদ্ধ বিপ্র কনিষ্ঠকে জামাতৃপদে বরণ করেন। উৎকলের রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মন্দির নির্ম্মাণকরতঃ পূজার ব্যবস্থা করিয়া ঐ বিপ্রদ্বয়কে পুরোহিত নিযুক্ত করেন। তিনিই, বোধ হয়, গোপালপার্শ্বে শ্রীরাধার মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। সাক্ষীগোপালের অপর এক নাম সত্যবাদী-গোপাল।

যেথায় সাক্ষীগোপালদেব আছেন, তথায় প্রত্যহ বহুলোকের জনতা হয়। এখানকার ঘরগুলি সব খড়ের দ্বারা নির্ম্মিত। এখানে বাজার আদৌ নাই, তবে পথের পার্শ্বে দু'একখানি খাদ্য দ্রব্যের দোকান আছে। ডাব, রম্ভা, নারিকেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নারিকেল ব্যবসার ইহা এক সুপ্রসিদ্ধ স্থান। নানা দেশ হইতে এখানে নারিকেল আনীত হয়। স্থানটী গাছপালায় পরিপূর্ণ, সেজন্য মনোরম। এখানে চুনা

মৎস্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে কেবল উড়িষ্যাবাসী বাস করে, অন্য কোন জাতীয় লোক নাই।

আমরা সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া পুরীতে পুনরাগমন করিলাম। সাক্ষীগোপাল হইতে পুরী-এই পথটীর সর্ব্বত্রই প্রায় শস্যশ্যামল ক্ষেত্র সকল বিদ্যমান আছে।

—:০:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অযোধ্যা।

(১)

ভারতে যে সর্ব্বসমেত সাতটী মোক্ষদায়ক তীর্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে অযোধ্যার নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত। পুরাণাদি গ্রন্থে সেই সপ্ত মুক্তিপ্রদ তীর্থের নাম এই প্রকার বর্ণিত আছে,—"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী-দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর এই সংসারে আসিয়া সাধ্যানুসারে সপ্ত মোক্ষদায়ক তীর্থ পর্য্যটন করা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয়। মহাভারতপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, লোকে সপ্ত মোক্ষপ্রদ তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক যেরূপ ফললাভ করে, বিপুলদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও তদ্রূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না।

সন ১৩২৮ সালের শারদীয়া মহাপূজার পরে এস্থানে আগমন করি। প্রথমে কয়েকদিবস রাঁচিতে অবস্থান করিয়া হাজারিবাগ সহরে এবং তথা হইতে হাজারিবাগ রোড্ ষ্টেশনে আসিয়া রেলযোগে মোগলসরাই জংশনে আসি। তথা হইতে ফয়জাবাদের গাড়ীতে উঠিয়া ফয়জাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করি।

এইস্থান হইতে অযোধ্যা প্রায ৭ মাইল দূবে অবস্থিত। এই দুই ক্রোশ পথ অশ্বযানে যাইলাম। যদিও অযোধ্যা নগবীতে এক ক্ষুদ্র ষ্টেশন আছে, তথাপি প্রায সকল যাত্রী ফযজাবাদ হইতে আগমন করে, কাবণ অযোধ্যা ষ্টেশনে বেলগাডীব যাতাযাত বড কম এবং যাত্রিগণকেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবিতে হয।

অযোধ্যা নগবী পুণ্যতোযা সবযূ নদীব তীবে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই নগবী কোশল নামক এক সুবিস্তীর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ প্রদেশেব অন্তর্গত ছিল। মহর্ষি বাল্মীকিব বামাযণ পাঠে অবগত হওযা যায যে, এই নগবী সূর্য্যবংশীয আদি পুরুষ বৈবস্বত মনু কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা। মনুব পব বহুকাল পর্য্যন্ত অযোধ্যা নগবী সূর্য্যবংশীয নৃপতিবৃন্দেব বাজধানী ছিল। মহর্ষি বাল্মীকিব বামাযণ হইতে তদানীন্তন অযোধ্যা নগরীর বৃত্তান্তপাঠে যে মহিমান্বিতা মহানগবীব সমৃদ্ধ চিত্র মনে পড়ে, বর্ত্তমান অযোধ্যাদর্শনে তাহা আমাদেব নিকট অলীক বলিয়া প্রতীযমান হয। অযোধ্যাব এখন আব সে দিন নাই। এক্ষণে সে শ্রীবামও নাই, আব সে অযোধ্যা পুবীও নাই। জগতেব কার্য্য কবিতে শ্রীবামচন্দ্র আবির্ভূত হন। তাহাব কার্য্য শেষ হইলে তিনি চলিযা গিযাছেন এবং কালবশে এই সমৃদ্ধশালী নগবীব অট্টালিকা সমূহ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইযাছে। শ্রীরাম চন্দ্রেব সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যাবও সকল সম্পদ্ বিলুপ্ত হইয়াছে। তারপব বৌদ্ধাধিপত্যের সময ইহা অল্পপরিমাণে শ্রীবৃদ্ধিলাভ

করে। পাণ্ডাপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, বিক্রমজিৎ নামক জনৈক হিন্দুনরপতি এস্থানে প্রায় চারিশত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলমান রাজত্বকালে কয়েকটী প্রসিদ্ধ মন্দিব ব্যতীত সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে এস্থানে শতাধিক দেবমন্দির আছে; তন্মধ্যে ৩০।৩৫টী শিবমন্দির এবং অবশিষ্টগুলি বিষ্ণু-মন্দির। অযোধ্যার দেবমন্দিরের কোনটীই বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

অযোধ্যায় দেবমন্দিরমধ্যে হনুমান্-গড় বা মহাবীর-গড় প্রাচীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা এক অনুচ্চ স্থানোপরি স্থাপিত। মন্দিরে আরোহণার্থ প্রায় এক শত সোপান আছে। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে হনুমানের বিগ্রহ বিদ্যমান। এই বিগ্রহেব উভযপার্শ্বেই অনেক দেবমূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে। মন্দিরসন্নিকটে মোহান্তের গদী আছে। এই অঞ্চলে দেখিলাম যে, হনুমানের পূজা মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হনুমানকে কৃষিকার্য্যের দেবতা বলেন। এই হনুমান্-গড়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক মঠ স্থাপিত আছে। এতদ্ভিন্ন অযোধ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আরও ৫।৭টী মঠ আছে। হনুমান্-গড়ের অনতিদূরে এক জনমানবহীন পর্ব্বতোপরি মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

অযোধ্যার যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সে জন্মস্থান অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সেস্থানে প্রাচীন চিহ্ন

কিছুই নাই, কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। জন্মস্থানের মধ্যে এক মসজিদ্ রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই উপকরণে এই মস্‌জিদ প্রস্তুত করান। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমির উপর যে মন্দির ছিল, সেই মন্দিরের কয়েকটী কষ্টিপাথরের স্তম্ভ অদ্যাপি মস্‌জিদে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে হিন্দুমুসলমান মধ্যে মন্দির ও মস্‌জিদ লইয়া ঘোরতর বিবাদ হইতে থাকিত; এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুরের শাসনে মস্‌জিদ ও জন্মস্থান লইয়া কোনও বিবাদ ঘটে না, মন্দির ও মস্‌জিদ এক রেলিং দ্বারা বিভক্ত ও পৃথক্ থাকায় কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারে না।

অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের স্থান, শ্রীরাম-চন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের স্থান প্রভৃতি পাণ্ডা আমায় দেখাইতে লাগিল। এই নগরীর এক অংশে স্বর্ণসীতা রহিয়াছেন। সুবর্ণময়ী এক নবমবর্ষীয়া বালিকার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস দিবার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে যে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই বচনানুসারে সুবর্ণময়ী সীতাকে সহধর্ম্মিণী স্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

অযোধ্যার মহারাজ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির আছে। তৎসমুদয়ই আধুনিকভাবে সজ্জিত। মন্দিরগুলি কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। অযোধ্যায় রঙ্‌মহাল ও শিষ্‌মহাল দর্শনযোগ্য স্থান। মহলদ্বয় কৃষ্ণপ্রস্তর ও স্ফটিকের

দ্বারা গঠিত। উহা দেখিতে অতি চমৎকার। এখানে ভারত বিখ্যাত তুলসীদাসের এক আশ্রম বা আখড়া আছে। আশ্রম মধ্যে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। সেই আশ্রমে সন্ধ্যাকালীন আরাত্রিক ক্রিয়া দর্শনীয়। প্রায় সহস্র দীপালোকসাহায্যে আরত্রিক ক্রিয়া সাধিত হয়। তৎকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে সামবেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিতে থাকেন। আশ্রমের সম্মুখভাগে সন্ন্যাসিগণের এক বাসভূমি আছে, সেস্থান সাধুসন্ন্যাসিগণে পরিপূর্ণ দেখিলাম।

অযোধ্যায় মণিপর্ব্বত নামে এক অনুচ্চ স্থান বা ঢিপি আছে, তাহার উচ্চতা প্রায় ৫০ হস্ত হইবে। অযোধ্যাবাসিগণ বলে যে, উহা গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক ভগ্নাংশ। লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে মূর্চ্ছিত হন, তখন হনুমান বিশল্যকরণী বৃক্ষ চিনিতে না পারিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক লঙ্কাভিমুখে যাইতেছিল। যখন হনুমান অযোধ্যার উপর আসে, তখন ভরত হনুমানকে চিনিতে না পারিয়া শত্রুজ্ঞানে বাটুলাঘাত করেন। সেই আঘাতে হনুমান ভূতলে পতিত হইলে গন্ধ-মাদন পর্ব্বতের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া এই স্থানে পতিত হয়। মণিপর্ব্বত ব্যতীত অযোধ্যায় সুগ্রীব পর্ব্বত ও কুবের পর্ব্বত নামে দুই স্তুপ আছে। সুগ্রীব পর্ব্বত উচ্চে প্রায় ৭ হাত এবং কুবের পর্ব্বত ১৪ হাত হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই পর্ব্বত ত্রয়কে বৌদ্ধস্তুপ বলিয়া অনুমান করেন। মণিপর্ব্বতের সন্নিকটে দুইটী সমাধিক্ষেত্র আছে।

অযোধ্যা নগরীর রামকোট সুপ্রসিদ্ধ স্থান। জনপ্রবাদ প্রচলিত যে, এস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গ স্থাপিত ছিল। দুর্গমধ্যে আটটী রাজপ্রাসাদ ছিল, এক্ষণে সে সমুদয়ের কিছুই বিদ্যমান নাই।

অযোধ্যার সরযূনদীতীরে রামঘাট, সীতাঘাট, লক্ষ্মণঘাট প্রভৃতি বহুঘাট আছে। রামঘাট বা স্বর্গদ্বারঘাট রামায়ণবর্ণিত গোপ্রতার নামক পুণ্যতীর্থ। এই স্থান হইতেই শ্রীরামচন্দ্র জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। এই ঘাটে যাত্রিগণ স্নানদান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকে। এখানে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। সেজন্য অযোধ্যার আর এক নাম রামগয়াতীর্থ। রামঘাট প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। ঘাটের উপর নানাবিধ বৃক্ষ থাকায় সে স্থানের সৌন্দর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। রামঘাট হইতে কিয়দ্দূরে এক প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণঘাটে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-আজ্ঞায় অনুরুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বার সকল অবরুদ্ধ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন। অযোধ্যায় আসিলে যাত্রিগণের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম সরযূ নদীতে স্নান করা। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে, সরযূ নদীর গোপ্রতার নামক উত্তম তীর্থে রঘুকুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্র কলেবর পরিত্যাগকরতঃ স্বর্গলোকে গমন করেন; এই তীর্থ-সলিলে স্নান করিলে মানব চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গতি লাভ করিয়া পূজিত হয়।

অযোধ্যায় শ্রীরাম-অবতারের কতকগুলি মূর্ত্তি গঠিত

আছে। সে সকলে শিল্পচাতুর্য্য না থাকিলেও দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। অযোধ্যায় উৎসবের মধ্যে রামনবমীর সময় রামলীলা অবশ্য দর্শনীয়। তখন এস্থানে এক মেলা হয়, সেই মেলায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হয়। নানা দেশদেশান্তর হইতে দ্রব্যাদি এস্থানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

অযোধ্যায় জৈনদিগের কয়েকটী মন্দির আছে। সেগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। অযোধ্যার প্রায় ৫ মাইল উত্তরে বশিষ্ঠ-দেবের এক আশ্রম আছে।

এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিয়া ফয়জাবাদে পুনরাগম করিলাম।

মথুরা।

(২)

সন ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে আমি সপরিবারে তীর্থ ভ্রমণকালে এই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করি। ইহা অতি প্রাচীন নগরী। ইহার শাস্ত্রসম্মত নাম মধুপুরী। শ্রীহরি এই স্থানে মধুনামক দৈত্যকে নিহত করেন। এই নগরী যমুনার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। রামায়ণ ও মনুস্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়, যে পূর্ব্বে এস্থানের নাম শূরসেন ছিল। তৎকালে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধা নগরী ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে চিন পরিব্রাজক হিয়নচিয়ং যখন মথুরায় আসেন, তখন এস্থানে বৌদ্ধগণের অনেকগুলি মঠ ছিল। পরে দশম শতাব্দীতে

হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সহিত এই নগরীর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই নগরীর ধনৈশ্বর্য্য-দর্শনে সুলতান মামুদ, সেকেন্দারলোদী প্রভৃতি বৈদেশিক নর-পতিগণ ধনরত্নাদি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহাদিগের দ্বারা মথুরার দুরবস্থা হওয়া সত্বেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এই শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি চির শান্তিময স্থল। ইহা হিন্দুগণের এক মহাতীর্থ। যমুনাতীরস্থ ঘাটগুলি কত কালের পুরাতন কথা স্মরণ করাইতেছে।

বর্ত্তমান মথুরা নগরীর পশ্চিমভাগে মল্লপুরা নামে এক ক্ষুদ্র পল্লী আছে; ঐ পল্লীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। এই স্থানে বসুদেব ও দেবকীর শ্বেত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় অবস্থাপিত আছে। কংসকারাগারে তাঁহারা যেরূপভাবে ছিলেন, সেইরূপে এই মূর্ত্তিদ্বয় গঠিত হইয়াছে। এই পল্লীতে কংসের বহু-সংখ্যক মল্ল বা যোদ্ধা থাকিত বলিয়া ইহার নাম মল্লপুরা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের নিকট এক বৃহৎ কুণ্ড আছে; উহার নাম পোৎরাকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর সূতিকাগৃহের বস্ত্রাদি এই কুণ্ডে ধৌত হয়। মথুরাবাসিগণ এই সলিল পবিত্র জ্ঞান করে। এই কুণ্ডের অনতিদূরে কংসালয়। কংসভবনের স্তূপাকার প্রস্তর ও রাশীকৃত ইষ্টক ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। এই স্থানে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব এক মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান; উহা এক্ষণেও বর্ত্তমান আছে। এইরূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঔরঙ্গজেব কংসভবনের অধিকাংশই বিনষ্ট করিয়া দেয়। এখানে কেশবদেবের এক

মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে কেশবদেবের চতুর্হস্তবিশিষ্ট মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। উহার চতুর্হস্তে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভা পাইতেছে। এই মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হন।

তারপর ভূতেশ্বর-মহাদেবের মন্দির দেখিতে যাইলাম। এই মন্দিরে ভূতেশ্বর মহাদেব ও তৎপার্শ্বে পাতালদেবী আছেন। এই মহাদেব কংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরটী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আলোকসাহায্য ব্যতীত বিগ্রহের দর্শনলাভ করা সুকঠিন। এই মন্দিরের কিয়দ্দূরে এক অনুচ্চ স্থানোপরি মহাবিদ্যেশ্বরী-দেবী আছেন। ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে ব্রজেশ্বর নামক এক শিবমূর্ত্তি আছে। পাণ্ডাপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ এই শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ভূতেশ্বর এস্থানের তীর্থফলদাতা। ভূতেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে বলভদ্র-কুণ্ড নামক এক পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে।

মথুরায় দ্বারকানাথের মন্দির বেশ সুন্দর; বিশেষতঃ ইহার নাটমন্দিরটী অতি চমৎকার। মন্দিরমধ্যে দ্বারকানাথ, মথুরানাথ, ব্রজনাথ, যমুনাদেবী প্রভৃতি রহিয়াছেন। মন্দিরের বারাণ্ডায় নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি অবস্থিত। মন্দিরের বহির্ভাগে শেঠেদের এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দণ্ডায়মান।

মথুরার পূর্ব্বদিকে যমুনা প্রবাহিতা। যমুনাতীরে সর্ব্বসমেত প্রায় ২৪টী স্নানের ঘাট আছে। শাস্ত্রে প্রত্যেক ঘাটের পৃথক্ পৃথক্ মহিমা বর্ণিত আছে। এই ঘাটগুলির মধ্যে

বিশ্রান্তি ঘাট, ধ্রুব-ঘাট, অবিমুক্ত-ঘাট, প্রয়াগ-ঘাট প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ ঘাট আছে; বিশ্রান্তি-ঘাট সহরের পূর্ব্বদিকে যমুনাতীরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসাসুরকে বধ করিয়া এই ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম করেন। এই ঘাটে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলে তাহারা পুন্নাম-নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পিতৃলোকে প্রেরিত হন। পুরাণেও উল্লিখিত আছে যে, বিশ্রান্তি নামক তীর্থ সর্ব্বপাপনাশক এবং যে কেহ এই তীর্থে স্নানান্তে অচ্যুতের পূজা করেন, তিনি ত্রিতাপের জ্বালা হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তিমে মুক্তি লাভ করেন। বিশ্রান্তিঘাটের শোভা মনোমুগ্ধকর। মথুরায় যত গুলি ঘাট আছে, তন্মধ্যে এই ঘাটই অধিক শোভনীয়। সন্ধ্যাকালে এই ঘাটের আরতি দর্শনযোগ্য। সেই আরত্রিক ক্রিয়াসন্দর্শনে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। তখন তথায় বহুলোকের জনতা হয়।

যমুনার ধ্রুব-ঘাটও সুপ্রসিদ্ধ। যেস্থানে ধ্রুব স্বেচ্ছায় তপস্যা করেন, তথায় পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষের পিণ্ডপ্রদান করিলে তাহাদের উদ্ধার হয়। এই স্থানে এক অনুচ্চ পর্ব্বতোপরি ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ করেন। এখানে শ্রীহরির এক সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

মথুরায় বিগ্রহের সংখ্যা গণনাতীত। বারাণসী যেমন শিবময়, এই পুণ্যক্ষেত্রও তদ্রূপ বিষ্ণুময়। বর্ত্তমানকালে এস্থানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, বিজয়গোবিন্দজীর মন্দির, গোবর্দ্ধন

নাথের মন্দির, মোহনজীর মন্দির প্রভৃতি অবশ্য দর্শনীয়। এই মথুরাতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ ভূমিকম্প হওয়ায় নগরীর বহু প্রাচীন কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়।

প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও দেবমন্দির ব্যতীত আরও অনেক দেখিবার জিনিস আছে। মথুরায় যমুনার উত্তর সীমায় এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় জনসাধারণ উহাকে "কংসকা কিল্লা" নামে অভিহিত করে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা জয়পুরাধিপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কালক্রমে উহা বিধ্বস্ত হইয়া এইরূপ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। মহারাজ মানসিংহের বংশধর অম্বরেশ্বর জ্যোতির্বিদ্যালোচনার্থ এস্থানে এক মানমন্দির বা অবসারভেটরী নির্ম্মাণ করেন। তিনি এই জ্যোতির্বিদ্যাপ্রচারার্থ কাশী, মথুরা, উজ্জয়িনী, দিল্লী ও জয়পুর—এই পঞ্চস্থানে পাঁচটী মানমন্দির স্থাপিত করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা মথুরাতে তাহার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। মথুরার অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।

মথুরাতে দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে আগমন করিলাম। উহা মথুরা হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। মথুরা হইতে বৃন্দাবনের পথটী বড় সুন্দর। পথের একদিকে যমুনা নদী ধীরভাবে প্রবাহিত হইতেছে ও অপরদিকে শস্যশ্যামল বনভূমি প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা শ্রীবৃন্দাবনে আসিলাম।

বৃন্দাবন তেমন মহতী নগরী না হইলেও বেশ সমৃদ্ধি সম্পন্না। বৈষ্ণবগণ এই স্থানের ন্যায় আর শ্রেষ্ঠতম মোক্ষপ্রদ তীর্থ নাই বলিয়া বিবেচনা করেন; ইহা শ্রীকৃষ্ণের পদরজে পবিত্রীকৃত। শ্রীহরির অতিপ্রিয় নিত্যলীলাময় পরম পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করা ও ব্রজরজে দেহ বিলুণ্ঠিত করা হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এস্থানে আসিয়া ত্রিলোচন গোপীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা নেত্রনীরে বক্ষপ্লাবিত করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন এবং এস্থানে সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ ভজন গাহিতে গাহিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালে কেদার নামক জনৈক নরপতির বৃন্দা নাম্নী এক দুহিতা ছিল। বৃন্দা অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। বৃন্দা গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়া হরিমন্ত্র সাধন করিতে থাকেন। বৃন্দাদেবী যেস্থানে তপস্যা করেন, সেই স্থান বৃন্দাবন নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা অন্যতম। তাঁহারই ক্রীড়াকুঞ্জ বলিয়া ইহার নাম বৃন্দাবন হইল।

বৃন্দাবনের দেবমন্দির সমূহের মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দির গোপীনাথের মন্দির, মদনমোহনের মন্দির ও গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিশেষ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। আধুনিক মন্দিরের সংখ্যা গণনাতীত। গোবিন্দদেবের মন্দির রূপসনাতন কর্ত্তৃক

নির্ম্মিত হয়। বৃন্দাবনমধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবমন্দির। মন্দিরমধ্যে গোবিন্দজী ও রাধারাণীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। গোবিন্দজী কি প্রকারে রূপসনাতন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, একদিন শ্রীরূপসনাতন বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ এক ব্রজবালক তাঁহাকে এক ভাণ্ড দুগ্ধ প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সনাতন গোস্বামী বালকের অপরূপ রূপসন্দর্শনে ও দুগ্ধদানের কারণ অনবগত হইয়া দুগ্ধ পান করিলেন। দুগ্ধপান করিয়া তিনি অমৃতের আস্বাদ পাইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে দুগ্ধদান করিয়াছেন। তখন তিনি "হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া শ্রীহরি তাঁহাকে এই স্বপ্নাদেশ দেন যে, যোগপীঠের নিম্ন হইতে আমাকে উত্তোলিত করিয়া আমার সেবা করিবে। শ্রীরূপগোস্বামী বিগ্রহকে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিয়া মন্দিরমধ্যে অভিষেক ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মন্দিরসন্নিকটে যোগপীঠ বিদ্যমান। তথায় যোগমায়া দেবী আছেন। এই যোগমায়াই শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার ঘটনকর্ত্রী।

মদনমোহনদেবকেও শ্রীরূপগোস্বামী মথুরা হইতে আনায়নপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মন্দির মুলতান নগরীর কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মদনমোহনের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগে শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধিমন্দির ও তাঁহার প্রধান

শিষ্য সনাতন গোস্বামীর আশ্রম আছে। ইহার কিয়দ্দূরে কালীয়দহ-ঘাট ও গোপালঘাট আছে। ঘাটগুলি প্রস্তরে গ্রথিত। এক্ষণে ঘাট হইতে যমুনা সরিয়া গিয়াছে। এই কালীয়দহ-ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নামক সর্পরাজকে দমন করেন। ঘাটের উপরি এক মন্দিরমধ্যে সহস্রফণাযুক্ত কালীয় সর্প ও তদুপরি শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে। এই ঘাটের নিকটে একটী প্রাচীন বৃক্ষ আছে; কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষ হইতে যমুনাগর্ভে লাফাইয়া পড়েন। তৎপরে কেশী-ঘাট, নৃসিংহঘাট ইত্যাদি অনেক ঘাট আছে। কেশীঘাটের উপর যুগলকিশোরের মূর্ত্তি আছে। কেশীঘাটে কংসপ্রেরিত কেশীদৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে নিহত করেন।

গোপীনাথজীকে মধুপণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত করেন। মধুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলালসায় বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমন করিতে লাগিলেন ও কোথাও দর্শন না পাইয়া "হা গোপীনাথ, হা গোপীনাথ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হন। তখন শ্রীহরি তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া গোপীনাথরূপে দর্শন দেন। তিনি গোপীনাথকে পাইয়া এইস্থানে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সেবা করিতে লাগিলেন। এই মন্দিরসন্নিকটে মধুপণ্ডিতের আবাস-স্থান আছে।

বনপ্রদক্ষিণ ও দেবদর্শন করা শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান কার্য্য। বৃন্দাবন সহরমধ্যে নিধুবন, নিকুঞ্জবন প্রভৃতি অবস্থিত। নিধুবন ও নিকুঞ্জবন প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানসমূহে অসংখ্য বানর বাস করে। তাহাদিগকে কোন খাদ্য দ্রব্য

প্রদান না করিলে তাহারা অন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় না। নিধু ও নিকুঞ্জবনে বিশাখাকুণ্ড ও ললিতকুণ্ড নামক দুইটা পাষানসোপানযুক্ত কুণ্ড বিদ্যমান আছে। উভয় কুঞ্জে প্রস্তরময় সিংহাসন রহিয়াছে। সন্ধ্যাকালে এই স্থান পুষ্প ও দীপমালায় পরিশোভিত করা হয়। কথিত আছে যে, নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পদসেবা করেন। নিকুঞ্জবনে এক তালবৃক্ষ দেখিলাম। পাণ্ডার নিকট শুনিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে নবনী ভক্ষণ করিয়া ইহার অঙ্গে হাত মুছিতেন। যে যে স্থানে হাত মুছিয়াছেন, সেই সকল স্থানে এক একটা শালগ্রাম শিলার সৃষ্টি হয়। সত্যই বৃক্ষের স্থানে স্থানে শিলাকার পদার্থ বিদ্যমান আছে।

বৃন্দাবনে আসিয়া অনেকেই চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে ও শ্রীবন করিতে অভিলাষী হন। শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মহাবন এবং অপর সমস্তই উপবন। যাত্রিগণকে ভূতেশ্বর-মহাদেব ও পাতালদেবীর অনুমতি লইয়া বনপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করিতে হয়। দ্বাদশ মহাবনের মধ্যে প্রথম মধুবন। পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে এই বনেই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীহরির তপস্যা করেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে তালবন, কুমুদবন প্রভৃতি আছে। যাত্রিগণের বনপ্রদক্ষিণ করিতে যাইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীতিথিতে বহির্গত হওয়া উচিত। ইহাতে শুভদিন, শুভবার প্রভৃতি বিচার করিতে হয় না।

বৃন্দাবনে সমুদয় দেবমন্দির দর্শন করা সাধ্যাতীত, কারণ

এখানে অন্যূন পঞ্চসহস্র দেবালয় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব একটী দেবালয় স্থাপিত করিয়াছেন। শেঠেদের দেব-মন্দির ও সাজীর মর্ম্মর প্রস্তরময় মন্দির দর্শনযোগ্য। এখানে এক সুবর্ণনির্ম্মিত তালবৃক্ষ আছে।

এই নগরীতে লালাবাবু, কালাবাবু প্রভৃতির কুঞ্জ আছে। বাঙ্গালীর মধ্যে লালাবাবুই সর্ব্বপ্রথমে কুঞ্জস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রমাজীউকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সদাব্রতে প্রত্যহ অসংখ্য দীনহীন ব্যক্তি অন্ন পাইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে বাড়ীমাত্রই কুঞ্জ নামে অভিহিত হয়। বৃন্দাবনে সকল সময়ই যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে; তবে ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা পর্ব্বোপলক্ষে অধিক যাত্রী সমবেত হয়। আবার ইহাদের মধ্যে ঝুলনযাত্রা পর্ব্বই অত্যন্ত আনন্দজনক পর্ব্ব। তখন সকল কুঞ্জেই সাজসজ্জার আতিশয্য পরিদৃষ্ট হয়। এস্থানে গোপীশ্বর মহাদেব সকলের অবশ্য দর্শনীয়। যিনি বৃন্দাবনে আসিয়া এই মহাদেবকে দর্শন না করেন, তাঁহার বৃন্দাবনে আগমনফল নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলা করেন, তখন মহাদেব গোপীবেশধারণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হন; কিন্তু শ্রীহরি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া গোপীশ্বর নামে অভিহিত করে। এখানে কাত্যায়ণী দেবী আছে। উহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম। দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র দ্বারা কর্ত্তিত কেশরাশি এখানে পতিত হয়।

মথুরার পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল দূরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত অবস্থিত। এই পথে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড আর কয়েকটী মন্দির আছে। এই কুণ্ডদ্বয় পাশাপাশি স্থিত। গিরিগোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের মন্দির আছে। গোবর্দ্ধনের সর্ব্বোচ্চ স্থানে মানস-গঙ্গা। এই হ্রদ অত্যন্ত গভীর। হ্রদের উত্তর তীরে চক্রেশ্বর মহাদেব আছেন। এখানে আর এক কুণ্ড আছে, তাহার নাম গোবিন্দকুণ্ড।

গিরিগোবর্দ্ধন হইতে কিয়দ্দূরে বর্ষণা-গ্রাম। ইহা শ্রীরাধার জন্মভূমি। এস্থানে ত্রিবেণী নাম্নী এক নদী আছে।

মথুরা হইতে গোকুল ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দ্বাদশ মহাবনের অন্তর্গত। যমুনার পূর্ব্বপার সমস্তই গোকুল। এখানে গোকুলনাথের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। গোকুলসন্নিকটে কোলগ্রাম আছে। জনপ্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসালয় হইতে নন্দালয়ে যাইবার পথে যমুনা-উত্তীর্ণকালে নদীগর্ভে পতিত হন। যে স্থানে তিনি যমুনাকে কোল দিয়াছিলেন, সেস্থানের নাম কোলগ্রাম। পাণ্ডাগণ এই স্থানের এক অট্টালিকার ভগ্নাংশকে নন্দের প্রাসাদ বলিয়া যাত্রিবৃন্দকে দেখাইয়া থাকে। এখানে কতকগুলি মন্দির ও ক্ষীরসমুদ্র নামক এক পুণ্যতোয়া পুষ্করিণী আছে।

মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহে প্রাচীন চিহ্ন বিশেষ বিদ্যমান নাই। তথাপি স্থানমাহাত্ম্য ও অতীতের স্মৃতি দর্শকের চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত করে। যমুনাবক্ষ হইতে এই সকল স্থানের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার দেখায়।

মথুরা যে কেবল সপ্তমোক্ষপ্রদ তীর্থের মধ্যে পরিগণি তাহা নহে, ইহা ৫১ মহাপীঠের এক মহাপীঠ।

মথুরা ও বৃন্দাবনে স্থানে স্থানে এক্ষণে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে পুরাতন কীর্ত্তিকলাপ আবিষ্কৃত হইতেছে। যতই পুরাতত্ত্বের নানানুসন্ধান চলিতেছে, ততই নূতন নূতন তথ্যসমূহ আবিষ্কৃত হইয়া ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠা বর্দ্ধিত ও উজ্জ্বলিত করিতেছে।

মায়া বা হরিদ্বার।

(৩)

এই পরম পবিত্র স্থানে যখন সপরিবারে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হই তখন একবার আসি ; পুনরায় যখন বদরিকাশ্রমে গমন করি তখনও এস্থানে আসিতে হয়। এই স্থানের শোভা অনির্ব্বচনীয়। গগনস্পর্শী হিমাদ্রির পাদমূলে এই পুরী অবস্থিতা। পুণ্যসলিলা জাহ্নবী এই স্থানে হিমালয়পর্ব্বত হইতে প্রথমে অবতীর্ণা হন। গঙ্গার দক্ষিণতটে এই নগরী স্থাপিতা। ইহার প্রকৃত নাম মায়াপুরী। কেহ কেহ ইহাকে কপিলস্থান কহে, কারণ কপিল মুনি এখানে কঠোর তপস্যা করেন। শৈবেরা হরিদ্বারকে "হরদ্বার" বলেন।

হরিদ্বারে মন্দিরসমূহের মধ্যে মায়াদেবীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা

প্রাচীন। মন্দিরমধ্যে চতুর্হস্তবিশিষ্টা মায়াদেবী বিরাজিতা। ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত সিন্দুরে তাঁহার মূর্ত্তি আচ্ছাদিত। দেবী এক হস্তে নৃমুণ্ড, এক হস্তে চক্র ও এক হস্তে ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক চতুর্থ হস্ত উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন। এই মন্দিবদ্বারে এক খোদিত লিপি আছে। এই শিলালিপিদর্শনে ক্যানিংহ্যাম্ সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনাত হন যে, এই মন্দির দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে ভগ্ন অট্টালিকা ও অরণ্য রহিয়াছে। এই মন্দিরসন্নিধানে এক পর্ব্বতশিখরোপবি বিল্বকেশ্বরদেব আছেন। ইনি মায়াপুরীর ক্ষেত্রপতি। মন্দিরটী বেশ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত।

হরিদ্বারে দক্ষেশ্বব মহাদেব ও সতীকুণ্ড শ্রেষ্ঠ তীর্থ। দক্ষেশ্বর শিবমন্দিরটী বেশ বড়। কথিত আছে যে, দক্ষ শিবকে নিমন্ত্রণ না করিয়া যজ্ঞ করেন ও সেই যজ্ঞে পতিগতপ্রাণা সতী পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করেন। সতীবিরহে কাতর হইয়া মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন ও দক্ষের মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাতে ছাগমুণ্ড স্থাপিত করেন। পরে দক্ষ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া এই শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিবমূর্ত্তির নিকটেই সতীকুণ্ড। সতী এই স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। এই কুণ্ডসলিলে স্নান করিলে রমণীগণ সতীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকেন।

সর্ব্বনাথের মন্দিরটী দেখিতে বেশ সুন্দর। মন্দিরমধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত। এই মন্দির শতচূড়ায় পরিশোভিত।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দ্বিতল গৃহরাজি বিরাজিত। ইহার কিয়দ্দূরে এক পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

হরিদ্বারে গঙ্গার পরপারে চণ্ডীর-পাহাড় নামক এক অনুচ্চ পর্ব্বতোপরি মন্দিরমধ্যে চণ্ডীদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই পর্ব্বত হইতে হরিদ্বারের দৃশ্য চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। হরিদ্বারে দশাবতারের এক মন্দির আছে। এই মন্দিরমধ্যে শ্রীহরির দশ অবতারের প্রস্তরময় মূর্ত্তি সকল রহিয়াছে। মন্দিরটী গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া বড়ই সুন্দর দেখায়। এস্থানে এক কুণ্ড আছে; পাণ্ডারা বলে যে, ভীম স্বর্গারোহণকালে তাঁহার গদা এই স্থানে নিক্ষেপ করাতে এই কুণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে! উক্ত কুণ্ডের সম্মুখভাগে একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। পাণ্ডারা উহাকে ভীমের গদা বলে।

হরিদ্বারে অনেক ঘাট আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড-ঘাট, কুশাবর্ত্ত-ঘাট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে স্নান করা সুপ্রশস্ত। এই স্থানেই গঙ্গা পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রথমে সমতলক্ষেত্রে পতিত হন। কুম্ভমেলার সময় যাত্রিগণ এই ঘাটেই স্নান করে। তৎকালে এখানে স্নান করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। এস্থানে নানা দেশদেশান্তর হইতে যাত্রিবৃন্দ মৃতদেহের অস্থিনিক্ষেপ করিতে আগমন করে। এই ঘাটের উপরি এক মন্দিরমধ্যে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছে। এখানে হরির চরণচিহ্ন দৃষ্ট হয়। কুশাবর্ত্তঘাটে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ করা সুপ্রশস্ত। এখানে শ্রাদ্ধাদি পিতৃ-

কার্য্য করিলে পিতৃপুরুগগণ বিষ্ণুলোকে গমন করেন। এই ঘাটের উৎপত্তি বিষয়ক এক কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, একদা কোন এক ঋষি এস্থাঁনে যোগসাধনায় নিরত ছিলেন, এমন সময় গঙ্গা প্রবলবেগে প্রবাহিতা হইয়া ধ্যানমগ্ন ঋষির কুশা স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ধ্যানান্তে ঋষি নয়ন উন্মিলিত করিয়া সম্মুখে কুশা না দেখিয়া ধ্যানপ্রভাবে অবগত হইলেন যে, গঙ্গা তাঁহার কুশা ভাসাইয়া লইয়াছে। তখন তিনি তপোবলে গঙ্গাকে আকষণ করেন। গঙ্গা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া এই বর প্রদান করেন যে, অদ্যাবধি এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত্ত ঘাট হইবে এবং এস্থানে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে তাঁহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। এখানে গঙ্গার স্রোত অতি প্রবল। যাত্রিগণকে সন্তর্পণে স্নান করিতে হয়। এই সকল ঘাটে দেখিলাম যে, প্রকাণ্ড মৎস্য সকল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। এখানে কেহ জীবহত্যা করে না বা কেহ ইহাদের প্রতি অত্যাচার করে না। যাত্রিগণ খই, চিঁড়া, মুড়কি জলে নিক্ষেপ করিলে শত শত মৎস্য আসিয়া তাহা ভক্ষণ করে।

হরিদ্বার হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে কন্‌খল অবস্থিত। কথিত আছে যে এস্থানে দক্ষরাজের রাজধানী ছিল। হরিদ্বারের অপেক্ষা কন্‌খলের গৃহ সকল উৎকৃষ্ট। প্রায় সমস্ত গৃহ প্রস্তরনির্ম্মিত। পাণ্ডাগণ এই স্থানে বাস কয়িয়া থাকে। হরিদ্বার অপেক্ষা কন্‌খল প্রাচীন সহর। মহাভারতেও ইহার

বিষয় উল্লিখিত আছে। এস্থানে গঙ্গাস্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। মহাভারতে লিখিত আছে—

"ততঃ কন্‌খলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপোষিতো নর।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ বিন্দতি॥"

কালিদাসের মেঘদূতে কন্‌খলের সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গাজল এস্থানে নীলাভ বলিয়া ইহা নীলধারা নামে কথিত হয়। নীলধারায় স্নান করা কর্ত্তব্য। গঙ্গার তটপ্রদেশে বহু উদ্যান থাকায় স্থানটী বেশ মনোরম। উদ্যান হইতে সোপানশ্রেণী গঙ্গাজলে নামিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক উদ্যানেই দেবমন্দির আছে। কন্‌খলের পথঘাট সুপ্রশস্ত। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাশ্রম আছে। তথায় প্রতিমাসে দুইশত সাধু ও দরিদ্র গৃহস্থ বিনাব্যয়ে ঔষধ পায়। প্রতি মাসে প্রায় ৬।৭জন পীড়িত সাধু আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমাধ্যক্ষের সেবায় আরোগ্যলাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। কন্‌খলে নীলধারার ঘাটে গৌরীশঙ্কর-মহাদেব আছেন। এই কন্‌খলেই মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন।

হরিদ্বারে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। তখন এই অল্পপরিমিত স্থানে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মলিপ্সু নরনারী স্নানার্থ আগমন করেন। এই কুম্ভমেলা তিনটী স্নানের দিনে বিভক্ত হইয়াছে; প্রথমটী শিবরাত্রির দিন, দ্বিতীয়টী চৈত্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে ও তৃতীয়টী চৈত্রসংক্রান্তি দিন হইয়া থাকে।

শেষোক্ত দিন সর্ব্বপ্রধান যোগের দিন। সেদিন হরিদ্বার ও কন্‌খলের পথে পথে এত ভিড় হয় যে, তথায় পদবিক্ষেপ করা সুকঠিন হয়। কন্‌খলে অবস্থিত যাত্রিগণ ও নিকটস্থ গ্রামের যাত্রিগণ শেষ রাত্র হইতেই হরিদ্বারে আসিতে থাকে। অন্ধকার সত্ত্বেও মেলাভূমি জনস্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখন এস্থানে নানা পন্থের এত সাধু একত্র সমবেত হয় যে, তদ্দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারত এখনও ধর্ম্মহীন হয় নাই। যে ধর্ম্মাগ্নি পুরাকালের সাধুমহাত্মগণ কর্ত্তৃক প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। যাহাদের বিশ্বাস যে ভারতে একেবারে ধর্ম্মলোপ ঘটিয়াছে, তাহারা এই কুম্ভমেলা দেখিলে পর এরূপ অমূলক ধারণা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে পারিবে। এই মেলায় কত রাজা, মহারাজ, কত শত ধনী শেঠেরা ভাণ্ডারাদি দ্বারা সাধুসন্ন্যাসিগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া ও বস্ত্রাদি দান করিয়া থাকেন, এমন কি, দরিদ্র ব্যক্তিবর্গও এই সদুদ্দেশে আপনাদের সামর্থ্যানুসারে স্বোপার্জ্জিত বিত্তব্যয়ে বিকুণ্ঠিত হয় না। ধন্য সেই নগণ্য ব্যক্তিবর্গ, যাহারা নিজেদের যৎসামান্য আয় হইতে প্রত্যহ দুই একটী পয়সা সঞ্চিত রাখিয়া এই অবসরে সাধুদিগের ভোজনার্থ ব্যয় করেন। এই মেলায় প্রত্যেক স্থানে পাঠ, ভজন, ধর্ম্মচর্চ্চা ও বক্তৃতা হইয়া থাকে। সকল সাধুই ঐশ্বরিক তেজে তেজীয়ান্ ও উৎসাহান্বিত হইয়া জগৎপিতার মহিমাকীর্ত্তনে নিরত। এই মেলার সময় এত অধিক যাত্রীর সমাগম হয় যে,

বিসূচিকাদি নানা সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। সরকার বাহাদুর তথায় শান্তিস্থাপনার্থ যথাশক্তি চেষ্টা করে। সেস্থানে স্নানের সময় সরকারবাহাদুর কর্ত্তৃক সুব্যবস্থা সম্পাদিত হয়। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ সকলেই সচেষ্ট হইয়া যাত্রিবৃন্দের সাহায্য করে। বার্ষিক মেলার সময়ও এস্থানে বহু ব্যক্তি সমবেত হয়। তখন দেশদেশান্তর হইতে অশ্ব সকল এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

হরিদ্বার হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ দূরে এক দুর্গমপর্ব্বতমধ্যে পিচোড়নাথ-শিব আছেন। পথটী অত্যন্ত দুর্গম; সুতরাং যাতায়াত করা সুকঠিন।

স্বর্গদ্বার তুল্য হরিদ্বার গঙ্গার দ্বারস্বরূপ। এই তীর্থে ত্রিরাত্র বাস করিয়া স্নানদান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। এস্থানে শত সহস্র কুকার্য্য করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দাহ করে, তদ্রূপ গঙ্গাসলিল সেই কুকার্য্যরত ব্যক্তির পাপরাশি বিনষ্ট করে। এহেন পবিত্র তীর্থে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী কেন না আসিতে ইচ্ছা করিবেন? এখানে শান্তি, প্রীতি ও ভক্তির সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির এমন নয়ন-বিমোহন দৃশ্য অতি অল্প তীর্থক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে। নগা-ধিরাজ হিমালয়ের বক্ষ হইতে গঙ্গা যে কুলু কুলু ধ্বনিতে নিম্নে নামিয়া আসিতেছে, লেখনীর এমন শক্তি নাই যদ্দারা উহা ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে।

হরিদ্বার বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। এস্থানের গঙ্গাজল পান

করিলে অজীর্ণতাদোষ বিনষ্ট হয়। কন্‌খল ও হরিদ্বার লইয়া এক মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে উভয় স্থানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে। রাস্তাঘাট পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধাদিবিবর্জ্জিত। তবে বর্ষাকালে হরিদ্বার তেমন স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান থাকে না। এই মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে কুম্ভ-মেলার সময় যে বিসূচিকাদি ব্যাধির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইত, তাহার এক্ষণে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে! হরিদ্বারে প্রধান পথের সংখ্যা অতি অল্প। বাজারের পথটি সুপ্রশস্ত। সেই পথে দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকাসমূহ থাকায় পথের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে ২।৪টি ধর্ম্মশালা আছে। এই স্থানে দুগ্ধ, ঘৃত বড় সুলভ। মৎস্য মাংস এস্থানে বিক্রীত হয় না। ডাকঘর, থানা, হাঁসপাতাল প্রভৃতি সমুদয়ই এখানে বিদ্যমান আছে।

—০—

কাশী।

(৪)

কতবার এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়াছি, তথাপি এস্থানে আসিতে সততই মনে বাসনা উদিত হয়। হিন্দুগণের নিকট এরূপ মোক্ষদায়ক তীর্থ অতি বিরল। ইহা যে কেবল সপ্ত মুক্তিপ্রদ তীর্থের অন্যতম তাহা নহে, অধিকন্তু এস্থানে দ্বাদশ

জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ আছে ও ইহা ৫১ মহাপীঠের এক পীঠ-স্থান। সুতরাং জীবনের শেষাংশ এস্থানে অতিবাহিত করা প্রত্যেক হিন্দু নর নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। কাশীবাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রেও এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

"কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্।
অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্॥"

এই অসার সংসারে চারি সার পদার্থ বিদ্যমান আছে,—(১) কাশীবাস, (২) সৎসঙ্গ (৩) গঙ্গাসলিল, (৪) মহেশ্বরের সেবার্চ্চনা।

এস্থানে অনেক তীর্থ বিদ্যমান; কিন্তু বিশ্বেশ্বরই এই স্থানের প্রধান বিগ্রহ ও অন্নপূর্ণা প্রধানা দেবী। বিশ্বেশ্বরের তুল্য জ্যোতির্লিঙ্গ কলিযুগে আর নাই। পুরাণাদি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী পুরী।"

প্রাচীনকালে এই নগরী সুবৃহৎ ছিল, এক্ষণে বরণা ও অসি নামক সরিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানই বর্ত্তমান বারাণসী। এক্ষণে যেথায় সারনাথ অবস্থিত, তথায় বহু স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন কাশী স্থাপিত ছিল। সংস্কৃতগ্রন্থে কাশীর অনেক নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কাশী, বারাণসী ও অবিমুক্তক্ষেত্র এই তিন নাম বহু পুরাতন। শিবপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, মহাদেব এই ক্ষেত্র ক্ষণকালও পরিত্যাগ করেন না বলিয়া ইহা অবিমুক্তক্ষেত্র নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শাস্ত্রে যথা :—

বিমুক্তং ন ময়া যস্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন।
মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ॥”

কাশীতে বিশ্বনাথ, কেদারেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও দুর্গাবাড়ী অবশ্য দর্শনীয়। বিশ্বনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। পুরাণে কথিত আছে, “বারাণস্যাং তু বিশ্বেশম্… ।” বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির ঔরঙ্গজেব নষ্ট করিয়া সেস্থানে মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মন্দির আধুনিক কালের নির্ম্মিত। এই মন্দির প্রায় দেড় শত বৎসরের পুরাতন হইবে। বিশ্বনাথের মন্দির মির-ঘাট ও জরাসন্ধ ঘাটের সন্নিকটে সমবস্থিত। মন্দিরচূড়া সুবর্ণপাত দ্বারা বিমণ্ডিত। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলে মনে স্বতঃই পবিত্র ভাব জাগরিত হয়। কেহ স্তব পাঠ করিতেছেন, কেহ বা বেদাধ্যয়ন করিতেছেন, আবার কেহ বা সুললিত স্বরে সামবেদীয় গান গাহিতেছেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথের আরত্রিক ক্রিয়া অবশ্য দর্শনীয়। তখন সুমধুর বাদ্যধ্বনি ও বেদধ্বনি একত্র সমন্বিত হইয়া ভক্ত নরনারীর প্রাণে দেবাদিদেবের মহিমা কীর্ত্তন করে। সে সকল দৃশ্য বর্ণনাতীত।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরসন্নিকটে এক কুণ্ড আছে; তাহার নাম জ্ঞানবাপী। এই কুণ্ডের জল পান করিলে মূর্খ ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রবাদ আছে যে, দুর্ব্বৃত্ত কালাপাহাড় যখন বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিতে আসে, তখন পাণ্ডাগণ বিশ্বনাথকে এই কূপমধ্যে লুক্কায়িত রাখে।

জ্ঞানবাপীর উপরি এক ছাদ আছে, উহা ৪০টী প্রস্তরময় স্তম্ভোপরি অবস্থাপিত। জ্ঞানবাপীর জল অত্যন্ত অপরিষ্কার। বিশ্বনাথের মন্দিরের নিকটে অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরমধ্যে নানালঙ্কারবিভূষিতা অন্নপূর্ণা দেবী দণ্ডায়মানা। মন্দিরের একপার্শ্বে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি আছে। এখানে আরও অনেক বিগ্রহ বিদ্যমান—যথা, গৌরিশঙ্কর, গণেশ, হনুমান্ প্রভৃতি। কাশীতে অন্নপূর্ণা দেবীর কৃপায় কেহ অন্নকষ্ট পায় না। শ্যামাপূজার পর এস্থলে অন্নকুটযাত্রা হয়। তখন অন্নপূর্ণা দেবীর সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি নিম্নতলে অবস্থাপিত করা হয়। তৎকালে অন্নপূর্ণা দেবীর নাটমন্দিরে, বিশ্বনাথের মন্দিরে ও দুর্গাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে রাশীকৃত অন্ন সুসজ্জিত থাকে। এই সময় যাত্রীর সমাগম এত অধিক হয় যে, জনতামধ্যে প্রবেশ করিলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। এই অন্নকুটযাত্রা দেখিলে মানবের কোন কালে অন্নকষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কিয়দ্দূরে কালভৈরবের মন্দির অবস্থিত। কালভৈরবের মূর্ত্তি নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রজতময়। তিনি স্বর্ণ সিংহাসনোপরি আসীন। কথিত আছে যে, কালভৈরব কাশীতে প্রহরী স্বরূপ অবস্থান করিতেছেন। প্রবাদ প্রচলিত যে, যাহারা কাশীবাসী হয় তাহাদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে কালভৈরব তাহাকে বারাণসী হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। কালভৈরবের পূজা করিয়া যিনি যাহা কামনা করে তাহাই পাইয়া থাকেন। কালভৈরবের মন্দিরের

বামপার্শ্বে দশ অবতারের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। এই মন্দিরের নিকটে এক মন্দিরমধ্যে শীতলাদেবীর মূর্ত্তি ও নব গ্রহের মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান। নবগ্রহের মূর্ত্তি যথা—শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও কেতু। এই মন্দিরের পুরোভাগে কালকূপ নামক এক কুণ্ড আছে; এই কালকূপে স্নান করিলে পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার লাভ করেন। এই কূপটী এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, কেবলমাত্র দিবা দ্বিপ্রহরে ইহার মধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে; অন্য কোন সময়ে সূর্য্যালোক ইহাতে পতিত হয় না। কালকূপের অনতিদূরে বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির আছে। এই মন্দির কাশীর সমুদয় মন্দিরাপেক্ষা প্রাচীন শুনিলাম।

নবগ্রহের মন্দিরপার্শ্বে দণ্ডপাণির মন্দির অবস্থিত। এই দণ্ডপাণি সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এইরূপ বিবৃত আছে যে, একদা এক যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিলে মহেশ্বর তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন যে, তুমি কাশীতে অবস্থানপূর্ব্বক দণ্ড-পাণি নাম গ্রহণ করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ সাধনে যত্নবান্ হও। তদবধি সেই যক্ষ দণ্ডপাণি নামে এস্থানে বিরাজ করিতেছেন। দণ্ডপাণির মূর্ত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত ও উহা উচ্চে প্রায় তিন হস্ত পরিমিত হইবে।

কাশীর কেদার ঘাটের সন্নিকটে কেদারেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। এই অঞ্চলে অধিক বাঙ্গালীর বাস বলিয়া ইহাকে বাঙ্গালীটোলা বলে। কেদারের মন্দিরে কেদারেশ্বর ব্যতীত আরও কয়েকটি দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরপ্রাচীর

হইতে গঙ্গাবক্ষ পর্য্যন্ত প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী নামিয়াছে। তীর হইতে অনেকগুলি সোপান অবতরণ করিলে জলস্পর্শ হয়। ঘাটের নিকট গৌরীকুণ্ড অবস্থিত। কেদার ঘাটের অল্প-দূরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান ঘাট বিদ্যমান।

এখানে মহারাজ মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত মানেশ্বর-শিবলিঙ্গ আছে। এই মূর্ত্তির পশ্চিমদিকে তিলভাণ্ডেশ্বরদেবের মন্দির রহিয়াছে। প্রস্তরময় তিলভাণ্ডেশ্বর মূর্ত্তি প্রস্থে প্রায় দশ হস্ত এবং উচ্চে প্রায় তিন হস্ত হইবে। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই বিগ্রহ প্রত্যহ তিলার্দ্ধপরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছেন। এই নগরীর পশ্চিম সীমান্তে সূর্য্যকুণ্ড বা সাম্বাদিত্য তীর্থ অবস্থিত। ইহার জলে স্নান করিলে জীবগণ সর্ব্ববিধ ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হয়। স্ত্রীলোকগণ ইহাতে অবগাহন করিলে কখনও বিধবা হন না।

কাশীধামের মধ্যস্থলে ত্রিলোচন মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে। এই শিবলিঙ্গ সন্দর্শনে জীবের সংসার ভ্রমণ নিবৃত্ত হয়। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই কাশীক্ষেত্রে ত্রিলোচনদেব বিশ্বেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ ভিন্ন সমুদয় শিবলিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই বিগ্রহোৎপত্তি সম্বন্ধে কাশীমাহাত্ম্যে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে ও সেই দেহ মহেশ্বরস্কন্ধ হইতে শ্রীভগবান্ সুদর্শন চক্র দ্বারা কর্ত্তন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলে পর মহাদেব ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া কাশীতে আসিয়া ধ্যানমগ্ন হন। তৎকালে শ্রীহরি নিত্য সহস্র কমল

প্রদানপূর্ব্বক দেবাদিদেবের পূজা করিতেন। একদিন পূজা-কালে একটি পদ্ম কম হইলে বিষ্ণু নিরুপায় হইয়া স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়ের একটি উৎপাটিত করিয়া মহাদেবকে উৎসর্গ করেন। হরের কপালে ঐ নেত্র লাগিবামাত্র উহা তাঁহার তৃতীয় চক্ষু হইল এবং তদবধি তিনি ত্রিলোচন নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ত্রিলোচনদেবের মন্দিরপ্রবেশপথে এক শ্বেতপ্রস্তর-ময় বৃষভ স্থাপিত।

কাশীতে এক দুর্গাবাড়ী আছে ; তথায় দশভুজামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার দশ হস্তে দশবিধ প্রহরণ বিদ্যমান। বর্ত্তমান দুর্গাবাড়ী রাণী ভবাণী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। দুর্গাবাড়ীতে প্রত্যহ ছাগ বলি হইয়া থাকে। দুর্গাবাড়ীর মধ্যে দুর্গাকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে। উহার জল সুপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাশীতে পঞ্চঘাটের উপর পূর্ব্বে এক স্থানে বিন্দুমাধবের মন্দির ছিল। এক্ষণে সে মন্দির নাই, তথায় মুসলমানদিগের মসজিদ্ হইয়াছে। উক্ত মসজিদের চারি কোণে চারি স্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে সম্মুখের দুই স্তম্ভ অতি উচ্চ। ঐ স্তম্ভদ্বয় বেণীমাধবের-ধ্বজা নামে অভিহিত। উহা কলিকাতাস্থ মনু-মেণ্ট্ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। স্তম্ভোপরি আরোহণ করিলে কাশীর সমুদয় দৃশ্য চিত্রবৎ পরিলক্ষিত হয়।

কাশীতে এত অধিক দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে যে, তৎসমুদয়ের বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। প্রত্যেক ঘাটে ও

প্রায় সর্ব্বত্র কোন না কোন বিগ্রহ বিদ্যমান। বহু ঘাটের মধ্যে দশাশ্বমেধঘাট, কেদারঘাট, মনিকর্ণিকাঘাট প্রভৃতি প্রধান ও প্রসিদ্ধ। মণিকর্ণিকার ন্যায় পবিত্র তীর্থ কাশীতে অতি বিরল। পুরাণাদি গ্রন্থেও মণিকর্ণিকা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,

"নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
তত্রাপি মনিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্।"

এই ঘাটের পার্শ্বেই কাশীর মহাশ্মশান। তথায় দিবানিশি চিতাগ্নি প্রজ্বলিত আছে। শ্মশানের অল্পদূরে তারকেশ্বরদেবের মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে যে, তারকেশ্বর কাশীবাসিগণের অন্তিমকালে তারকব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। এই ঘাটের উপরি শ্রীভগবানের চরণচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি মর্ম্মরপ্রস্তরোপরি দুই খানি পদতলের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কাশীতে দশাশ্বমেধঘাটও এক মহাতীর্থ। কাশীখণ্ডমাহাত্ম্যে উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা এখানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

কাশীর মানমন্দির অবশ্য দর্শনীয়। জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ ইহা নির্ম্মাণ করান। এই মানমন্দিরে নানাবিধ জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক যন্ত্রাদি আছে। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি সুচারু। কাশীতে অনেক রাজা মহারাজের কীর্ত্তি-কলাপ বিদ্যমান; তন্মধ্যে নাটোরের রাণী ভবানীর কীর্ত্তি অসংখ্য। এই পুণ্যবতী রমণী এক বৎসর যাবৎ ৩৬৫টী বাড়ী এক একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। এতদ্ভিন্ন

ইনি পথঘাট পরিষ্কার ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দেন। ইনিই কাশীর পঞ্চক্রোশী পথ প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহার ছত্রবাড়ী, দণ্ডিভোজনের বাড়ী, গোপালের বাড়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কাশীবাসিগণ ইহাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা জ্ঞান করিতেন।

কাশাতে দেবী বিশালাক্ষী আছেন। ইহার মন্দির তেমন বৃহৎ নহে। ইনিই এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম। এখানে সতীদেবীর কুণ্ডল পতিত হয়।

কাশী যে কেবল ধর্ম্মস্থান তাহা নহে, ইহা শিক্ষার জন্যও চিরপ্রসিদ্ধ। এখনও এখানে সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনা যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। এখানে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। অধুনা এই পুণ্যধামে ধনকুবেরগণের ও মহারাজগণের অর্থব্যয়ে এক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। পুরাকালে নানা দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণবর্গ বেদাধ্যয়নার্থ এস্থানে আগমন করিতেন। কাশ্মীর মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক উত্তম সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। কাশী সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার এক বিখ্যাত কেন্দ্র।

এই নগরীতে বসিয়া কপিলমুনি সাংখ্যদর্শন লিখিয়াছিলেন, গৌতম মুনি ন্যায়শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, পাণিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং এই বারাণসীর উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীর পণ্ডিতপ্রবর কুল্লুক ভট্টের মনুস্মৃতির টীকারচনাস্থল ছিল।

কাশীর অপর তীরে ব্যাসকাশী বা রামনগর অবস্থিত। এদিকে গঙ্গার তটপ্রদেশ কাশীর ন্যায় উচ্চ নহে। জনসাধারণের এই বিশ্বাস যে, কাশীতে মৃত্যু ঘটিলে মানব যেমন শিবত্ব লাভ করে, তদ্রূপ এস্থানে মৃত্যু হইলে গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে যে, এই ব্যাসকাশী ব্যাসদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা। এই নগরীর উৎপত্তি বিষয়ক এক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। একদা ব্যাসদেব বারাণসীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে তদপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্যবতী নগরীনির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হন এবং তপোবলে পুরীনির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবতী ভাবিলেন যে, ব্যাসদেবের কাশী নির্ম্মিতা হইলে এই কাশী অপেক্ষা অধিকতর মহিমান্বিতা হইবে, সুতরাং লোক সকল ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাসকাশীতে বাস করিবে। এই আশঙ্কায় দেবী ব্যাসের যাহাতে পুরীনির্ম্মাণকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীবেশে ব্যাসদেবের সমীপে আগমনকরতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কি করিতেছেন?" ব্যাসদেব ছদ্মবেশধারিনী দেবীকে বলিলেন, "এই পুরীতে যাঁহার মৃত্যু হইবে, তিনি পরব্রহ্মে বিলীন হইবেন।" দেবী তখন ব্যাসদেবকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন; তিনি এই ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন কিছুই শুনিতে পান নাই ও পুনঃ পুনঃ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, এস্থানে মৃত্যু সমুপস্থিত হইলে জীবের কি হইবে? বারম্বার এই বাক্যে

ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যাসদেব ছদ্মবেশী দেবীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে, এস্থানে মরিলে লোকে গর্দ্দভ হইবে। দেবী তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ও "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এই ব্যাসকাশী নগরীতে এক ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে একটী শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছে। এই নগরীতে কাশীরাজের প্রাসাদ ও দুর্গ প্রভৃতি রহিয়াছে।

কাশী হইতে দুই ক্রোশ দূরে সারনাথ অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহা এক প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল। বৌদ্ধগণ ইহাকে এক মহাতীর্থ জ্ঞান করে। বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়া হইতে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। পূর্ব্বকালে সারনাথের নাম ছিল মৃগদাব। বৌদ্ধযুগের সময় ইহার নাম হইল বুদ্ধকাশী ও ষাড়ঙ্গনাথ। বর্ত্তমান কালে সারনাথে বৌদ্ধযুগের অনেক কীর্ত্তিকলাপ ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। এস্থানে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষিত করিবার মানসে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করেন। কালক্রমে উহা মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হয়। এক্ষণে উহা ভারতের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্জ্জনের তত্ত্বাবধানে ভগ্নাবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভোপরি চারিটী সিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে। উহাদের গঠনদৈপুণ্য প্রশংসার্হ।

সারনাথের ভগ্ন স্তূপ হইতে ক্ষুদ্রবৃহৎ বহু বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল ভগ্ন স্তূপ হইতে দগ্ধ নরকঙ্কাল, মুক্তা, পদ্মরাগমণি ও নানা বৌদ্ধাস্থিলিপি পাওয়া যাইতেছে।

লর্ড কর্জ্জন এই সকল আবিষ্কৃত দ্রব্য সংরক্ষার্থ কয়েকটী কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সারনাথের স্তূপ মাঠের মধ্যে অবস্থিত। যাহারা উহা দেখিতে যায়, তাহাদিগের জন্য এক বিশ্রামকক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। সারনাথের নষ্টপ্রায় স্তূপ হইতে নিত্য নূতন দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতেছে। সারনাথের সেই সকল ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করিয়া সর্ব্বস্বার্থত্যাগী রাজসন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের কথা হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল।

যদিও বারাণসী সকলের সুপরিচিত, তথাপি এই পবিত্রতম তীর্থের অনন্ত কাহিনী লিখিয়া প্রকাশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

কাঞ্চী।

(৫)

সেতুবন্ধ-রামেশ্বরপথে এই নগরী অবস্থিতা। মাদ্রাজ সহর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৫০ মাইল হইবে। ইহা দক্ষিণ ভারতে কাশী নামে বিখ্যাতা। কাঞ্চীপুরম্ অর্থাৎ স্বর্ণময় সহর স্থলপুরাণমতে শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বরম, এমন কি বারাণসী অপেক্ষাও পুণ্যতম। এস্থানে যাঁহারা বাস করেন ও এস্থান যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহারা তো অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন, অধিকন্তু এস্থানের পশুপক্ষিগণও ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারে।

মহাদেব বলেন যে, প্রলয়কালে ইহা বিনষ্ট হয় না; তখন ইহা তাঁহার ত্রিশূলের উপরি রক্ষিত হয়।

কাঞ্চীনগরী যে কেবল এক তীর্থস্থল তাহা নহে, ইহা অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী নগরী। ইহা দুইভাগে বিভক্ত—শিব-কাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চী। শিব-কাঞ্চীতে শিবমন্দির ও শৈবগণের প্রাধান্য ও বিষ্ণু-কাঞ্চীতে বিষ্ণুমন্দির ও বৈষ্ণবগণের আধিপত্য দেখিলাম। শুনা যায় এই কাঞ্চীনগরীতে পুরাকালে সহস্রাধিক শিবমন্দির ছিল; এক্ষনে উহার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এস্থানে আসিয়া আমরা প্রথমে শিবকাঞ্চীতে যাইলাম। অত্রত্য অধিবাসিগণ ইহাকে বারাণসী সম জ্ঞান করে। এস্থানের প্রধান বিগ্রহ একাম্রনাথদেব, দেবী ভগবতী কামাক্ষী ও শ্রীশঙ্করের প্রতিমূর্ত্তিও সমাধিস্থল অবশ্য দর্শনীয়। এতদ্ব্যতীত কৈলাসনাথ-মহাদেবের মন্দির, বৈকুণ্ঠ—পেরুমলদেবের বিষ্ণুমন্দির ও আরও অনেক শিবমন্দির আছে। একাম্রনাথের মন্দির প্রায় অর্দ্ধ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। উহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর বিদ্যমান। প্রাচীরের চারিদিকে চারি গোপুরম্ বা প্রধান প্রবেশপথ। উহাদের গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গোপুরমটী দশতলা। দেখিলাম প্রত্যেক গোপুরমেই আরোহণার্থ সোপান-শ্রেণী বিদ্যমান। উক্ত সোপান শ্রেণী এত অন্ধকারময় যে, আলোক-সাহায্য ব্যতীত আরোহণ করা যায় না।

রাত্রিকালে গোপুরমের চূড়ায় আলোক প্রদত্ত হয়। গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া এক বৃহৎ ধ্বজস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। তৎপরে এক প্রস্তরময় উৎসবমণ্ডপ প্রায় সহস্রস্তম্ভোপরি অবস্থিত। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক প্রাঙ্গণ-ভূমি পাইলাম। এই স্থানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধিমন্দির বিদ্যমান। মন্দিরমধ্যে শ্রীশঙ্করের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ প্রচলিত যে, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জীবনের শেষভাগ এই একাম্র-নাথের মন্দিরেই অতিবাহিত করেন। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিলে এই সমাধিমন্দির স্থাপিত হয়। প্রত্যহ তাঁহার পূজাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমাধি মন্দিরের কিয়দ্দূরে কামাক্ষী দেবীর মন্দির; উহা এক প্রাচীর-মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে কামাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। দেবীর গাত্রে বহুমূল্য অলঙ্কার ও মস্তকে মণিময় মুকুট শোভা পাইতেছে। এই কামাক্ষাদেবীর সম্বন্ধে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। একদা ভগবতী ক্রীড়াচ্ছলে হরের চক্ষু পশ্চাদ্ভাগ হইতে হস্ত দ্বারা আবৃত করেন। ইহাতে ত্রিভুবন অন্ধকারময় হইল; কারণ সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নি এই তিন নয়ন আচ্ছাদিত হইলে কোথা হইতে আলোক সঞ্চার হইবে? ভগবতী এতাদৃশ গর্হিত কার্য্য করায় পাপলিপ্তা হন। তখন মহাদেবাদেশে তিনি এই একাম্রনাথের মন্দিরে আসিয়া তপস্যা করিতে থাকেন। কিয়ৎকাল গত হইলে ত্রিলোচন আসিয়া দর্শন দেন এবং দেবীও পাপ হইতে বিমুক্তা হন। ইহাই

পৌরাণিকী আখ্যা। ফাল্গুন মাসে এস্থানে পঞ্চদিবস ব্যাপিয়া এক উৎসব হয়।

কামাক্ষীদেবীর মন্দির হইতে অল্পদূর গমন করিলে একাম্র-নাথদেবের মন্দির। মন্দিরের গাত্রে ও চূড়ায় অতি সুন্দর কারুকার্য্য অঙ্কিত রহিয়াছে। মন্দিরমধ্যে একাম্রনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি আছে। এই পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির মধ্যে এখানে তাঁহার ক্ষিতি-মূর্ত্তি। ইহা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় এখানে জলাভিষেক হয় না। একাম্রনাথের পূজার প্রধান অঙ্গ পুষ্পাভিষেক। ইহার এক ভোগমূর্ত্তি আছে; উৎসবকালে ঐ মূর্ত্তি মণিমুক্তা দ্বারা বিভূষিত হয়। এই দেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক বহু পুরাতন আম্রবৃক্ষ আছে। বৃক্ষটী কত কালের কেহ বলিতে পারে না। পাণ্ডাপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, উহা প্রায় ৫০০ বৎসরের পুরাতন হইবে। অত্রত্য অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, এই বৃক্ষ অনন্তকালের সাক্ষী-স্বরূপ দণ্ডায়মান। কথিত আছে যে, ইহার চারি শাখায় চতুর্ব্বিধ ফল উৎপন্ন হয়। ইহার সত্যাসত্য যাহারা ফলভক্ষণ করিয়াছেন তাহারাই বলিতে পারেন। পূর্ব্বে এই আম্রবৃক্ষে একটী সুপক্ক আম্রফল প্রত্যহ ফলিত এবং তদ্দ্বারা মহাদেবের ভোগ প্রদত্ত হইত। সেই কারণে মহাদেবের নাম একাম্রনাথ হইল।

তৎপরে আমরা বিষ্ণুকাঞ্চীতে গমন করিলাম। শিবকাঞ্চী

হইতে এই পথের দূরত্ব প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। এই পথ বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। পথের উভয়পার্শ্বে সারিবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষ থাকায় পথের শোভা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি আছে। পূর্ব্বে এক সময় এই কাঞ্চীনগরী মহাসমৃদ্ধসম্পন্না ছিল। যদাপি অধুনা পুরাকালের যৎসামান্য কীর্ত্তিকলাপ বিদ্যমান, তথাপি স্থানের সৌন্দর্য্য "নগরীষু কাঞ্চী" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদারাজস্বামীর সুন্দর মন্দির আছে। এই মন্দির শিবকাঞ্চীর মন্দির অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে যে, বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজ এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের সুবৃহৎ গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমি পাইলাম। ইহার বামভাগে এক শতস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ রহিয়াছে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে কূর্ম্মোপরি পদ্মাসনে বিষ্ণুর ভোগমূর্ত্তি উৎসবকালে স্থাপিত হয়। মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে কোটীতীর্থ নামক এক সুরম্য জলাশয় বিদ্যমান। ইহার পর আর এক প্রাকার অতিক্রম করিয়া ভগবান নৃসিংহ-দেবের মূর্ত্তি দেখিলাম। তারপর মূলমন্দির। মূল মন্দিরটী দ্বিতল; তন্মধ্যে শ্রীবরদারাজস্বামী বা বিষ্ণুকাঞ্চীপুরাধীশ্বর বিরাজ করিতেছেন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মপরিশোভিত চতুর্ভুজ ব্রহ্মণ্যদেবের কি সুন্দর ও সৌম্যমূর্ত্তি! শ্রীবিগ্রহ নানালঙ্কারে বিভূষিত ও মস্তকে মণিময় মুকুট পরিহিত রহিয়াছেন। এই বিগ্রহের নিম্নতলস্থ এক স্থানে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই বিগ্রহ

সম্বন্ধে এক পৌরাণিক ইতিহাস শুনা যায়। একদা পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই স্থানে এক অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সরস্বতী এই যজ্ঞের কথা জানিতেন না। পরে নারদের নিকট এই বৃত্তান্ত অবগতা হইয়া ক্রোধান্বিতা হন ও যজ্ঞস্থল ভাসাইবার জন্য নদীরূপ ধারণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা শ্রীহরির শরণাপন্ন হন। শ্রীভগবান্ যজ্ঞস্থলে আসিলে সরস্বতী নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ব্রহ্মাও নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। যজ্ঞান্তে সমবেত দেব ও ঋষিগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে এস্থানে অধিষ্ঠান করিতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুস্ট হইয়া শ্রীহরি বরদারাজস্বামীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এস্থানে যজ্ঞ করিলে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। ব্রহ্মা যেখানে যজ্ঞ করেন, তাহার উত্তরদ্বার নারায়ণবন, পশ্চিমদ্বার বিরিঞ্চিপুর, পূর্ব্বদ্বার মহাবলীপুর ও দক্ষিণদ্বার চিঙ্গলপুৎ। এখানে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ তীর্থ বিদ্যমান। কতকগুলি তীর্থ বারের নামে অভিহিত—যথা, রবিতীর্থ, শুক্রতীর্থ ইত্যাদি। যে বারের নামে যে তীর্থ, সেই বারে সেই তীর্থে স্নান করিলে জীবের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্চীপুর বৌদ্ধগণেরও পুণ্য তীর্থ; কারণ ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব এস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে চিন পরিব্রাজক হিয়েনসিং যখন এই নগরীতে আগমন করেন, তখন ইহা দ্রাবিড়ের রাজধানী ছিল। তৎকালে এস্থানে শতাধিক বৌদ্ধবিহার ছিল; এক্ষণে সে সকলের কিছুমাত্র নাই।

কাঞ্চীনগরীর অনতিদূরে ত্রিপুতিকুণ্ড্রম নামক স্থানে এক জৈন মন্দির আছে। উহা এক দর্শনযোগ্য স্থল।

আমরা এই নগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলাম। দেখিলাম যে, ইহারা বেশ অতিথিসৎকার-পরায়ণ। এই দাক্ষিণাত্য জনপদে ব্রাহ্মণবর্গ মৎস্য মাংস ভক্ষণ করে না। প্রায় সকলেই সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা ও বেদপাঠ করিয়া থাকেন। শিবকাঞ্চীর অধিবাসিগণ ললাটদেশে চন্দনের রেখা সোজাভাবে কাটিয়া থাকেন এবং বিষ্ণুকাঞ্চীবাসিগণ উহা ঊর্দ্ধ দিকে কাটেন। এই দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানেই দেখিলাম স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা নাই। কাঞ্চীপুরের স্ত্রীপুরুষ সকলেই বেশ সুশ্রী। স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত শ্রমশীল। ব্রাহ্মণবর্গ শূদ্রের ছায়াস্পর্শ করেন না। কাঞ্চীপুরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ। এই নগরীতে ডাকঘর, আফিস, আদালত, বিদ্যালয় ইত্যাদি বিদ্যমান আছে।

অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী।

(৬)

এই নগরী যে কেবল সপ্ত মোক্ষপ্রদ তীর্থের অন্যতম তাহা নহে, এই স্থানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ বিদ্যমান ও তদ্ব্যতীত বহু তীর্থ রহিয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন নগরী। এই

নগরী সিপ্রানদীতীরে অবস্থিত। বৈদিকযুগে ইহা অবন্তী নামে অভিহিত হইত। মহাভারতেও অবন্তী -তীর্থের নাম উল্লিখিত আছে। পরে মালবেরা এই দেশ অধিকার করিলে ইহার নাম মালব হয় এবং এই মালব রাজ্যের রাজধানীই উজ্জয়িনী নামে বিখ্যাত। এই নগরীতে প্রবলপরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্য মহারাজ বহুকাল রাজত্ব করেন এবং তাঁহার সময়ে কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন রাজসভার শোভা বৃদ্ধি করিত। নবরত্নের সভা তৎকালে ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইত। সেসময় ভারতের প্রায় সমুদয় সুধাবৃন্দ বিক্রমাদিত্যের সভা সমুজ্জ্বল রাখিত। তখন উজ্জয়িনী সত্যসত্যই রত্নশালিনী ছিল; জ্ঞানৈশ্বর্য্যে ও প্রতিভায় উজ্জয়িনী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম এক সংস্কৃত-শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়। উক্ত শ্লোক যথা,

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

বর্ত্তমান উজ্জয়িনী সে প্রাচীন কালের উজ্জয়িনী নহে। সে নগরী ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হইয়াছে। বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর দক্ষিণভাগে সেই পুরাকালের উজ্জয়িনীর ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। এক্ষণে উজ্জয়িনীর পূর্ব্ব শ্রীসমৃদ্ধি কিছুই নাই। তৎকালীন শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে মহাকবি

কালিদাস যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহার সহিত আধুনিক উজ্জয়িনীর তুলনা হইতে পারে না।

এই নগরীতে আসিয়া এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। প্রথমে আমারা মহাকালেশ্বরদর্শন করিতে যাইলাম। ইনি দ্বাদশ অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। পুরাণাদি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে "উজ্জয়িন্যাং মহাকালম্ ইতি।" মহাকালের মন্দির অতি প্রাচীন ও বৃহৎ। মহাভারতের বনপর্ব্বে মহাকালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণেও ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। মহাভারতে মহাকাল কোটিতীর্থ নামে অভিহিত ছিল। তথায় মহাকালক্ষেত্র বিষয়ক এইরূপ বিবরণ আছে—

"মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ॥"

মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ নামক মহাকাব্যে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভাবর্ণনকালে অবন্তীরাজের সহিত মহাকালের এইরূপ বিবরণ প্রদান করেন,—

"অসৌ মহাকালনিকেতনস্য বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভিঃ জ্যোৎস্নাবতো নির্ব্বিশতি প্রদোষান্॥"

এই অবন্তী নৃপতি মহাকাল চন্দ্রশেখরের অদূরে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণপক্ষেও প্রিয়তমাগণ সহ জ্যোৎস্নাময়ি রজনী উপভোগ করেন; কারণ মহাদেবের শিরঃস্থিত চন্দ্রকিরণে উক্ত নগরী সদাই সমুদ্ভাসিত।

মহাকালের মন্দির সোমনাথের মন্দির সদৃশ ছিল। ইহার সুবৃহৎ স্তম্ভ সকল মুক্তাখচিত ছিল। এক্ষণে আর মণিমাণিক্য নাই, মন্দিরে কেবলমাত্র সুবর্ণকলস বিদ্যমান আছে। মুসলমানগণের রাজত্বকালে মন্দিরের সমুদয় ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়। তৎকালে পাণ্ডাগণ লিঙ্গমূর্ত্তিকে মন্দির হইতে অপসারিত করিয়া ভূগর্ভমধ্যে এক পাষাণময় মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও উক্ত বিগ্রহ তথায় অবস্থাপিত আছে। এক সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়া ও কতিপয় পাষাণনির্ম্মিতা সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া কৃষ্ণপ্রস্তরময় মন্দিরে মহাকালদেবের দর্শনলাভ করিলাম। মন্দিরের চতুর্দ্দিক সূচিভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত। শ্রীবিগ্রহের চতুঃপার্শ্বে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোকেই অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইতেছে। তথায় বায়ু প্রবেশের পথ না থাকায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। পূজান্তে সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইলাম। সুড়ঙ্গের বহির্ভাগে এক জলাশয় আছে। তাহার চারিদিক প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত।

তারপর কেদারেশ্বর মহাদেবকে দেখিতে যাইলাম। কেদারেশ্বরের মন্দির মহাকালের মন্দিরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ক্ষুদ্র এক মন্দিরমধ্যে কেদারেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তি সন্দর্শনে মানবের অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়। এই শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে এক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। কোন সময়ে কয়েকজন মহর্ষি কেদারনাথদেবের দর্শনাভিলাষে হিমাদ্রিশেখরে আরোহণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহাদেবের নিকট তৎপ্রতীকার

প্রার্থনা করেন। মহেশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দৈববাণী দ্বারা জানাইলেন, "তোমারা উজ্জয়িণী নগরীতে মহাকালের বনে যাইয়া সিপ্রানদীতীরে আমার দর্শন পাইবে।" এই দৈববাণী শ্রবণান্তর মহর্ষিগণ তথায় আগমন করিয়া নদী-বক্ষে এক শিলা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে কেদারেশ্বর জানিয়া মন্দিরনির্ম্মাণকরতঃ তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

তৎপরে কালীয়দীঘিদর্শনার্থ গমন করিলাম। পথটী এক প্রান্তরমধ্য দিয়া গিয়াছে। পৌরাণিক মতে কালীয়দীঘি ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত হইত। কালীয়দীঘিতটে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বিরাজমান। দীঘির মধ্যস্থলে একটী দ্বীপের ন্যায় স্থান আছে; তথায় এক জলপ্রাসাদ অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন যে, এই প্রাসাদ মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে তিনি এস্থানে বাস করিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নাসিরুদ্দিন মহম্মদ ইহা প্রস্তুত করান। মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার নামক কাব্যে ইহার বিষয় উল্লিখিত থাকায়, আমাদের মনে হয় এই প্রাসাদ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদের নির্ম্মাণপ্রণালী অতি চমৎকার। নিয়ত জলস্রোত লাগিলেও প্রাসাদের অংশমাত্রও বিনষ্ট হয় নাই। প্রাসাদের প্রাচীরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

কালীয়দীঘির প্রায় এক মাইল দূরে হর্ষদ্বীপ অবস্থিত। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। তথায় এক দেবমন্দির বিদ্যমান। পূর্ব্বে এই দেবালয়ের চতুঃপার্শ্বে বহুদূর ব্যাপিয়া

সরোবর সমূহ ছিল, এক্ষণে উঁহাদের জল বিশুষ্ক হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে বিশালকায়া পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তি বিরাজমানা। লোলরসনা কালিকাদেবী বৃহদাকার শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা আছেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক সুবৃহৎ যূপকাষ্ঠ প্রোথিত আছে। পূর্ব্বে এস্থানে নরবলি হইত শুনিলাম।

সিপ্রা নদীর দক্ষিণতটে ভৈরবগড় আছে। উহা অবশ্য দর্শনযোগ্য। গড়টীর আকার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত। গড়ের ভিতর এক দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে কালভৈরবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তি বহুকালের পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরটী সিন্ধিয়া মহারাজ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই কালভৈরব উজ্জয়িনী নগরীকে রক্ষা করিতেছেন।

ভৈরবগড়ের অনতিদূরে সিপ্রানদীতীরে ভৃগুগুহা অবস্থিত। এই স্থান লোকালয়শূন্য। এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রস্তরময় সোপানাবলী অবতরণান্তে ভূগর্ভস্থ স্থান পাইলাম। তথায় সরলভাবে দণ্ডায়মান হওয়া যায় না। গুহামধ্যে বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান। এস্থানে কয়েকটী লিঙ্গমূর্ত্তি রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য মূর্ত্তিদর্শনান্তর গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

তথা হইতে সন্দীপনী মুনির আশ্রমে আসিলাম। আশ্রমটী বেশ মনোরম ও শান্তিপ্রদ। সে স্থানে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই আশ্রমের নিকট অঙ্কপাত তীর্থ। কথিত আছে

যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সন্দীপনী মুনির নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়া এই স্থানে সর্ব্বপ্রথম অঙ্কপাত শিক্ষা করেন। এই তীর্থের কিয়দ্দূরে বিষ্ণুসাগর, দামোদর প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন কুণ্ড আছে।

উজ্জয়িনী নগরীর অগ্নিকোণে যোগসিদ্ধ নামে এক পর্ব্বত আছে। জনপ্রবাদ এই যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন ইঁহার নিম্নে প্রোথিত ছিল। সেই সিংহাসনের ৩২টী পায়ায় ৩২টী গন্ধর্ব্বকুমারী অলক্ষে বাস করিতেন। যাহা হউক, ভারতে যে সকল হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য তাঁহাদের মধ্যে যে একজন বিশেষ বিখ্যাত ও যশস্বী নৃপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে স্থানে তিনি সিদ্ধ হন, সেস্থানে এক কালী মন্দির আছে। ইহা সহর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিজনবনে এক মন্দিরমধ্যে কালীমূর্ত্তি আছে। এস্থানে কোনও পুরোহিত থাকে না। প্রত্যহ পূজাসমাপনান্তে তিনি চলিয়া যান। এখান হইতে কিয়দ্দূরে সিপ্রানদীতীরে শ্মশানভূমি রহিয়াছে। পথিপার্শ্বে নরকঙ্কাল পরিলক্ষিত হয়। এস্থানে মঙ্গলেশ্বর, সহস্রধনুকেশ্বর, দত্তাত্রেয়, সরস্বতী দেবী প্রভৃতি অনেক দেব দেবী আছেন। সরস্বতী দেবীর মন্দিরে কতকগুলি মাতৃকামূর্ত্তি দেখিলাম।

উজ্জয়িনীতে সিদ্ধনাগের ঘাট সুপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, এই ঘাটে পুরাকালে নাগকন্যাগণ জলক্রীড়ার্থ আগমন করিতেন।

এই নগরীতে জৈনগণের অনেক মঠ আছে। সেই সকল মঠের কতকগুলি হিন্দুমন্দিরে এখন পরিণত হইয়াছে। এই নগরীতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। নগরীর চতুর্দ্দিকেই ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভ হইতে উজ্জয়িণীর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রাচীন উজ্জয়িণী যে স্থানে ভূগর্ভে নিহিত হইযাছে, তাহাব মৃত্তিকা হইতে এক্ষণে বহু হীরা জহরৎ ইত্যাদি পাওয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যাকালে মহাকালের আরত্রিক ক্রিয়া দেখিতে যাইলাম। উহা এক দর্শনযোগ্য বিষয়। আরতিকালে মহাকালের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হয়। তখন তিনি কৌষেয় বসন পরিধান করেন ও মস্তকে মুকুট ও গাত্রে মণিমুক্তা ধারণ করেন। অন্য সময়ে তাঁহার জটাজুটশোভিত ভস্মানুলেপিত দিগম্বর মূর্ত্তি বিরাজ করে। প্রতি সোমবার মন্দিরের সেবকগণ পঞ্চমুখী মুকুট জলাশয়তীরে আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্রসহকারে উহা বিধৌত করিয়া মহাকালের মস্তকে পরাইয়া দেন। এই দেবমন্দিরের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ তৈলঙ্গ বিপ্রবর্গ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। মহাকাল জ্যোতির্লিঙ্গের অপর এক নাম অনন্তকল্পেশ্বর। সাধারণতঃ তিনি ঐ নামে পরিচিত। মহাকালের আরতি সম্বন্ধে কালিদাসের মেঘদূতে এক শ্লোক পাওয়া যায়, তথায় বিরহীযক্ষ জলধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।

কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্
আমন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্।”

হে জলধর, তুমি সন্ধ্যা ব্যতীত অন্য সময়ে মহাকালে গমন করিলে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবে। ইহার কারণ এই যে, সন্ধ্যাকালে মহাদেবের আরত্রিক ক্রিয়াকালে তোমার ঈষৎ গম্ভীরধ্বনি পটহধ্বনির কার্য্য করিয়া অবিকল ফললাভ করিবে।

উজ্জয়িণীতে গুজরাট প্রদেশীয় বিপ্রের সংখ্যা অধিক। এখানে সংস্কৃত শাস্ত্রের যথেষ্ট পরিমাণে আলোচনা হয়। এই নগরীর শাসনভার ইংরাজ বাহাদুরের মিত্ররাজ গোয়ালিয়র-মহারাজের উপরি ন্যস্ত আছে।

পুরী-দ্বারাবতী বা দ্বারকা।

(৭)

এই মোক্ষদায়ক তীর্থের বিবরণ তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

—০—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০-:-০—

কাশ্মীরে অমরনাথ।

—:০:—

সন ১৩২৯ সালের ২৪শে আষাঢ় আমি দুইজন বন্ধু সহ কাশ্মীর প্রদেশস্থ অমরনাথ তীর্থাভিমুখে বহির্গত হইলাম। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে ৺অমরনাথদেবের দর্শনলাভ হয়। কেবলমাত্র সেই সময় কাশ্মীর মহারাজের লোক সকল তাম্বু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাত্রিবর্গের সহিত অমরনাথক্ষেত্রে গমন করে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সময়ে যাইবার উপায় নাই।

প্রথমে আমরা পঞ্জাব মেলে অম্বালা কাণ্টন্মেণ্ট্ ষ্টেশনে উপনীত হই ও তথা হইতে অমৃতসরে আসি। অম্বালার পথে দর্শনযোগ্য অনেক স্থান আছে। অমৃতসর সম্বন্ধে দু'একটী প্রধান বিষয় উল্লিখিত করিব। হিন্দুদিগের নিকট কাশী যেরূপ পুণ্যতীর্থ, শিখগণের নিকট অমৃতসর তদ্রূপ। অমৃতসর সরোবরের মধ্যস্থলে রামদাস স্বামীর সুবিখ্যাত সুবর্ণময় মন্দির অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে শিখগুরু নানকের গ্রন্থসাহেব প্রতিষ্ঠিত। ইহাই শিখগণের প্রধান উপাস্য দেবতা। অমৃতসরে অটলেশ্বরের মন্দির, গোবিন্দগড়, রামবাগ, কেশরবাগ প্রভৃতি দর্শনীয়।

অমৃতসর পরিত্যাগপূর্ব্বক এক শাখা লাইন দিয়া পাঠান-কোট্ ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। তথা হইতে কাংরা উপত্যকায় বজ্রেশ্বরী দেবীর দর্শনলাভ করিয়া জ্বালামুখীতে আসিলাম। জলন্ধর ষ্টেশন হইতেও কেহ কেহ জ্বালামুখীতে আসিয়া থাকেন, কিন্তু এই পথ দুর্গম। পাঠানকোটের পথ বেশ পরিষ্কার।

জ্বালামুখী হিন্দুগণের এক মহাতীর্থ। ইহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম বলিয়া বিখ্যাত। এস্থানে সতীর জিহ্বা পতিত হয়। জ্বালামুখীর মন্দিরে কোনও দেবমূর্ত্তি নাই। মন্দিরে কুণ্ডদেবী উল্কাময়ী নামে অভিহিতা। মন্দিরমধ্যে তিনচারি স্থান হইতে লক্ লক্ করিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। মন্দিরস্থ কুলাঙ্গীতে এক ক্ষীণকায়া দীপশিখা প্রজ্বলিতা আছে। পাণ্ডাগণ এই দীপশিখাকে দেবীর জিহ্বা বলে। এখানে এক পর্ব্বতোপরি সিদ্ধনাগার্জ্জুন, উন্মত্তভৈরব ও আরও কয়েকটী দেবমূর্ত্তি আছে। এস্থানের ভৈরব অম্বিকেশ্বর। জ্বালামুখীর মন্দির-পার্শ্বে এক কুণ্ড আছে, স্থানীয় জনসাধারণ উহাকে জাহ্নবীর ন্যায় পবিত্র বিবেচনা করে। পর্ব্বতগাত্র হইতে বারি বিনির্গত হইয়া এই কুণ্ডে পতিত হয়। যাত্রিগণ এই কুণ্ডবারি দ্বারা তর্পণাদি করিয়া থাকে। এখানে অনেক দেবালয়, ধর্ম্মশালা ও পান্থনিবাস আছে। নগরের ছয় স্থানে ছয়টী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; সেই সকল প্রস্রবণের জলপান করিলে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। জ্বালামুখীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার।

তদনন্তর আমরা পঞ্জাব নগরের রাজধানী লাহোরে উপস্থিত হইলাম। কিংবদন্তী আছে, যে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব এই নগর স্থাপিত করেন। এই নগরের পশ্চিমভাগে রাবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। আনারকলি নামক স্থান লাহোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাংশ। এই স্থান বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এই লাহোর সহর কলিকাতা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। এই নগরের সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য স্থল —সালেমার বাগ—সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই নগরে কার্য্যোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী বাস করে। তাহাদিগের যত্নে এস্থানে এক কালীবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

তারপর আমরা রাবলপিণ্ডিতে গমন করিলাম। এখানেও বঙ্গবাসীর উদ্যোগে এক কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিতা আছে। আমরা উক্ত কালীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। পঞ্জাবের মধ্যে রাবলপিণ্ডি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে শীতের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী। এখানে বহুসংখ্যক সেনা বাস করে। এখানকার নদীর উপর এক নৌসেতু আছে, তাহা নদীর পরপারস্থিত আটক নগরের দুর্গ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। বর্ত্তমানকালে রাবলপিণ্ডি হইয়াই কাশ্মীরে যাওয়া সুবিধাজনক। সকলেই প্রায় এই পথে গমন করিয়া থাকে।

কাশ্মীরে যাইবার ৪।৫ পথ আছে; তন্মধ্যে রাবলপিণ্ডি হইতে মরীপাহাড়ের নিম্ন দিয়া ও ঝিলাম নদীর পার্শ্ব দিয়া যে পথ কাশ্মীর অভিমুখে গিয়াছে সে পথ দূর হইলেও অন্যান্য পথ

অপেক্ষা সহজ। এই পথ দিয়াই কাশ্মীরের মহারাজ ও জনসাধারণ 'যাতায়াত করে। রাবলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর প্রায় ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথে যাইতে মোটর গাড়ী, টঙ্গা, ঘোড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়; অনতিকাল মধ্যে শ্রীনগরে পঁহুছিতে পারিব বলিয়া আমি মোটর গাড়ীতে রওনা হইলাম। রাবলপিণ্ডি হইতে 'শ্রীনগর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে সরকারী ডাক বাঙ্গালা আছে; মোটর গাড়ীর ভাড়া পৌনে দুই শত টাকা লাগিল। মোটর গাড়ীতে প্রথম দিবস প্রায় ৬ ঘণ্টা যাইয়া গড়ী নামক এক সরকারী ডাক বাঙ্গালায় আশ্রয় লইলাম ও তৎপর দিবস সকাল হইতে প্রায় ৫ ঘণ্টা যাইয়া শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম। মোটর-লরীতে যাইলে আরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়। টঙ্গায় প্রায় ৩ দিবস ও একায় ৫।৬ দিবস লাগে।

ডুমেল, কোহালা রামপুর, উড়ি, চকোটী, বারাহমূলা নামক স্থানে সরকারী ডাক বাঙ্গালা আছে। মরী পাহাড়ের নিকট বড় শীত। এই পর্ব্বত সমুদ্রতল হইতে প্রায় ৯০০০ ফিট্ উচ্চ হইবে। মরী হইতে ডুমেল পথ অতি সুগম, সরল ও প্রশস্ত। এই পথ মনোরম উপত্যকা ও অরণ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে। ডুমেল এক ক্ষুদ্র পল্লী, এখানে বিশ্রাম ভবন আছে। ডুমেল হইতে প্রথম ৪।৫ মাইল অতি সুগম উৎরাই দিয়া বিতস্তা নদীগর্ভে নামিতে হয়। পরে নদীতট দিয়া এক পথ কোহালা অভিমুখে গিয়াছে। কোহালা এক ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার সম্মুখ দিয়া

বিতস্তা নদী প্রবাহিতা হইতেছে। এই নদী কাশ্মীর রাজ্য ও ইংরাজ রাজ্যকে পৃথক রাখিয়াছে। তৎপরে উড়ী নামক স্থান। এই অংশে অনেক চড়াই ও উৎরাই আছে। পথটী দুর্গম ও অসরল। উড়ী হইতে প্রায় ২৪ মাইল দূরে বারাহামূলা নামক বৃহৎ জনপদ অবস্থিত। এই স্থান হইতে গুলমর্গে যাইবার এক পথ আছে। এই সহরের নিকট দিয়া বিতস্তা নদী বহিতেছে। শ্রীনগরের পথ এখান হইতে বেশ সরল ও সমতল। এখানে নদীর স্রোতও কম। এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী থাকায় নৈসর্গিক শোভা বড়ই প্রীতিদায়ক। বারাহা-মূলা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বেই পপলার বৃক্ষ-শ্রেণী পথশোভা বৰ্দ্ধিত করিতেছে।

কাশ্মীর উপত্যকা এক সুবিস্তৃত সমভূমি। ইহার রাজধানী শ্রীনগরের মধ্য দিয়া ঝিলাম নদী প্রবাহিতা হইতেছে। শ্রীনগরে ঝিলামের উপর সাতটী সেতু আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে (১) মীরাকদল, (২) হাবাকদল, (৩) ফতেকদল, (৪) জনাকদল, (৫) আলীকদল, (৬) নয়াকদল ও (৭) সাফাকদল। কেবলমাত্র মীরাকদলের উপর দিয়া গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে।

কাশ্মীর প্রদেশ সমুদ্রতট হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই উপত্যকার কোন এক অংশে সতীদেবীর কণ্ঠ-দেশ পতিত হয়, সেজন্য সমুদয় উপত্যকাকে সারদাপীঠ কহে। কাশ্মীর শব্দের উৎপত্তি বিষয়ক নানা মতভেদ আছে। প্রফেসার

উইলসন্ সাহেবের মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলেন যে, এস্থানে কশ্যপ মুনির আশ্রম থাকায় ইহা কাশ্মীর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে পরিভ্রমণকালে এ স্থানে আসিয়া কিয়ৎকাল বাস করেন ও অনেক দেবালয় স্থাপিত করেন।

কাশ্মীরে স্থল অপেক্ষা জলভাগ অধিক। ডল ও উলর হ্রদ, নানা নদীশাখা ও নির্ঝরিণী থাকায় এখানকার জমী অত্যন্ত উর্ব্বরা। ধান্য ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ উদ্ভিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আঙ্গুর, নাসপাতি, বেদানা, বাদাম প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মায়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে কেশর বা জাফরান অতি উৎকৃষ্ট। শ্রীনগর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে পাম্পুর নামক স্থানে ইহা উৎপন্ন হয়। এই জাফরান আরও অনেক প্রদেশে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কাশ্মীর প্রদেশজাত জাফরান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কাশ্মীরে দ্রষ্টব্য অনেক স্থল আছে। সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে পর্য্যটকগণ ইহার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ আগমন করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে ইহাকে যথার্থই ভূস্বর্গ বলিয়া বোধ হয়। এখানকার ডল অর্থাৎ নাগরিক হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় দেড় ক্রোশ হইবে। ইহা অত্যন্ত গভীর। হ্রদের জল বেশ স্বচ্ছ! এই হ্রদে প্রচুর পরিমাণে পানফল জন্মে। তথায় যখন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তখন হ্রদের দৃশ্য কি চমৎকার দেখায়!

হ্রদের পশ্চিম দিকে হরি পর্ব্বত বিদ্যমান। এই পর্ব্বতোপরি পুরাতন দুর্গ অবস্থিত। দুর্গমধ্যে এক মন্দিরে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

ডলহ্রদের ঈশানকোণে শালামার-বাগ (শালা = গৃহ এবং মার = কন্দর্প)। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদ্যান। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ইহা নির্ম্মিত করেন। উপবনটী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

সালেমার-বাগের অনতিদূরে সুরম্যক্রীড়াকুঞ্জ নিষাদবাগ অবস্থিত। পারস্য ভাষায় নিষাদ শব্দের অর্থ আনন্দ।

ডলহ্রদের পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি চিসাই নামক এক সুন্দর ঝরণা আছে। হ্রদেব দক্ষিণদিকে এক উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে পরীভবন অবস্থিত। শুনিলাম যে, পূর্ব্বে ইহা অতি রম্য স্থান ছিল, এক্ষনে ইহাব সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। পরীভবনের উপরিভাগ হইতে হ্রদটী অতি সুন্দর দেখায়।

কাশ্মীরে মহারাজের প্রাসাদ আছে। জম্বু সহরে মহারাজের শীতাবাস ও ঝিলাম নদীর উপব গ্রীষ্মাবাস রহিয়াছে। গুলমর্গেও এক গ্রীষ্মাবাস বিদ্যমান।

শ্রীনগর হইতে প্রায় ২৫মাইল দূরে উলার নামক এক সুন্দর হ্রদ আছে। এই হ্রদ কাশ্মীর প্রদেশের সকল হ্রদ অপেক্ষা বৃহৎ। বিতস্তা নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ ও প্রস্থে ৫ ক্রোশ হইবে। কাশ্মীরের রাজধানীর সমুদয় জল সরবরাহ হারবন্দ হইতে হয়।

কাশ্মীরে কয়েকটী আশ্চর্য্যজনক নৈসর্গিক স্থান আছে। শ্রীনগর হইতে প্রায় ৭।৮ মাইল দূরে ক্ষীরভবানী নামে এক কুণ্ড আছে। কুণ্ডের মধ্যস্থলে ইষ্টকময় এক ক্ষুদ্র আসনোপরি ধ্বজপতাকা সংস্থাপিতা। ইহাই ক্ষীর ভবানী দেবী। হিন্দুগণের ইহা এক তীর্থস্থল। যাত্রিগণ ইহাতে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া নিক্ষেপ করায় ইহার নাম ক্ষীরভবানী হইল। এস্থানের আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কুণ্ডের জল সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়। কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নানাবিধ বর্ণ পরিলক্ষিত হয়, আবার কখনও বা একই বর্ণ উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস দৃষ্ট হয়।

শ্রীনগর হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে বনহামা নাম্নী এক পল্লী আছে। তথায় প্রায় ৭৫ ফিট্ উচ্চ ও ঈষদ্ ঢালু এক ভূভাগ আছে। উহা নানাবিধ তরুলতা ও বিহঙ্গকুলে পরিপূর্ণ। উক্ত ভূখণ্ড সমুদয় বৎসর শুষ্ক থাকে, কিন্তু প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে উহা জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখন লোকসকল ইহাতে স্নান করে। ইহাকে জটগঙ্গা কহে। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই স্থানে যোগীশ্বর মহাদেব বসিয়া আছেন এবং তাঁহারই জটাজুট হইতে জাহ্নবী বিনিঃসৃতা হইয়া এইস্থান ভাসাইয়া দেন।

শ্রীনগর হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে শঙ্করাচার্য্য বা তখ্ত-স্থলেমন নামক এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই পর্ব্বত শ্রীনগর হইতে প্রায় সহস্র ফিট্ উচ্চ

হইবে। ইহার উপর আরোহণ করিলে শ্রীনগরকে এক খানি ছবির ন্যায় দেখায়।

কাশ্মীরে অধিকাংশ পর্ব্বতশিখর সমভূমি ও সুবিস্তৃত। ইহাদিগকে মর্গ বা ক্ষেত্র কহে। এই সকল মর্গের মধ্যে গুল্‌মর্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা শ্রীনগর হইতে প্রায় ২৪।২৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আমরা মোটরগাড়ী করিয়া তথায় যাইলাম। গুলমর্গ শ্রীনগরের সমভূমি হইতে প্রায় ৩০০০ ফিট্ উচ্চ হইবে। এস্থানে বহুবিধ পুষ্প বিকশিত থাকায় এস্থানের নাম গুলমর্গ হইয়াছে। শ্রীনগরে অল্প গরম পড়িলে অনেক সাহেব মেম এস্থানে আগমন করে। শ্রীনগর হইতে এই পাহাড় অতি সুন্দর দেখায়। যাহারা ভ্রমণার্থ এস্থানে আগমন করেন, তাহারা আপনাদের সঙ্গে তাঁবু আনয়ন করেন। এখানে দুগ্ধ ও মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

গুলমর্গ হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে কিল্লন নামে এক রমণীয় মর্গ আছে। ইহা গুলমর্গ অপেক্ষা বৃহৎ হইলেও সৌন্দর্য্যবিষয়ে অনেকাংশে হীন। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে বৃহদাকার তুষাররাশি (গ্লেসিয়ার) আছে। এখানে গুলমর্গ অপেক্ষা অধিকতর বারিবর্ষণ হয়। এখানে বহুসংখ্যক উৎস বিদ্যমান।

কাশ্মীর শাল প্রভৃতি ঊর্ণাবস্ত্রের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। এখানকার সিল্কের কারখানাও অবশ্য দর্শনীয়।

কাশ্মীরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।

অনেক হিন্দু ও মুসলমানের নাম উভয় নামের একত্র সম্মিলনে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের আচার ব্যবহারেও অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান হইতে হিন্দু নির্ণয় করা সুকঠিন। হিন্দুগণের কপালে কেশর ও চন্দনের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই, যদ্দারা উভয় জাতির পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ছত্রী বা শূদ্র এই দুই বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার তন্মধ্যে অধিকাংশই শৈব।

শ্রীনগরের নিকট নাওসেরা নামক স্থানে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়, উহা দেখিতে ঠিক পার্চমেণ্ট্ কাগজের ন্যায় সুচিক্কণ। এখানে কাগজের সুন্দর দ্রব্যাদি গঠিত হয়। কাশ্মীরে কস্তুরী ও মৃগনাভি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কাশ্মীরাধিবাসীগণ এক্ষণে যে ভাষায় কথা কহে, তাহা নানাবিধ ভাষা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। উহাতে পাঞ্জাবী, হিন্দী ও সিন্ধী ভাষার সংমিশ্রণ আছে।

পুরাকালে কাশ্মীরে সংস্কৃত শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল, পরে মুসলমানদিগের রাজত্বকালে উহা লুপ্তপ্রায় অবস্থায় পতিত হয়। অধুনা পুনরায় হিন্দু নরপতি উহাকে উদ্দীপিত করিতে সচেষ্ট আছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে অনেক সুদক্ষ পণ্ডিত জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার্থ নিযুক্ত আছেন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে সকল পণ্ডিতকেই এখানে একবার

আসিতে হইত। শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করও এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীনগরে অধিকাংশই কাষ্ঠনিকেতন। কাশ্মীরীভাষায় ইহাকে লডী বলে। এখানকার গৃহের ছাদ সমতল নহে, মধ্যদেশ উচ্চ ও দুইপার্শ্ব ঢালু। ছাদে কাষ্ঠ ও তক্তার উপরি ভূর্জ্জপত্র বিস্তৃত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকা লেপিত হয়। বসন্তকালে ইহাতে তৃণ উদ্‌গত হইলে গৃহরাজি হরিদ্বর্ণ গালিচার ন্যায় দৃষ্ট হয়। ভাল কাঠের বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। বিদেশীযগণের পক্ষে নৌকাতে বাস করা সুবিধাজনক। বড় হাউস্ বোটে পাশাপাশি ৪।৫ খানা ঘর থাকে। উহা শয়ন, ভোজন ও বিশ্রামাদির জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী। বড় হাউস্ বোটে রন্ধনার্থ এক স্বতন্ত্র ডোঙ্গা এবং ভ্রমণার্থ একখানি ছোট শিকারা সংলগ্ন থাকে।

কাশ্মীরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। এখানে নদীর ও উৎসের জল নির্ম্মল, শীতল ও পুষ্টিকর। বায়ু পরিষ্কার ও ধূলিকণা বিবর্জ্জিত। এখানে বর্ষাকালে বারিবর্ষণ না হইয়া শীতকালে যখন তুষারপাত হইতে থাকে তখন ঝটিকা, বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হয়; তবে বৃষ্টি অল্পপরিমাণেই হইয়া থাকে।

কাশ্মীরের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। পর্ব্বতগাত্রেও শস্যক্ষেত্র সকল আছে, তথায় প্রচুর বাদাম, আক্‌রোট্ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এমন কি, যেখানে কৃষকগণ লাঙ্গল দিতে না পারে, তথায়ও সুমিষ্ট ফল স্বতঃই সমুৎপন্ন হয়। কাশ্মীর প্রদেশের

স্থানে স্থানে পাইন, দেদার প্রভৃতি নানা মূল্যবান্ বৃক্ষ সকল জন্মায়।

কাশ্মীরে হিমালয় প্রদেশের অনেক জীব জন্তু আছে। এস্থানের অধিকাংশ গাভী খর্ব্বাকৃতি ও কৃষ্ণকায়া। লোকে সাধারণতঃ কহিয়া থাকে "ধেনুষু কৃষ্ণা বহুক্ষীরা।" কাশ্মীরে অনেক স্থানে লৌহ, সীসা ও তাম্রের খনি আছে।

শ্রীনগরে তিন সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া ভূস্বর্গের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার পর ৺অমরনাথক্ষেত্রে যাত্রা করিবার দিন সমাগত হইল। ৺অমরনাথদেবের দর্শন লাভ কেবল মাত্র শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে হয়। এবার ২২শে শ্রাবণ সোমবার শ্রাবণী পূর্ণিমা। অমরনাথের প্রতিভূস্বরূপ ছড়ী কাশ্মীর মহারাজ পূজা করিয়া দিলে সেই ছড়ী মার্ত্তণ্ড বা মটন নামক স্থানে আনীত হয়। ছড়ী দেখিয়া যাত্রিবৃন্দ সমবেত হয় ও অগ্রে উহা বহির্গত হইলে পর যাত্রিগণ যাত্রারম্ভ করে। ছড়ী অমরনাথক্ষেত্রে পঁহুছিতে সাতদিন লাগিল।

১২ই শ্রাবণ, শুক্রবার—অদ্য প্রাতে এক টঙ্গা ভাড়া করিয়া মার্ত্তণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উহা শ্রীনগর হইতে প্রায় ৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীনগরের প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে স্বর্গীয় কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহের সমাধি মন্দির আছে। স্থানটী বেশ নির্জ্জন; তথায় সাধু সন্ন্যাসী গণের থাকিবার স্থান আছে। দুধগঙ্গা নাম্নী এক নদী তথায় প্রবাহিতা হইতেছে। নাম শুনিয়া কেহ যেন না মনে করেন

যে, ইহা জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধে পরিপূর্ণ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ইহার জল দুগ্ধ ছিল। এক্ষণে যদিও ইহার জল দুগ্ধ নহে, তথাপি ইহা নির্ম্মল ও পুষ্টিকর। এইস্থানের নাম রামমুনসীবাগ। এখানে অনেক মঠ স্থাপিত আছে। এই সকল মঠে সাধু সন্ন্যাসীদিগের 'সাহায্যার্থ ধর্ম্মার্থ-বিভাগ হইতে অনেক অর্থ প্রদত্ত হয়।

রামবাগ অতিক্রম করিয়া পাণ্ড্রতনে উপস্থিত হইলাম। কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, একদা ইহা কাশ্মীরের রাজধানী ছিল; তখন ইহার যথেষ্ট শ্রীসমৃদ্ধি ছিল। এক্ষণে নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। চতুর্দ্দিকে দেবালয়ের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়।

পাণ্ড্রতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা কালীশনাগে আসিলাম। এখানে কতকগুলি উৎস আছে; তাহাদের জলে অধিক পরিমাণে লৌহ ও গন্ধক মিশ্রিত থাকে বলিয়া উক্ত জল অতি স্বাস্থ্যকর।

তারপর বিজ্‌বেহারা পাইলাম। বোধ হয় ইহা সংস্কৃত বিদ্যাবিহার শব্দের অপভ্রংশ হইবে। এক কালে এই নগরী অতি সমৃদ্ধিযুক্তা ছিল।

অতঃপর আমরা অনন্তনাগ বা ইসলামাবাদে উপস্থিত হইলাম। শ্রীনগর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩৪ মাইল হইবে। হিন্দুগণের অভ্যুদয়কালে ইহার নাম অনন্তনাগ ছিল। পরে ইহা মুসলমানগণের হস্তগত হইলে ইহার নাম ইসলামাবাদ

হয় এবং তদবধি উক্ত নামেই ভূগোলে বিখ্যাত। কথিত আছে যে, ইহা নাগরাজের বাসভবন ছিল। এস্থানে কয়েকটী উত্তম উৎস আছে, তন্মধ্যে অনন্তনাগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা এক পর্ব্বতের তলদেশ হইতে বিনির্গত হইয়া এক কুণ্ডমধ্যে পড়িতেছে। কুণ্ডটী বেশী গভীর নহে; তথায় অসংখ্য মৎস্য নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। এখান হইতে কিয়দ্দূরে বাণভট্টের কাদম্বরী—উল্লিখিত অচ্ছোদ সরোবর অবস্থিত।

অনন্তনাগ পরিত্যাগ করিয়া আরও ৫ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক আমরা মার্ত্তণ্ডে উপনীত হইলাম। ইহার অপর নাম মটন। এস্থানে আসিতে বেলা ১২টা হইল। এখানে ৪দিন অতিবাহিত করিতে হইল; কারণ অমরনাথের ছড়ী বাহির হইয়া না যাইলে যাত্রী ছাড়া হয় না। ইতিমধ্যে আমার গমনোপযোগী দাণ্ডী, বাহক, পাচক ও তাম্বু প্রভৃতি সংগৃহীত হইল। মার্ত্তণ্ডেই পাণ্ডাগণের বাস। এখানে প্রায় ২০০ ঘর পাণ্ডা বাস করে। এস্থান হইতেই দাণ্ডী, ঝাম্পান, অশ্ব ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। যাত্রিগণকে তাম্বু লইয়া যাইতে হয়; কারণ কেদার-বদ্রীর পথে যেমন ২।৩ মাইল অন্তর চটী আছে, এখানে সেরূপ কিছুই নাই। খাদ্য দ্রব্য যাত্রিগণের সঙ্গে সঙ্গে যায়। মার্ত্তণ্ড স্থানটী বেশ সুন্দর। এখানে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে। সেই সকল স্থান অনন্তনাগ হইতে নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অনন্তনাগে বাসোপযোগী স্থান না থাকায় প্রায় সকলেই মার্ত্তণ্ড হইতেই উহা দেখিতে যায়।

মার্ত্তণ্ড হিন্দুগণের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ। আমাদের দেশে জনগণ যেমন গয়াক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের পিণ্ড প্রদান করে, এখানে সেইরূপ কাশ্মীরাধিবাসিগণ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে। এখানে মার্ত্তণ্ডের এক মন্দির আছে। অনেকগুলি জীর্ণ মন্দির দেখিলাম। কেহ কেহ বলেন, এই জীর্ণ দেবালয় সকল পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীর-বাসিগণ ইহাদিগকে পাণ্ডুলড়ী কহে।

মার্ত্তণ্ড হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে ববন নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেখানে এক উৎকৃষ্ট উৎস আছে। উহা এক পর্ব্বতের তলদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া অনেক কুণ্ড ও এক মনোহর চেনার উপবন মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক জলাশয়ে পড়িতেছে। ইহার জল অতি স্বচ্ছ। ইহাতে অনেক মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। এই পল্লীর অনতিদূরে কয়েকটী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গিরিগহ্বর আছে। একটী বৃহৎ গুহায় আসন সদৃশ এক বৃহৎ প্রস্তর বিদ্যমান। শুনিলাম কোন মহাপুরুষ এইস্থানে আসিয়া সমাধিস্থ হন। অপর এক গুহার মধ্যভাগে প্রস্তরময় এক দেবালয় আছে।

আচ্ছাবল—ইহা এক উৎকৃষ্ট উৎস। এই উৎস এক প্রাচীন প্রমোদবন মধ্যে অবস্থিত। উদ্যানে অনেক ফলের গাছ ও চেনার গাছ এবং কয়েকটী অট্টালিকার ভগ্নাংশ রহিয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদশা নুরজাহান বেগমের জন্য ইহা প্রস্তুত করান। বার্ণিয়ার সাহেব ইহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হয়।

বেরীনাগ—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উৎস। ইহাকে উৎস না বলিয়া জলাশয় বলিলেই চলে। এই উৎসের জলাধার অষ্টকোণবিশিষ্ট। ইহার চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরময় প্রাচীর ও প্রশস্ত পথ বিদ্যমান। উৎসের জল নীলবর্ণ, কিন্তু উত্তোলন করিলে উহা স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক দেখায়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে পূর্ব্বেকার শোভাসম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কোঁশানাগ বা হরিবল—ইহা এক সুন্দর পার্ব্বত্য হ্রদ। ইহা প্রায় দেড় হাজার ফিট্ এক পর্ববতশিখরে অবস্থিত এবং জল পর্ববতের পশ্চিম প্রান্তস্থ স্থান ভেদ করিয়া মৃদুবেগে নীচে নামিতেছে। কিয়দ্দূর আসিয়া উহা এক বৃহৎ শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া প্রবলবেগে ও ভীষণ গর্জ্জনে নিম্নে পড়িতেছে। সেই কারণে কয়েকটী মনোহর জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল জলপ্রপাত মধ্যে হরিবল সর্ব্বপ্রধান। বসন্তকালে তুষাররাশি দ্রবীভূত হইলে ইহার অবয়ব বর্দ্ধিত হইয়া অপরূপ রূপ ধারণ করে।

১৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার—অদ্য নবমী তিথি। প্রভাত হইবামাত্র অমরনাথের পতাকা বহির্গত হইল। উড্ডীয়মান পতাকা সর্ব্বাগ্রে নীত হইতে থাকে ও যাত্রিগণ তদনুসরণ করেন। বেলা প্রায় ৮৷৷০ টার সময় আমরা বামনদেবকে স্মরণ করিয়া যাত্রারম্ভ করিলাম। পথে তেমন বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য দৃশ্য নাই। বেলা প্রায় ১১ টার সময় মার্ত্তণ্ড হইতে প্রায়

১০ মাইল দূরে আয়াসমোকাম বা জনকপুরে পঁহুছিলাম। অদূরে এক পর্ব্বতশিখরে একটী সমাধি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তত্রত্য হিন্দু অধিবাসিগণ উহাকে জনক রাজার সমাধিস্থল বলে। মুসলমানগণ উহাকে কোন সিদ্ধপুরুষের কবর বলে। এক্ষণে উহা মুসলমানদিগের হস্তগত। সে রাত্র আমাদিগকে আয়াসমোকামেই থাকিতে হইল।

১৭ই শ্রাবণ, বুধবার—অদ্য দশমী তিথি। প্রত্যুষেই আয়াসমোকাম পরিত্যাগ করিলাম। পথ নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। ইহাতে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ চড়াই ও উৎরাই। আয়াসমোকাম হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে বটকুট্ নামক স্থানে উপনীত হইলাম। ইহা এক ক্ষুদ্র পল্লীবিশেষ। এখানে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। বেলা প্রায় ১১ টার সময় আমরা পাহালগামে আসিলাম। ইহা বটকুট্ হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে আমাদিগকে দুই দিন (দশমী ও একাদশী) থাকিতে হইল। ইহা এক সামান্য গ্রাম। ইহার পর আর লোকালয় না থাকায় ইহাকে পাহালগাম অর্থাৎ প্রথম গ্রাম কহে। ইহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। এস্থানে অনেক পাইন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে এখানে অনেক সাহেব মেম আসিয়া থাকে। এই স্থান পর্য্যন্ত অমরনাথের ছড়ী আসিবার পূর্ব্বে যাত্রিগণ আসিতে পারে। ইহার পর আর যাত্রিগণকে যাইতে দেওয়া হয় না। যাত্রিবর্গকে এখানে একাদশী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। এখানে

প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব্ব। চারিদিকে তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা বিদ্যমান ও অদূরে লীডার নদী কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছে। নদীর মৃদুমন্দ শব্দ শ্রবণে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়।

১৯শে শ্রাবণ, শুক্রবার—অদ্য দ্বাদশী তিথি। আমরা সকালেই যাত্রারম্ভ করিলাম। এখান হইতে চতুর্ধারে তুষাররাশি রহিয়াছে। দাণ্ডিবাহকদিগকে ক্রমাগত বরফের উপর দিয়া চলিতে হইল। পথিমধ্যে নীলধারা নামক এক ঝরণা দেখিলাম। যাত্রিবৃন্দ ইহার জলস্পর্শ করিতে লাগিল। এখান হইতে পথ আদৌ ভাল নহে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রকায়া নদী বহিতেছে। এই পথে অনেক চারবৃক্ষ দেখিলাম। ভূর্জ্জ-পত্রেরও অনেক গাছ আছে। পাহালগাম হইতে প্রায় ৯ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বেলা প্রায় ১০।৷০ টায় আমরা চন্দনবাড়ী নামক স্থানে আসিলাম। সে দিবস আমাদিগকে তথায় থাকিতে হইল।

২০শে শ্রাবণ, শনিবার—অদ্য ত্রয়োদশী তিথি। অতি প্রত্যুষেই যাত্রারম্ভ করিলাম। আজ আমাদিগকে এক ভীষণ চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই চড়াই পিশুঘাটী নামে অভিহিত। উহা স্থানে স্থানে এত খাড়া যে, তথায় উঠিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পর্ব্বতগাত্রে নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত আছে; তাহাদিগের আঘ্রাণে নিদ্রাবেগ আসে। এই চড়াই উঠিতে সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম। এই চড়াই আরোহণকালে যদি বৃষ্টিপাত হইয়া পথে কাদা হয়,

তাহা হইলে যাত্রিগণের কষ্টের সীমা থাকে না। পথ বরফে সমাচ্ছাদিত। এই স্থান হইতে অমরনাথক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রায় সারা বৎসর তুষাররাশি বিরাজ করে। প্রায় ১০ মাইল পথ আসিয়া গন্তব্য পথ হইতে ৫০০ ফিট্ নিম্নে শেষনাগ নামক এক সুন্দর সরোবর দেখিলাম। এই সরোবর হইতে লীডার নদী উৎপন্ন হইয়াছে। তারপর প্রায় ২ মাইল পথ আরোহণ করিয়া পর্ব্বতের শিখরদেশে উপনীত হইলাম। এই স্থানের নাম শেষনাগ। এখানে আমরা বেলা দ্বিপ্রহরে পঁহুছিলাম। এই ভীষণ চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিলাম। সে রাত্র তথায় তাম্বু সংস্থাপিত করিয়া অতিবাহিত করিলাম। এখানে কি ভয়ানক শীত! কাষ্ঠ জ্বালাইয়া কোন গতিকে শীত নিবারণ করিলাম। এরূপ শীত, বোধ করি, কেদার-বদ্রীর বা পশুপতিনাথের পথে পাই নাই। এই স্থানে জীব জন্তু বা বৃক্ষ লতা কিছুই নাই। তুষাররাশি নিশার শশীকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

২১শে শ্রাবণ, রবিবার—আজ চতুর্দ্দশী তিথি। প্রভাতেই যাত্রারম্ভ করিলাম। পথিমধ্যে ২।৩টী খরস্রোতা নদী পার হইতে হইল। জলের উপর বরফ জমিয়া গিয়া সেতুর আকার ধারণ করিয়াছে। প্রায় ৮ মাইল পথ আসিয়া এক সমভূমি পাইলাম। তথায় এক নদী রহিয়াছে। এই নদীর পঞ্চ শাখা থাকায় এই স্থানের নাম পঞ্চতরণী হইয়াছে। এই স্থান বেশ সমতল। চন্দনবাড়ী হইতে পঞ্চতরণীতে আসিতে

দুইটী পথ আছে। প্রথম পথে আসিলে একদিনে পঞ্চতরণীতে উপস্থিত হওয়া যায়, দ্বিতীয় পথে দুই দিবস সময় লাগে। সাধারণতঃ যাত্রিগণ অমরনাথক্ষেত্রে গমন কালে দ্বিতীয় পথে যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রথম পথ দিয়া আসে; কারণ প্রথম পথে যাইলে সাস্‌কাটী নামক এক অতি ভীষণ চড়াই আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ সাস্‌কাটী উৎরাই নামিতে হয়। নামিবার সময় বেশী বেগ পাইতে হয় না।

পঞ্চতরণীতে সে রাত্র অতিবাহিত করিতে হইল। আজ চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকিরণে চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত হইতে লাগিল। অমরনাথের ছড়ী রাত্র প্রায় ৩॥০ সময় বহির্গত হইল। আমরাও রাত্র ৪টার সময় রওনা হইলাম। এই স্থান হইতে অমরনাথের গুহা ৫ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। প্রথমে আমাদিগকে এক দুর্গম চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইল ও তৎপরে এক উৎরাই নামিতে হইল। একটী কথা বিবৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি যে, এই সকল চড়াই ও উৎরাই উঠিবার ও নামিবার কালে আমাকে দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। তারপর আমরা এক পর্ব্বতগহ্বরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি পথ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল।

২২শে শ্রাবণ, সোমবার—সকাল ৭॥০ টায় আমরা গন্তব্য স্থান অমরনাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। আজ শ্রাবণী রাখী-পূর্ণিমা। অদ্য ৺ অমরনাথদেবের দর্শনলাভ হইবে বলিয়া

হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতে লাগিল। এবার প্রথমতঃ কালশুদ্ধ ও তদুপরি শ্রাবণী পূর্ণিমা শিববার সোমবার হওয়ায় উক্ত দিবস বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইল। অমরগঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া দেবদর্শন করিতে যাইলাম। অমরনাথের গুহাটী বেশ বড়; গুহামুখ প্রায় ৫০ ফিট্ উচ্চ ও ২০ ফিট্ বিস্তৃত হইবে এবং দৈর্ঘ্যেও প্রায় ৩৫ ফিট্ হইবে। গুহাভ্যন্তর অতিশয় শীতল। তথায় মহাদেবের তুষারলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে। বরফের হর-গৌরী ও বৃষ এবং বরফের এক বেদী বিদ্যমান। কেবলমাত্র শ্রাবণী পূর্ণিমাতে এই মূর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

অমরনাথদেবের এই লিঙ্গ মূর্ত্তি ব্যতীত পারাবত সদৃশ দুইটী শ্বেতবর্ণ পক্ষী দৃষ্ট হয়। পাণ্ডাগণ ইহাদিগকে সাক্ষাৎ হরগৌরী বলিয়া ব্যাখ্যা করে। যাহা হউক, ইহার ভিতর কি পরিমাণ সত্যাসত্য নিহিত আছে, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ তুষারাবৃত প্রদেশে যে সকল পক্ষী বিচরণ করে, ইহারা তাহাদের অন্যতম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুই পক্ষী ব্যতীত প্রায় ২৫ মাইল পথমধ্যে অপর কোন পশুপক্ষী পরিলক্ষিত হয় না।

আমরা ভক্তিভরে অমরনাথদেবের পূজার্চ্চনা করিলাম। অমৃতসর হইতে যে সকল দশনামী সন্ন্যাসী আগমণ করেন, তাঁহারাই অমরনাথদেবের পুরোহিত।

যাত্রিগণ মহাদেবের দর্শন ও অর্চ্চন সমাপন করিয়া সেই

দিবসই প্রত্যাবর্ত্তন করে। এখানে কেহ রাত্রিকালে বাস করে না। জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, একদা কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ গোলাপসিংহ এখানে নিশাযাপন করিলে মহাদেব সর্পাকারে তাহাকে দেখা দেন।

আমরা সেই দিবসই বেলা ১॥০টার সময় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বেলা ২॥০টায় আমরা পঞ্চতরণীতে উপস্থিত হইলাম। এবার আমরা পঞ্চতরণী হইতে চন্দনবাড়ী পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রথম পথে আসিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া হাতিয়ারতলাও (হত্যারাতলা) নামক স্থানে আসিলাম। এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে এক জনশ্রুতি অবগত হইলাম যে, কোন সময়ে একদল সন্ন্যাসী ভজন গাহিতে গাহিতে এই পথ দিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ উক্ত শব্দে পর্ব্বত হইতে বরফের স্তূপ তাহাদিগের মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাহারা সকলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

হত্যারাতলা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে সেই পূর্ব্ব-কথিত সঙ্কটীর উৎরাই নামিতে হইল। এই উৎরাই অবতীর্ণ হইতে সহস্র বক্র ধাপ নামিতে হইল। আমাদিগকে এই উৎরাই অবতরণকালে প্রায় ৪০০০ ফিট্ নামিতে হইল। তারপর আস্তানমার্গ নামক স্থান পাইলাম ও তৎপরে চন্দনবাড়ী। সন্ধ্যা হওয়ায় এখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

২৩শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে চন্দনবাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া ও পূর্ব্ব পথ অবলম্বন করিয়া একেবারে মার্ত্তণ্ডে

উপনীত হইলাম। আমার দাণ্ডিবাহকেরা অতি দ্রুতগামী ছিল, তজ্জন্য এত শীঘ্র—মাত্র দুই দিবসের মধ্যেই—অমরনাথ-ক্ষেত্র হইতে মার্ত্তণ্ডে পঁহুছিতে পারিলাম।

এক্ষণে অমরনাথের পথের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া অমরনাথযাত্রার বিবরণ পরিসমাপ্ত করিব। পথ যেরূপ দুর্গম ও কন্টকব, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। পাহালগাম অতিক্রম করিলে প্রত্যেক পথ সমূহ বিপজ্জনক। কোন কোন স্থান এতাদৃক্ ভয়াবহ, যে দ্রুতপদসঞ্চালন বা বাক্যোচ্চারণ করিবমাত্র গিরিশিখর হইতে তুষারখণ্ড সকল স্থানচ্যুত হইয়া সশব্দে গমনকারীর মস্তকোপরি পতিত হইয়া তাহাকে একেবারে ভূমধ্যে প্রোথিত করে। সেই জন্য রাজাদেশে সেই সকল স্থানে কেহ শব্দ করিতে পায় না। প্রথমতঃ এইরূপ ভয়ঙ্কর পথ, তদুপরি যদি তখন বৃষ্টিপাত হয় তাহা হইলে পথের দুরবস্থার কথা বলিবার কিছুই নাই। আমাদের গমনকালে প্রায় প্রতিদিনই অল্পপরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়াছিল, যদি প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইত, তাহা হইলে যাত্রিগণের মরণের পথ বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইত। সময়ে সময়ে ভয়ানক তুষারপাতও হইয়া থাকে শুনিলাম। যাহা হউক, পরম কল্যাণময় পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের পথে কোনরূপ বিপদ্ উপস্থিত হয় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—o—

নেপালে পশুপতিনাথ।

উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথদেবের দর্শনান্তর নেপালস্থ পশুপতিনাথদেবের দর্শনলাভ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, পশুপতিনাথক্ষেত্রে মহাদেবের উত্তমাঙ্গ ও কেদারে তাঁহার অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান আছে। বদরিকাশ্রমে গমনকালে কেদারনাথদেবকে দেখিয়া অবধি পশুপতিনাথদেবের দর্শনাভিলাষ মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল। সন ১৩২৯ সালের ৺শারদীয়া মহাপূজার পর আমার পূজ্যপাদ গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মদীয় ভবনে শুভাগমনকরতঃ উক্ত বৎসরের ১৩ই মাঘ, শনিবার সন্ধ্যার পর আমার নেপালযাত্রার দিনস্থির করিলেন। নেপাল স্বাধীন রাজ্য; তথায় বিনা ছাড়পত্রে কেহ প্রবেশ করিতে পায় না। কেবলমাত্র শিবরাত্রিপর্ব্বোপলক্ষে পর্ব্বের ৫।৬ দিন পূর্ব্ব হইতে যাত্রিগণকে বিনা পাশে প্রবেশ করিতে দেয় ও উক্ত পর্ব্ব সমাপনান্তে ৩।৪ দিনের অধিক তথায় তাহাদিগকে থাকিতে দেয় না। সে বৎসর ১লা ফাল্গুন শিব চতুর্দ্দশী ছিল; তাহার ১৬।১৭ দিন পূর্ব্বে আমাকে যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া স্বতন্ত্র ছাড়পত্র আনিতে হইল। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার

শ্রীমান্ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, পি এচ্ ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার জন্য নেপাল রাজ্যের প্রধান বিচারক ও প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মাননীয় মরীচিমান সিংহ মহোদয়ের নিকট হইতে পাশ আনাইয়া দিয়াছিল।

পূর্ব্বেই রক্‌সো'লের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করা ও মোকামাঘাট ষ্টেশন অবধি বার্থ রিসার্ভ করা হইয়াছিল। ১৩ই মাঘ, শনিবার, সন্ধ্যার অল্পকাল পরে হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি ৮।৪৪ মিনিটে মোগলসরাই এক্‌প্রেসে আরোহণ করিয়া হাবড়া পরিত্যাগ করিলাম। নিশান্তে মোকামা ঘাটে পঁহুছিলাম। ষ্টীমারে গঙ্গাপার হইতে হইল। গঙ্গাবক্ষে প্রভাতের মৃদুমধুর সমীরণ সংস্পর্শে ও পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য সন্দর্শনে চিত্তে বিমল সুখ হইতে লাগিল। ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া পুনরায় রেলগাড়ীতে আরোহণ করিলাম। দিবালোকে দুই দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সমস্তিপুর, মজফরপুর, মতিহারি ইত্যাদি নানা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণ ৪টার সময় সেগুলি ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এখানে রেলগাড়ী বদল করিতে হইল। তারপর অনেক ষ্টেশন অতিক্রমপূর্ব্বক সূর্য্যাস্তের সময় রক্‌সোলে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেশন অতি ক্ষুদ্র। ইহাই ইংরাজ রাজ্যের শেষ সীমানা। ষ্টেশনে অপেক্ষা না করিয়া এক অশ্বশকটযোগে ষ্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল দূরবর্ত্তী বীরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা

করিলাম। বীরগঞ্জের বড় হাকিমের নামে আমার সম্বন্ধে একখানি পত্র ছিল। তথায় উপস্থিত হইয়া বড় হাকিমকে উক্ত পত্র প্রদান করিলাম। ইতিপূর্ব্বে নেপালের কাটমণ্ডু সহর হইতে মাননীয় মরীচিমান সিংহ বড় হাকিমকে আমার যাহাতে পথে কোনরূপ কষ্ট বা বিপদ্ উপস্থিত না হয় তৎসম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বড় হাকিম আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সে রাত্র বীরগঞ্জে অতিবাহিত করিলাম।

পরদিন বড় হাকিম আমার গমনোপযোগী দাণ্ডি, বাহক, পাচক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পথিমধ্যে যে সকল সরকারী ডাকবাঙ্গলা আছে, সে সকল যাহাতে আমি ব্যবহার করিতে পারি তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। আমি ৮ জন বাহক, একজন বোঝাওয়ালা ও একজন পাচক সহ বীরগঞ্জ পরিত্যাগ করিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক বিশাল প্রান্তরে উপনীত হইলাম। এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমরা এই কয়জন লোক ব্যতীত আর কেহ নাই; কচিৎ ২।৪ জন পথিক দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রায় ৪ মাইল পথ আসিয়া পমানীপুর নামক স্থানে আসিলাম। এস্থানে এক চটী আছে, কয়েক ঘর বসতিও আছে। পমানীপুর অতিক্রম করিয়া ৩ মাইল পরে জিৎপুর পাইলাম। এখানে সরকারী ডাকবাঙ্গলা প্রভৃতি আছে। এই পশুপতিনাথের পথে প্রায় ২।৩ মাইল অন্তর এক একটী জলের কল আছে। তারপর বেলা প্রায় ১॥০ টার সময় আমরা চৈরাই জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ

করিলাম। প্রায় ৭।৮ মাইল পথ ক্রমাগত এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাইতে হইবে শুনিলাম। জঙ্গলের ভিতরেও জলের কল আছে। শ্বাপদসমাকীর্ণ এই জঙ্গলের মধ্যে আমরা এই কয়জন প্রাণী চলিতে লাগিলাম। আমাদের ভারতের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এই টেরাই জঙ্গলে শিকারার্থ আসিয়াছিলেন। এই স্থানে অনেক ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বাস করে। যদি কেহ এই জঙ্গলে নিদ্রা যায়, তাহা হইলে আউল নামক একপ্রকার জ্বর তাহাকে আক্রমণ করে। উক্ত জ্বর বড়ই মারাত্মক।

টেরাই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পর আমরা বিঝাঝরিতে পঁহুছিলাম। তথায় সরকারী ডাকবাঙ্গলায় আশ্রয় লইলাম। দ্বিতলের এক প্রকাণ্ড গৃহে চেয়ার, টেবিল, দর্পণ, শয়নার্থ পালঙ্ক ইত্যাদি সজ্জীকৃত আছে। আমি সেই গৃহে নিশাযাপনের ব্যবস্থা করিলাম। দ্বিতলের ছাদের উপর আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলী অতি চমৎকার দেখায়। চন্দ্রজ্যোতিতে বিছাঝরী নদী রৌপ্যের ন্যায় চাক্‌চিক্যময় দেখাইতে লাগিল। পর্ব্বতোপরি চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় পর্ব্বতশ্রেণী সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমরা পুনরায় যাত্রারম্ভ করিলাম। এক্ষণে আমাদিগকে এক জলশূন্য নদীর উপর দিয়া চলিতে হইল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী ক্ষীণতোয়া নদী পার হইতে হইল। উভয় পার্শ্বে অভ্রভেদী পর্ব্বত সকল স্থাণুসদৃশ

দণ্ডায়মান। পথের স্থানে স্থানে ঝরণার জল মৃদুরবে বিনির্গত হইয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। স্থানে স্থানে ২।৪ ঘর বসতি রহিয়াছে। ২।১টী পান্থনিবাসও দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম বর্ষাকালে এই সকল পান্থনিবাসে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়।

বিঝাঝুরি হইতে প্রায় ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা চাটওয়ারা নামক স্থানে আসিলাম। এখানে জন কয়েক লোক বাস করে। এখানে এক ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইয়াছে। ঝরণার জল কি সুমিষ্ট! বাহকগণ এই স্থানে অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। তৎপরে প্রায় ৪ মাইল আসিয়া সুপ্রাঠারে উপনীত হইলাম। আমরা তথায় বিশ্রাম না করিয়া চলিতে লাগিলাম। আরও ১০ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভিমপেরির উপত্যকাতে পঁহুছিলাম। তথায় সরকারী ডাক বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রভাতে ভিমপেরি হইতে বহির্গত হইয়া এক চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এই পথ যেন সোজাভাবে ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। আমার দাণ্ডিবাহকগণ এই চড়াই উত্তীর্ণ হইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। নেপালী বাহক ভিন্ন অপর কেহ এরূপ দুর্গম পথে ভার বহন করিয়া উপরে উঠিতে সমর্থ হইবে না। দেখিলাম যে, বড় বড় লোহার কড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য তাহারা কপালের সঙ্গে বাঁধিয়া পৃষ্ঠে করিয়া

অক্লেশে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। তারপর প্রায় ২ মাইল পথ চড়াই উঠিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিলাম। এই স্থানের নাম সিসাগড়া। শত্রুর আগমন প্রতিরোধার্থ এখানে গড় ও সৈন্য থাকে। গড়ী স্থানটী বেশ উচ্চ ও শীতল। গড়ী হইতে অবতরণান্তে আমরা কুলিখানি নামক স্থানে আসিলাম। এই স্থান বেশ মনোরম। এখানকার সরকারী ডাকবাঙ্গলাও বেশ সুন্দর। অদূরে এক ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বত্য নদী খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। নদীর উপরি ৪।৫টী সেতু বিদ্যমান। সেই সেতুর উপর দিয়া কখন বা এদিকে আসিতে হইতেছে এবং কখন বা ওদিকে যাইতে হইতেছে। এই পথ তেমন সুবিধাজনক নহে। নদী পার হইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। তারপর এক পর্ব্বত হইতে অপর এক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে চেৎলাম নামক স্থানে আসিলাম। তথায় সরকারী ডাকবাঙ্গলায় থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। আহারাদি সমাপনান্তে শয়ন করিলাম। ওঃ কি ভয়ানক শীত! ৪।৫টা গরম জামা কম্বল ইত্যাদি গাত্রে পরিধান করিয়াও শীতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না। তখন চতুঃপার্শ্বে জ্বালানি কাষ্ঠ জ্বালাইয়া শীত নিবারণের উপায় স্থির করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তথায় যাহাতে আর রজনী অতিবাহিত করিতে না হয়, এরূপ সময় নির্দ্ধারণ করিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম।

পরদিবস সকাল ৮টায় আমরা চেৎলাম হইতে বহির্গত হইলাম। এক্ষণে আমরা কেবলই পর্ব্বতারোহণ করিতে

লাগিলাম। প্রায় এক মাইল চড়াই ও দুই মাইল উৎরাই নামিবার পর আমরা থান্‌কোটে পঁহুছিলাম। পর্ব্বতশিখর হইতে চতুর্দ্দিকে তুষারধবল পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। থানকোট হইতে নেপাল রাজধানী কাটমণ্ডু সহর ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। থানকোটে অতি অল্প লোকের বসবাস। এখান হইতে নামিলে আর তেমন তুষারাবৃত পর্ব্বত পরিলক্ষিত হয় না। এই উৎরাই বড় কষ্টপ্রদ। প্রকাণ্ড প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী সাহায্যে নিম্নে নামিতে হইল। এক একটী সোপান দুই ফিট্ উচ্চ হইবে। আমরা অতি সন্তর্পণে অবতরণ করিতে লাগিলাম। বাহকগণ বলিল যে, এই পথ সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশদায়ক। উৎরাই অবতীর্ণ হইলে বেশ সমভূমি পাইলাম। এখান হইতে স্থানে স্থানে দুই একখানি গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল।

বেলা প্রায় ১১টায় আমরা কাটমণ্ডু সহরে প্রবেশ করিলাম। এই সহর হইতে ২ মাইল দূরে দেবপত্তন নামক স্থানে ৺পশুপতিনাথদেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী বাঘমতী নদীর তীরে সংস্থাপিত। কাটমণ্ডু সহরে প্রবেশ করিতে প্রথমে রুদ্রমতী নদী, তৎপরে বিষ্ণুমতী নদী ও সর্ব্বপশ্চাদ্ এই বাঘমতী নদী অতিক্রম করিতে হয়। আমি কাটমণ্ডু সহরে অবস্থান না করিয়াই দেবপত্তনে চলিয়া যাইলাম। ইহার কারণ এই যে, সহরে থাকিলে দেবদর্শন করিবার তেমন সুবিধা হইবে না। পশুপতিনাথদেবের কৃপায় দেবপত্তনে (দেবপাটনে) উপস্থিত হইবামাত্র তথাকার প্রধান পুরোহিত রাজোপাধিবিভূষিত ও

বিচারপতির ক্ষমতান্বিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভবনে আমায় স্থান দিলেন। তাঁহার ভবন মন্দিরের অতি নিকটে অবস্থিত। তথায় দ্রব্যাদি স্থাপনপূর্ব্বক ধূলা পায়েই দেবদর্শনে যাইলাম। মন্দিরমধ্যে মহাদেবের চতুর্মুখ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছে। এই মন্দিরে স্বর্ণ রৌপ্যের আতিশয্য দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ত্রিশূল, বৃষ ইত্যাদি সংস্থাপিত আছে। নেপালের প্রায় সমুদয় নরপতি এই মন্দিরের অল্পবিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক সুবৃহৎ স্বর্ণ-বৃষ স্থাপিত করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন আরও কত যে স্বর্ণ বৃষ ও শিবলিঙ্গ আছে তাহা গণনা করা যায় না। পশুপতিনাথের মন্দিরের ছাদ স্বর্ণপাত দ্বারা আবৃত। এই মন্দির অতি উচ্চ ও সুদৃশ্য। এই মন্দিরের সম্মুখভাগে এক উচ্চ স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। ইহার এক পার্শ্বে যুক্তকরে হনুমান্ ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত। ইহার সম্মুখে এক প্রশস্ত রাজপথ। পশুপতিনাথের মন্দিরে প্রবেশার্থ চারিধারে চারিটী পথ আছে। একটী দ্বার সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে, তবে যাত্রিসমাগম অধিক হইলে সকল দ্বারই অনাবৃত থাকে।

পশুপতিনাথদেবের দৈনন্দিন নিত্যপূজা বেলা ১০টা হইতে বৈকাল ৩।৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমে অভিষেক হয়। প্রধান পুরোহিত ঐ অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। প্রধান পুরোহিতের অধীনে অপর

তিনজন সহকারী পুরোহিত আছেন। পূজার সময় পুরোহিত-বর্গ রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র ও রক্তবর্ণ জামা পরিধানপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করেন। এই পুরোহিত চতুষ্টয় ব্যতীত অপর কেহ, এমন কি স্বয়ং মহারাজাধিরাজও, মন্দিরের যে স্থানে বিগ্রহ বিদ্যমান তথায় প্রবেশ করিতে পায় না। যাত্রিগণকে সম্মুখের চত্বরে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। তবে রাজপরিবারবর্গের জন্য চত্বরের সর্ব্বপ্রথম স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় জনসাধারণকে যাইতে দেওয়া হয় না। ৺পশুপতি-নাথের কৃপায় ও রাজা দামোদর শাস্ত্রী মহোদয়ের অনুগ্রহে সর্ব্বপ্রথম স্থান হইতেই আমি দেবদর্শন করিতাম।

অভিষেকক্রিয়া সমাপনান্তে পঞ্চামৃত, বালভোগ ও মহাভোগ হয়। এই সকল ক্রিয়াকলাপ প্রধান পুরোহিতের অনুমত্যনুসারে নিষ্পাদিত হয়। তবে রাত্রের আরত্রিক ক্রিয়া সপ্তাহকাল ধরিয়া এক এক পুরোহিত করিয়া থাকেন। মন্দিরের সমুদয় তত্ত্বাবধানের ভার ও দায়িত্ব প্রধান পুরোহিতের উপরি ন্যস্ত। তাঁহার অধীনে অপর যে তিনজন পুরোহিত আছেন, তাঁহাদের কোনরূপ দায়িত্ব বা ক্ষমতা নাই। এই পুরোহিতগণ কঙ্কনদেশীয় ব্রাহ্মণ। নেপালে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ না থাকায় উহাদিগকে কঙ্কনদেশ হইতে আনাইয়া বহু জায়গীর ও প্রভূত বিত্ত প্রদান করিয়া পূজারি পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। রাজা দামোদর শাস্ত্রীর ন্যায় মহৎ লোক সচরাচর দেখা যায় না। যে কয়েকদিবস তাঁহার ভবনে বাস

করিয়াছিলাম, সে কয়দিবস তাঁহার ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীগণের সঙ্গলাভে পরমানন্দে অতিবাহিত করিলাম। একদিন সোমবার রাজা দামোদর শাস্ত্রী আমার নামে ৬পশুপতিনাথ দেবের শ্রীচরণে রুদ্রাভিষেকক্রিয়া নিবেদিত করিলেন। পশুপতি নাথের মন্দিরে সদা সর্ব্বদাই শিবগীত হইতে থাকে। রাজা দামোদর শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া সদাই দেবদর্শন করিতে পারিতাম। নেপাল পরিত্যাগকালে তিনি ৬পশুপতিনাথদেবের গলদেশ হইতে একছড়া রুদ্রাক্ষমালা ও একছড়া শ্বেতচন্দনের মালা আমায় উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। উহা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

পশুপতিনাথদেবের মন্দিরের নিম্নেই বাঘমতী নদী প্রবাহিতা। নদীর উভয় পার্শ্বেই প্রস্তরময় বহু ঘাট ও সোপান বিদ্যমান। পশুপতিনাথ-ঘাটে দণ্ডায়মান হইলে বাঘমতী নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। উভয় পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতমালা ও তন্মধ্য দিয়া খরস্রোতে নদী বহিয়া যাইতেছে। এই ঘাটে ২।৩ খানি ঘর আছে, তাহাতে প্রায় সকলেই অন্তিমকালে পশুপতিনাথের চরণ পাইবার আশায় আসিয়া থাকেন। একখানি ঘর উচ্চ পরিবারবর্গের, একখানি মধ্যবিত্ত ব্যক্তিবর্গের ও একখানি সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। নেপাল অধিবাসিগণের নিকট পশুপতিনাথক্ষেত্র পরম পবিত্র স্থল। মরণকাল উপস্থিত হইলে সকলেই পশুপতিনাথদেবকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথের মন্দিরে বিপুল জনতা ও মহা সমারোহ হয়। তৎকালে ভারতের নানাদেশ হইতে লক্ষাধিক লোক এখানে আগমন করে। শিবচতুর্দ্দশীতে মন্দিরমধ্যে ১০০ মণ ঘৃত প্রজ্বলিত হয় এবং সেই দিবস পশুপতিনাথের মস্তকে এত অধিক বিল্বপত্র প্রদত্ত হয় যে, বিগ্রহকে কেহ দেখিতে পায় না। সেই সময় ৬।৭ দিন যাবৎ নেপাল রাজ্যের দ্বার অবারিত থাকে। যাত্রিগণ দলবদ্ধ হইয়া পশুপতিনাথের উদ্দেশে ধাবিত হয়। তখন এতাদৃক্ জনসমাগম হয় যে, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে। লোক আশ্রয় না পাইয়া বৃক্ষতলে অবস্থান করে। তাহাদিগের পথক্লেশের কথা একবার স্মরণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

পশুপতিনাথের মন্দিরের চতুর্দ্ধারে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ দেবমন্দির আছে। বাঘমতার অপর তীরে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। অনেক সোপানশ্রেণী আরোহণ করিবার পর দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তথায় এক উৎস আছে; সেই উৎসের মুখ সুবর্ণময় আবরণে আবৃত থাকে। আবরণ অনাবৃত করিয়া উৎসমুখে হস্ত নিক্ষেপ করিলে উৎসের জল হস্তে সংলগ্ন হয়। গুহ্যেশ্বরীর মন্দির বেশ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। নেপালে বহুসংখ্যক দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই দুর্গম প্রদেশে সংস্থিত। নেপালে মুক্তিনাথ মহাদেব সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ। যেথায় মুক্তিনাথদেব আছেন, তথায় ক্বচিৎ কদাচ

সন্ন্যাসীগণ গমন করিয়া থাকে। মুক্তিনাথের পথ এত দুর্গম যে, জনসাধারণ সেখানে যাইতে পারে না।

নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইলে অনেক বৌদ্ধ বিহার ও মঠ স্থাপিত হয়। কালক্রমে বৌদ্ধগণ হিন্দুভাবাপন্ন হইলে তাহাদের মঠ ও বিহার হিন্দুগণের দেবমন্দিরে পরিণত হয়। অধুনা ভারতের প্রায় কোথাও বিশুদ্ধ বৌদ্ধমঠ বা বিহার দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু নেপাল রাজ্যে এখনও কয়েকটী বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। কাটমণ্ডু নগরের কিয়দ্দূরে স্বয়ম্ভূনাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির অবস্থিত। সহরের বহির্ভাগে এক মাইল পশ্চিমে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি স্বয়ম্ভূনাথের বা আদিবুদ্ধের মন্দির বিদ্যমান। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই মন্দির প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। বৌদ্ধগণের ইহা অতি পবিত্র স্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত যে, নেপালের পশুপতিনাথ পূর্ব্বে বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান ছিল, পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম অবনতির পথে নামিতে লাগিল, তখন বৌদ্ধগণের বিহার, মঠ ও স্তুপ সকল হিন্দুতীর্থ ও দেবমন্দিরে পরিণত হইল।

পশুপতিনাথের মন্দিরের কিয়দ্দূরে এক পর্ব্বতশিখরে মৃগস্থলী নামে এক সুন্দর বন আছে। কাটমণ্ডু সহরের ৩।৪ মাইল দূরে বৌদ্ধগণের বোধনাথ নামক প্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বিদ্যমান। পুরাকালে কোন এক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাধুপুরুষ তীর্থভ্রমণোদ্দেশে নেপালে আগমন করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দেহাবশেষ এই স্তুপে রক্ষিত হয়।

নেপালের পূজা পার্ব্বণ ও জাতীয় উৎসব সংখ্যাতীত। গুর্খা ও নেয়ারগণের মধ্যে চির উৎসব প্রচলিত। গুর্খাগণ হিন্দু ও নেয়ারগণ বৌদ্ধ ছিল; এক্ষণে এই উভয় জাতি একত্র সংমিশ্রিত হওয়ায় উভয়ের উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে।

নেপালের রাজধানী কাটমণ্ডু সমুদ্রতল হইতে প্রায় ৪৫০০ ফিট্ উচ্চ হইবে। ইহা এক বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অবস্থিত। চন্দ্রগিরির শিখরদেশ হইতে এই উপত্যকা চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়। চতুর্দ্দিকেই উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী রহিয়াছে: কেবলমাত্র বাঘমতীর জলনির্গমনস্থলে এক রন্ধ্র বিদ্যমান। জনপ্রবাদ এই যে, পূর্ব্বকালে নেপাল উপত্যকা ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল ও তথায় নাগকুল বাস করিত। স্থানীয় লোক-প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, বহুকাল অতীত হইল নীমুনি নামক এক ঋষি এখানে তপস্যা করিতেন এবং তাঁহারই নামানুসারে এই উপত্যকার নাম নেপাল হইল। পূর্ব্বে কাটমণ্ডু সহরের নাম কান্তিপুর ছিল। নেয়ার রাজগণের শাসনকালে কাটমণ্ডু সহরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই। তৎকালে পাটন, ভাটগাঁও প্রভৃতি প্রধান নগর ছিল। বর্ত্তমানকালে কাটমণ্ডু বেশ ঐশ্বর্য্যশালী নগর। অধুনা অনেক সুরম্য প্রাসাদ ও সুদৃশ্য বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজভবন অতি প্রকাণ্ড। সহরের মধ্যভাগে ভূতপূর্ব্ব নেয়াররাজগণের হনুমান্‌ঢোকা নামক পুরাতন ও প্রধান প্রাসাদ বিদ্যমান।

উক্ত প্রাসাদের সিংহদ্বারসম্মুখে এক সুবৃহৎ হনুমান্ মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। হনুমান্‌ঢোকার অনতিদূরে এক ভীষণ প্রস্তরময় ভৈরবমূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে। সহরের বাহিরে এক প্রশস্ত প্রান্তর আছে। প্রত্যহ প্রাতে এই স্থানে রণবাদ্য ও সৈন্যগণের কাবাজখেলা হয়। এই স্থানকে টুনিখিল কহে। টুনিখিলে প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি সকল আছে; ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি রাজা ও রাজপরিবারবর্গের। এই ময়দানের অগ্নিকোণে সিংহ-দরবার নামক প্রাসাদ অবস্থিত। ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরের থাপাথলির দরবার ও অপরাপর প্রকাণ্ড সৌধমালা ময়দানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বীর শামসেরের মন্ত্রিত্বকালে কাটমণ্ডু সহরের অশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। তিনি জলের কল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেজন্য জলের কলকে নেপালীগণ বীরধারা কহে। তিনি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাণী-পুষ্করিণীর মধ্যে এক দেবমন্দির আছে। উক্ত সরোবরের পূর্ব্ব পার্শ্বে যে ঘটিকাগৃহ আছে, তাহা বীরসামসেরের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ময়দানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কলিকাতার মনুমেণ্ট্ সদৃশ এক মনুমেণ্ট আছে। উহার সন্নিকটে মঙ্গলের মন্দির রহিয়াছে। এই মন্দির অতি পুরাতন। প্রধান রাজমন্ত্রী চন্দ্রশামসের এক্ষণে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নেপালবাসিগণ বৈদ্যুতিক আলোককে চন্দ্রজ্যোতি আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

অধুনা কাটমণ্ডু সহরে ২।৪ খানা মোটর গাড়ী রহিয়াছে দেখিলাম। রাজপরিবার, মন্ত্রীপরিবার ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অশ্বযান আছে।

সহরের সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ বাজারের নাম ইন্দ্রচক। তথায় দেশীয় পিত্তল কাংস্যের বাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তথাকার কস্তুরী ও মৃগনাভী অতি উত্তম।

সহরের একেবারে উত্তরে ব্রিটিশ রেসিডেন্সী অবস্থিত। রেসিডেণ্ট্ নেপালরাজের শাসনবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। রাজমন্ত্রী সহ রেসিডেণ্টের কোনরূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হয় না। রেসিডেণ্টের সঙ্গে এক ইংরাজ চিকিৎসক থাকে।

নেপালের আদিম অধিবাসিগণ ও শাসনকর্ত্তা নেয়ার-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পরে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বিনারায়ণ নেপাল-রাজ্য জয় করিলে গুর্খাগণ প্রধান অধিবাসী হইল। গুর্খাগণ হিন্দু ও রাজপুতকুলোদ্ভব। মুসলমানগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া ইহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করে ও নেপালের অন্তর্গত গোরাবালি নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকে। ক্রমে তাহারা সুকৌশলে রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। বর্ত্তমান-কালে রাজগণ, মন্ত্রীগণ ও প্রধান রাজপুরুষগণ গুর্খাবংশীয়। গুর্খা স্ত্রীপুরুষ সকলেই বেশ সুশ্রী। গুর্খা ও নেয়ার ভিন্ন লিম্বু, লিপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি অপরাপর অধিবাসী নেপালে বাস করে। ভারবহনকারিগণের অধিকাংশই ভুটিয়া।

নেপালী রমণীগণ সম্মুখভাগে কোঁচা করিয়া কাপড় পরিধান

করে। তাহাদের বস্ত্রের পরিসর প্রায় ২০ হাত হইবে। তাহাদেব কোঁচায় প্রায় অর্দ্ধেক বস্ত্র লাগে। নেপালদেশীয়া রমণীগণ বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেব ন্যায় সম্মুখভাগে সিঁথি কাটিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে বেণী রচনা করে না। তাহারা পশ্চাদ্ভাগে সিঁতি কাটিয়া মস্তকোপরি বেণী স্থাপিত কবে। হাতে কাঁচেব চুড়ি ও গলায় পুথির মালা সধবা স্ত্রীলোকদিগেব লক্ষণ। বিধবা স্ত্রীলোকগণ মুখ আবৃত বাখে। এখানে স্ত্রীপুরুষ কেহই নগ্নদেহে থাকে না।

নেপালে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। এখানে স্ত্রীলোকদিগের অববোধ প্রথা নাই। পূর্ব্বে সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল; পরে জঙ্গ বাহাদুর উক্ত প্রথা বন্ধ কবিয়া দেন। নেপালে প্রত্যেকেই কৃষক। প্রত্যেকেব গৃহে গোমাহষ প্রভৃতি আছে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মক্কা, গম ও নানাবিধ উদ্ভিদ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। নেপালে একপ্রকাব কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা সহজে ছেঁড়া যায় না। নেপালের এক টাকা আমাদেব বার আনা ও আমাদেব ৩২৲ টাকায় একখানি নেপালী মোহর হয়। এখানকার নোট সেখানে বিশেষরূপে আদৃত হয়।

নেপালে বিচারালয় আছে। এখানে জনসাধারণের উপর শিক্ষার আলোক অধিকরূপে নিপতিত হয় নাই। এস্থানে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিরক্ষর। উচ্চ পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেছে। নেপালের

শিক্ষাবিভাগে ও চিকিৎসাবিভাগে অধিকাংশই বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি বিনিযুক্ত। নেপালবাসিগণের কেহ কেহ এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন করে। বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী বিলাত ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে নেপাল মহারাজাধিরাজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রধান রাজমন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনিই প্রকৃত মহারাজ-পদবাচ্য। পূর্ব্বকালে মহারাষ্ট্রীয় প্রধান মন্ত্রী পেশোবাগণ যেরূপ ক্ষমতান্বিত ছিল, এক্ষণে নেপালে রাজমন্ত্রীগণেরও ক্ষমতা তদ্রূপ। তিনি নেপালের রাজ্যচক্র বিবর্ত্তিত করিতেছেন। বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বিক্রম শাহ সপ্তদশবর্ষীয় বালকমাত্র। তাঁহার দুই পত্নী ও পাঁচ সন্তান। তিনি বিলাসিতার স্রোতে ভাসমান। রাজপরিবারমধ্যে এক নিযম প্রচলিত আছে যে, রাজগণকে এককালীন পত্নীদ্বয় গ্রহণ করিতে হয়।

অশোক অনেকদিন নেপালে বাস করেন। শঙ্করাচার্য্য নেপালে আগমনকরতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শৈবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। তাহার সময় হইতে মন্দিরে বলি আরম্ভ হয়। শঙ্করের পূর্ব্বে শিলাদিত্য নেপালে আসিয়াছিলেন।

নেপালে বিদেশীয় লোক অতি অল্পই বসবাস করে; কেবল-মাত্র বাণিজ্যোপলক্ষে কয়েকজন কাশ্মীরদেশীয় ব্যক্তি অবস্থান করে।

নেপালীগণ দেবদ্বিজে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করে। গৃহস্থগণ যে কোন পুণ্য কার্য্য করে, সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণবর্গকে দানে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণের ব্যবস্থা আমাদের

নিকট হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয়। ভক্তগণ ধূলিতে মস্তক স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ভক্তের মস্তকে পদস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন। এদেশে ব্রাহ্মণ গুরুতর অপরাধ করিলেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় না।

নেপালে রাজাদেশে জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত থাকে। নেপাল ৫১ মহাপীঠের অন্যতম। বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর জানুদ্বয় এখানে পতিত হয়। দেবীর নাম মহামায়া। প্রতিদিবস অভিষেকক্রিয়াদি যথাযথভাবে নিষ্পাদিত হয়। অভিষেককালে যজুর্ব্বেদোক্তমন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। কর্পূরালোকে আরত্রিক ক্রিয়াকালে "পুরোহিত মন্ত্র" পাঠ করা হয়।

কাটমণ্ডু সহরের এক প্রান্তে একটী সুপ্রসিদ্ধ গুহা আছে। উক্ত গুহা অত্যন্ত অন্ধকারময়। শুনিলাম যে, জনৈক লামা তথায় বসিয়া যোগসাধনা করিয়াছিলেন। গুহাসম্বন্ধে এক জনপ্রবাদ আছে যে, ইহার ভিতর এক সুড়ঙ্গ আছে; উহা বরাবর তির্ব্বতদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উক্ত লামা তির্ব্বতবাসী ছিলেন, সুতরাং নিজ সুবিধার জন্য যোগবলে এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করেন।

আমাদের মধ্যে যেমন সদাসর্ব্বদা হরিনাম জপ করিয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার উপায় আছে, তদ্রূপ নেপালবাসিগণের এই বিশ্বাস যে "নারায়ণো মণিপদ্মে ঽ হুম্" এই শ্লোক

পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে, অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, উক্ত শ্লোক যিনি যতবার উচ্চারিত করিবেন, তাঁহার তত পুণ্যসঞ্চয় হইবে। সেজন্য কেহ কেহ জলস্রোতের মধ্যে একখানি বিঘূর্ণিত চক্রোপরি এই শ্লোক স্বহস্তে লিখিয়া চক্রখানি ঘুরাইতে থাকে।

পূর্ব্বকালে কাটমণ্ডুতে কাষ্ঠময় নিকেতন ছিল এবং তজ্জন্য সহরের নাম কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাটমণ্ডু হইয়াছে। অধুনা সেই সকল কাষ্ঠগৃহ সাধু সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমস্থলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

বাঘমতী নদীতে প্রত্যেকের স্নান করা কর্ত্তব্য। এই নদীতে মহোদয় ও অর্দ্ধোদয়যোগে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে জীবের সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় ও মুক্তিলাভ হয়। পৌষ বা মাঘমাসে অমাবস্যা তিথি রবিবার ব্যতীপাতযোগ ও শ্রবণা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইলে অর্দ্ধোদয়-যোগ হয়; ইহার কিঞ্চিৎ কম হইলে মহোদয়-যোগ হয়। এই বাঘমতী নদীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালে এক শৃগাল ও এক বানর জাতিস্মর ছিল। উভয়েই পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন কোনও প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না করায় দেহান্তে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অপর বিপ্রও ব্রহ্মস্বহরণজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া বানরযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারে এবং তাহাদের

পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্য এক মুনিবরের সমীপে উপস্থিত হইল। মুনি তপোবলে তাহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইলেন, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান তাহাদের পক্ষে না দেখিয়া তিনি অর্দ্ধোদয়যোগে তাহাদিগকে এই নদীতে স্নান করিতে বলিলেন। এই নদীতে তাহারা মুনির উপদেশানুসারে স্নানকরতঃ বিমুক্ত হয়।

নেপালরাজ্যে যাহা কিছু দেখিবার আছে তৎসমুদয় দর্শন করিয়া নেপাল পরিত্যাগ করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যেন আমার কোনরূপ কষ্ট না হয় এবং যাহাতে আমি পথিমধ্যে যে সকল সরকারী ডাকবাঙ্গলা আছে সেগুলি ব্যবহার করিতে পারি এই মর্ম্মে মাননীয় মরীচিমান সিংহ মহাশয় আমায় এক ছাড়পত্র প্রদান করিলেন। প্রত্যাগমনকালে প্রথম রাত্রি কুলিখানির ডাকবাঙ্গলায় অতিবাহিত করিলাম। কুলিখানির দৃশ্য বেশ মনোমুগ্ধকর। এস্থানে পার্ব্বত্য নদীর উপর এক সেতু আছে। আমাদিগকে উক্ত সেতু অতিক্রম করিতে হইল। পরদিন সিসাগড়ী হইতে ভীমপেরীর উপত্যকায় পড়িতে হইল। এই উৎরাই অবতীর্ণ হইতে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। স্থানে স্থানে পথ এত অসরল যে, পদক্ষেপমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড সকল নিম্নে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যাহা হউক, ৺পশুপতিনাথের কৃপায় পথে কোন বিপদ্ সমুপস্থিত হয় নাই। সে রাত্রি হাটওয়ারার বিশ্রাম ভবনে আশ্রয় লইলাম। তৃতীয় দিবসে বিছাঝরি প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া জিৎপুরে নিশাযাপন করিলাম। এখানে আমার

সহিত নেপালের এক রাণাপরিবারের আলাপ পরিচয় হইল। ইহারা কলিকাতা হইতে স্বদেশে গমন করিতেছিল। চতুর্থ দিবস সকাল ৮টায় রক্সৌলে উপনীত হইলাম। রক্সৌল হইতে পশুপতিনাথক্ষেত্রে যাইতে ৭৬ ঘণ্টা লাগিয়াছিল এবং তথা হইতে আসিবার কালে ৭২ ঘণ্টা সময় পড়িল। আমি যখন রক্সৌলে আসিলাম, তখন মেলগাড়ী চলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে আসিতে হইল বলিয়া একদিন রেলগাড়ীতে অধিক সময় অতিবাহিত হইল। সচরাচর দাণ্ডিতে করিয়া যাইলে ৫।৬ দিন সময় লাগে। আমার দাণ্ডিবাহকগণ অতি দ্রুতগামী ছিল বলিয়া আমায় ৩ দিনে নেপালে পঁহুছাইয়া দিল ও তথা হইতে লইয়া আসিল। সরকারী পত্রাদি ২ দিনে আনীত হয়।

নেপালের জল অতি চমৎকার। যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা শীঘ্রই পরিপক্ক হয়। আমি পশুপতিনাথ দেবের দর্শনলাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ৩ দিন শৌচ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করি নাই; তজ্জন্য আমার শারীরিক কোনরূপ অসুস্থতা উপস্থিত হয় নাই। জলের অনুযায়ী বায়ু তেমন স্বাস্থ্য-প্রদ নহে। উহা ঈষদাদ্র। একটী বিষয় উল্লিখিত করিয়া এই বিবরণ পরিসমাপ্ত করিব। আমি কেদার-বদ্রীর, অমর নাথের ও পশুপতিনাথের দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করিলাম; তন্মধ্যে দেখিলাম যে, অমরনাথের পথ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও দুর্গম, তৎপরে কেদার-বদ্রীর ও তৎপরে এই পশুপতিনাথের!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•—

চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনাভিলাষে সন ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে আমার জনৈক বন্ধু সহ যাত্রা করিলাম। কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রেলযোগে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। তথা হইতে ষ্টীমার-যোগে পদ্মানদী পার হইয়া ও পুনরায় রেলগাড়ীতে আরোহণ করিয়া চাঁদপুর জংশনে আসিলাম। তারপর গাড়ী চাঁদ-পুরের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক ষ্টেশনে আসিলে তথায় অবতরণ করিলাম

সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম জেলার এক প্রধান মহকুমা। এখানে নানা লোকের বসবাস। বিদ্যালয়, আদালত, চিকিৎসালয় ইত্যাদি রহিয়াছে। এই স্থানে চন্দ্রনাথের পাণ্ডাগণ বাস করে। আমরা এখানে এক পাণ্ডার বাসায় আশ্রয় লইলাম।

চন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের এক প্রাচীন ও প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ইহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম। বিষ্ণুচক্রে সতীদেবীর অঙ্গ কর্ত্তিত হইলে দেবীর দক্ষিণ হস্ত এস্থানে নিপতিত হয়। এই চন্দ্র-নাথ পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানী নামে বিখ্যাতা

চন্দ্রনাথদেবের মন্দির এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। উহা সমভূমি হইতে প্রায় ১২০০ ফিট উচ্চ হইবে। ভগবান্ চন্দ্রশেখরের নাম স্মরণপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি আরোহন করিতে লাগিলাম। ক্রমান্বয়ে আরোহণ নহে, স্থানে স্থানে পুনরায় অবরোহণ করিয়া উচ্চে উঠিতে হয়। পূর্ব্বে পথ বড়ই দুর্গম ছিল, এক্ষণে কিন্তু পথে কষ্টের লাঘব হইয়াছে। অধুনা কোন এক সহৃদয়া রমণী পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া সোপান-শ্রেণী নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। ধন্যা সেই রমণী যিনি এই জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্তা থাকিয়াও নিজ নাম প্রচার করিতে যত্নবতী হন নাই।

প্রথমে যথায় উনকোটী শিবের বাড়ী আছে, তথায় উপস্থিত হইলাম। তথায় পর্ব্বতগাত্রে এক গুহামধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রকায় শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে। ইহাদের উপর দিয়া অবিরত ঝরণার জল প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে পাণ্ডা না থাকায় পূজার কোন ব্যবস্থা দেখিলাম না।

তৎপরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে স্থান হইতে ঝরণার জল পড়িতেছে, সেই স্থানে আসিয়া অন্য এক পথ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। চন্দ্রনাথগিরির দুইটী শৃঙ্গ। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ৺ চন্দ্রনাথদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন; অপেক্ষাকৃত নিম্ন শৃঙ্গে ৺ বিরূপাক্ষদেব রহিয়াছেন। ক্রমে আমরা বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষদেব প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। বিরূপাক্ষদেবের

নিত্য পূজা সামান্যভাবেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রত্যহ একজন পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া চলিয়া যান। এই স্থান বেশ নির্জ্জন।

বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরস্থল হইতে আরও উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলাম এই স্থানে এক খণ্ড অপ্রশস্ত শিলা আমাদের গন্তব্য পথ হইতে অপর এক পর্ব্বতশৃঙ্গে যাতায়াতের জন্য সেতুর ন্যায় কার্য্য করিতেছে। ঐ শিলাখণ্ড পর্ব্বতের উচ্চ গাত্রে এরূপ ভীষণ অবস্থায় অবস্থিত যে, দৈবাৎ যদি কাহারও পদস্খলন হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। যাহা হউক, সেতু পার হইয়া পুনরায় উচ্চে উঠিতে লাগিলাম। তারপর পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে ৺ চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে যে স্থানে চন্দ্রনাথের মন্দির ছিল। এক্ষণে উহা সে স্থানে নাই। সে স্থান হইতে কিয়দ্দূরে ঐ মন্দির অবস্থিত; কারণ দুর্ব্বৃত্ত কালাপাহাড় পূর্ব্বোক্ত মন্দির ধ্বংস করিয়া দেয়। এই উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। শান্ত প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে শান্তি লাভ করিয়া মনঃ-প্রাণ ভগবৎ-প্রেমে নিমজ্জিত হইল। অদূরে বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি নীল গগনের সহিত মিলনাশায় সদাই ব্যাকুল হইয়া গতায়াত করিতেছে দেখিলাম।

বিরূপাক্ষদেবের ন্যায় চন্দ্রনাথদেবেরও পূজার কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই। প্রত্যহ জনৈক পুরোহিত আসিয়া পূজার্চ্চনা

করিয়া যান। এখানে যত কিছু বাহ্যাড়ম্বর ও সমারোহ তাহা স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে হইয়া থাকে।

এই চন্দ্রনাথপর্ব্বতের এক স্থানে ভগবান্ স্বয়ম্ভুনাথ বিরাজ করিতেছেন। সয়ম্ভুনাথের অনাদি লিঙ্গ মূর্ত্তি সন্দর্শনে হৃদয় পবিত্রীকৃত হইল। এই লিঙ্গ মূর্ত্তি সচরাচর যেরূপ লিঙ্গ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ নহে। আকৃতিবিষয়ে পার্থক্য এই যে, স্বয়ম্ভু নাথের লিঙ্গমূর্ত্তি নিম্নে স্থূল ও ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অগ্রভাগে অতি সূক্ষ্ম হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ম্ভূনাথের গাত্রে উচ্চ নীচ থাকযুক্ত এক রেখা বিদ্যমান। বিগ্রহের নিম্নভাগের চতুর্দ্দিক গভীর খাদযুক্ত। হস্ত দ্বারা খাদের তলদেশ স্পর্শ করা যায় না। মন্দিরের পরিসর তেমন বিস্তৃত নহে। যেথায় ভগবান্ স্বয়ম্ভূনাথ অধিষ্ঠিত আছেন, সেইস্থান লৌহনির্ম্মিত রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত। যাত্রিগণ পুরোহিতগণকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিলে মন্দিরস্থ রেলিং মধ্যে প্রবেশ ও বিগ্রহ স্পর্শ করিতে পারে। দক্ষিণা না দিলে রেলিংয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে দেয় না; বহির্ভাগ হইতেই দেবদর্শন ও পূজাদি প্রদান করিতে হয়। স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে এক মোহন্ত আছে। বিগ্রহের মস্তকোপরি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা মোহন্তের প্রাপ্য এবং পূজান্তে দক্ষিণা পুরোহিত পাইয়া থাকেন। স্বয়ম্ভূনাথদেবের দর্শনলাভ করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল হয়। স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরসম্মুখে এক নাট-মন্দির আছে; তথায় বেদপাঠ ও হোমাদিক্রিয়া নিষ্পাদিত

হইযা থাকে। ইহার এক ধারে অনেকগুলি শালগ্রাম শিলা বিদ্যমান। তথায এক প্রস্তরময় বেদী রহিয়াছে। কথিত আছে যে, উহা দ্বাদশ শালগ্রাম শিলার উপরি অধিষ্ঠিত।

মূল মন্দিরের সম্মুখভাগে এক ভোগমন্দির আছে। পূর্ব্বে ভোগমন্দির না থাকায় পুরোহিতগণের অতিশয় কষ্ট হইত। জনৈক ভক্তের অর্থব্যযে এক্ষণে এই ভোগমন্দিব নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্বয়ম্ভূনাথের পূজা বা দক্ষিণাব জন্য পূজারিদিগের কোন উৎপীড়ন দেখিলাম না। ভক্তগণ হৃষ্টচিত্তে যাহা প্রদান করে, পুরোহিতগণ তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হয। শিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরের বাহিরে চারিদিকে অনেক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। এই চন্দ্রনাথগিরির একাংশে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন থাকায় ইহা বৌদ্ধগণের নিকটও এক পবিত্র তীর্থ।

স্বয়ম্ভূনাথদেবের দর্শনান্তর নিম্নে অবতরণ করিয়া অপরাপব তীর্থ সকল দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। প্রথমে আমরা কালী বাড়ীতে গমন করিলাম। তথায় দশভুজা কালিকাদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আছে। দেবী নানালঙ্কারবিভূষিতা। অদূরে কতকগুলি দুরারোহ তীর্থস্থান আছে।

কালীমাতার বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিম্নে অবতরণ-কালে প্রবহমানা এক ক্ষুদ্র ঝরণা দেখিলাম। উহা মন্মথনদ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে যাত্রিগণ শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্ম করে।

এখানে প্রয়াগ তীর্থের ন্যায় মস্তকমুণ্ডনের ব্যবস্থা আছে। সেজন্য ইহাকে স্বয়ম্ভূ-গয়া কহে।

চন্দ্রনাথে অনেক তীর্থ উপতীর্থ বিদ্যমান। সেই সকলের বিবরণ প্রদানপূর্ব্বক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া মাত্র কয়েকটীর বিবরণ উল্লিখিত হইল।

কুমারীকুণ্ড—ইহা এক অগ্নিময় জলকুণ্ড। ইহা দেখিতে বড় চমৎকার। এখানে যাত্রিবর্গ পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ ও দেবগণের উদ্দেশে হোম করিয়া থাকে।

বাড়বানল তীর্থ—ইহা সমভূমি হইতে ঈষৎ উচ্চ এক মন্দিরমধ্যে অবস্থাপিত। মন্দিরের প্রবেশপথ প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। বাড়বানল কুণ্ডটী চতুষ্কোণাকৃতি ও দেখিতে এক বৃহৎ ডোবার ন্যায়। পাণ্ডাগণ বলে যে, এই কুণ্ডের গভীরতা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। শুনা যায় যে, ইহা পাতালের সহিত সংলগ্ন আছে। কুণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্তে এক অগ্নিশিখা অবিরত জ্বলিতেছে। ভগবানের কি অদ্ভুত লীলা! যে অগ্নিতে জল নিক্ষেপ করিলে তাহা অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হয়, সেই অগ্নি দেখিলাম জলরাশিমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছে। স্নানকালে জলের কোনরূপ উষ্ণতা অনুভূত হইল না। কথিত আছে যে, শুদ্ধচিত্তে এই বাড়বানলে স্নান করিলে মানবের শিবলোকে স্থান হয়। বাড়বানলের সন্নিকটে কালভৈরব ও অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির অবস্থিত। পথিমধ্যে জ্বালামুখী কালী আছেন।

লবণাক্ষ তীর্থ—ইহা এক প্রস্রবণবিশেষ। ইহার জল

উষ্ণও সমুদ্র জলের ন্যায় লবণাক্ত। লবণাক্ষের নিকটেই এক কুণ্ড রহিয়াছে। লবণাক্ষের জল উথলিয়া এই কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। এই কুণ্ডের নাম বাসিকুণ্ড। লক্ষণাক্ষতীর্থ এক গৃহের ভিতরে অবস্থিত। উপরিভাগের এক পার্শ্বে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে এবং এক নীলরেখা কুণ্ডোপরি পতিত হইতেছে। যে গৃহে কুণ্ডঅবস্থিত,তাহা সূচাভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত। এখানে আরও অনেক কুণ্ড আছে। তাহাদের জল বেশ মিষ্ট ও পরিষ্কার।

লবণাক্ষের কিয়দ্দূরে সূর্য্যকুণ্ড আছে। ইহার জলও ঈষদুষ্ণ। তারপর আমরা সহস্রধারা দেখিতে যাইলাম। সূর্য্যকুণ্ড হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই পথ দুইটী পর্ব্বতমধ্য দিয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে এক স্থানে এক নদী বহিতেছে ও সেই স্থলে এক গভীর ঝোপ রহিয়াছে। এক ব্যাঘ্রশাবক উক্ত ঝোপ হইতে বহির্গত হইয়া নদীতে জলপানার্থ আসিয়াছিল। আমি, আমার বন্ধু ও পাণ্ডা সেই জনমানবহীন পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমাদের পাণ্ডা সেই ব্যাঘ্রশিশুকে তাড়া দিবামাত্র পর্ব্বতের উপর হইতে ব্যাঘ্রগর্জ্জন শ্রুত হইল। তখন বেলা প্রায় ৪॥০ ঘটিকা হইবে। আমরা পশ্চাদ্পদ না হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহস্রধারার দৃশ্যও অতি চমৎকার। এক উচ্চ পর্ব্বতের প্রায় ৩০০ ফিট্ উপর হইতে ঝরণার জল প্রবলবেগে নিঃসৃত হইয়া ও পর্ব্বতের অনেক স্থানে শিলাখণ্ডের দ্বারা প্রতিহত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় সহস্রধারে নিম্নে পড়িতেছে।

গুরুধুনী তীর্থ—এক অনুচ্চ পর্ব্বতগাত্রে অগ্নিশিখা দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অগ্নিশিখাই গুরুধুনা তীর্থ নামে বিখ্যাত।

জ্যোতিস্ময় তীর্থ—এক পর্বতগাত্র হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। পাণ্ডাগণ এই অগ্নিকে মহাদেবের নেত্রাগ্নি বলে।

চট্টগ্রামে চট্টেশ্বরী দেবী চন্দ্রনাথদেবের ভৈরবী।

চন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। লেখনীর সাহায্যে উহার যথাযথ বর্ণনা প্রদান করা যায় না। পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি নৈপুণ্য সন্দর্শনে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। ভারতের বহু তীর্থক্ষেত্রের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে ভগবান্ যে সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন তাহা উপলব্ধ হইতে লাগিল ও তৎসঙ্গে আপন শারীরিক শ্রম বিদূরিত হইল।

চন্দ্রনাথ হইতে আদিনাথদেবকে দেখিতে যাইতে হয়। এখান হইতে প্রথমে রেলযোগে চট্টগ্রাম ও তৎপরে ষ্টীমার-যোগে নানা নদ নদী অতিক্রম করিয়া পরিশেষে বঙ্গোপসাগর-মধ্যে মহেশখালি নামক দ্বীপে উপস্থিত হইলে মৈনাক পর্ব্বতোপরি ভগবান্ আদিনাথদেবের দর্শনলাভ হয়। এই আদিনাথ-দেব স্বয়ম্ভূনাথ-মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম অপ্‌মূর্ত্তি।



প্রশংসা পত্র হইতে উদ্ধৃত।

---

১ সংস্কৃত সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবৎ-গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহোদয় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন,—

“শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত “চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ” নামক পুস্তিকাপাঠে বিশেষ তৃপ্ত হইলাম। ইহাতে তাঁহার নিজের তীর্থপর্য্যটন বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত তীর্থপর্য্যটন মানসে যাত্রা করিলে এই পুস্তিকাখানি একটী অপূর্ব্ব সম্বল বলিয়া আমার মনে হইল, ইহাতে পুরাণ ও সংহিতাদিতে উক্ত দেব দেবীর স্থান, তীর্থমাহাত্ম্য, যাতায়াতের সুগম পন্থা বর্ণনে যাত্রিদের পক্ষে লেখক বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং পর্য্যটন প্রণালী এতই সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠের ইচ্ছা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়ে তীর্থপর্য্যটনের ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া আসে। লেখক একজন বিচক্ষণ হিন্দু, পুস্তকে সাধারণ তীর্থস্থান ও দেবদেবীর নাম উল্লেখ করা ব্যতীত পুরাণাদির প্রমাণ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিশেষ বিশেষ তীর্থাদির উল্লেখ থাকায় তীর্থসেবী আর্য্যের পক্ষে লেখক বিশেষ উপকার করিয়াছেন। শ্রদ্ধা, অনুসন্ধান এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তিকা পাঠে আমি লেখককে ধন্যবাদ সহ প্রশংসা প্রদান করি।